জীবন-বাণী

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা

১৩৪০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

গ্রন্থ-পরিচয়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের 'আদর্শ সাহিত্য' ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইবার সময় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

এই মাত্র আপনার চিঠি ও ভারতবর্ষ পাইলাম। 'আদর্শ সাহিত্য' প্রবন্ধটি পড়িয়া আনন্দবোধ করিলাম। আপনি সাহিত্যের যে আদর্শ আলোচনা করিয়াছেন, এখনকার দিনে তাহা অনাদৃত। সূর্য্যকে মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকে, তাই বলিয়াই সূর্য্যকে অবিশ্বাস করা চলে না। বহু যুগ হইতে যাহা মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে, অকস্মাৎ তাহার অবমাননা কখনোই স্থায়ী হইতে পারে না। বিশেষ কারণে বিশেষ কোনো যুগের ক্লান্তি চিরযুগের সত্যকে অপ্রমাণ করিতে পারে না। যে সত্যকে মানুষ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে, যাহাকে সে আপন চির ঐশ্বর্য্য বলিয়া মানিয়াছে, আজ তাহাকে যে বলিতেছে মরীচিকা, তাহার দৃষ্টিকে অবিশ্বাস করিব— মনুষ্যত্বের অন্তরতম সত্যকে নয়।

অপটু হইয়া পড়িয়াছি—কর্ম্মসংক্ষেপের চেষ্টায় আছি—দশচক্রে সেটা কোনো মতে ঘটিতেছে না। ইতি ১৬ নবেম্বর ১৯৩৩

ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আচার্য্য স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই গ্রন্থের পরিচয়ে লিখিয়াছেন—

জীবন বাণী (The Message of Life) by Bijaya Chandra Mazumdar, the distinguished scholar and man of letters, is a work of profound as well as novel significance in Bengali Literature. Its main themes have a bearing upon anthropological and sociological phenomena, but it also marks the trends of thought and cultural tendencies which characterise modern Art and give it meaning and purpose.

The article on আদর্শ সাহিত্য (Model Literature) shows how literature has its roots, not in the ephemeral or the local, but in what presents the 'Eternal Verities' with their emotional value and significance for life. This is illustrated by classical models of Sanskrit literature, from the Mahabharata down to Kalidas and Bhavabhuti; and the author shows how literature grows and expands with social life but becomes frigid under the influence of degenerate latter-day artificialities with their provincial (instead of universal) outlook.

The article জুজুর ভয় ছাড় (Give up the fear of the Bugbear) discusses the origin and evolution of various religious systems, and ends with the value and significance of the hope of immortality as clothing life with dignity and lending it the halo of eternity, and many will think this is the real value of a belief in the immortality of the soul.

It is interesting to note that the author points, in the

manner of Herbert Spencer, to the biological value of shame (or shamefacedness) in regulating sexual life and the principle may also explain the prejudice against woman's use of contraceptives.

The article মরণ ভোলা (Forget Death) discusses the old theories of future life and seeks to establish the high probability of continuity of existence in some form or other after death, but the crux of the matter is the continued existence of the individual, and not merely racial or specific immortality conceived as the vehicle of the life individual.

10. 12. 33. *Brajendra Nath Seal*

মাননীয় জষ্টিস্ ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—

12, Theatre Road, Calcutta.
24th Jannary 1934.

Dear Acharjya Bijoy Chandra,

Your contributions to Bengali Literature are well known and you have thrilled the hearts of Bengalis by your poems which are full of pathos and grandeur. I have read your new contributions in the 'Jiban Vani'—the Message of Life.

In your chapter on 'Maran Bhol', i. e., 'Forget Death' you have dealt with the philosophy of life with great ability and have clarified some of the obscure notions on this vast subject.

In the chapter dealing with 'Adarsha Sahitya' you have done great service in drawing prominent attention to the truth that the literature that has not the effect of ennobling the mind of man by drawing with great art the character of such heroes and heroines who can resist the buffets of circumstances and can pass unscathed through ordeals and temptations without detriment to their purity of life and character is not useful literature. You have done well in taking your cudgels against the class of literature that does not elevate but degrade; that in the guise of art insinuates in the minds of its readers ideas contrary to our moral sense, i. e., ideas condemned dy society.

Your view that monogamy was the earliest form of marriage and that polygamy and polyandry are the results of a degraded and degenerate state of society will dispel many of the illusions about the beginnings of society. You have done good service in pointing out that in the beginning of society there was no sexual freedom at a time when there is a tendency to destroy the roots of foundation of social happiness in some who advocate companionate marriage. It is an absolutely perverted notion that in the beginning of society there was sexual freedom whereas the true view is that the origin of society began with family life. You have done great service in pointing out in your chapter on 'Marriage' the essential truth that monogamy prevailed in the beginnings of society and was the basis of society and in supporting your opinion by the views of great thinkers of other countries.

I am confident the readers of the book will gain much useful knowledge from your publication of the book.

Yours sincerely,

Dwaraknath Mitter

কৃতজ্ঞচিত্তে দেশের শীর্ষস্থানীয় তিনজন মনীষীর অভিমত মুদ্রিত হইল। এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে—জীবন কি, জীবনে দুঃখ কেন, জীবন-বিকাশের বাধা কোথায়, জীবনের লক্ষ্য ও নিয়তি কি, আর জীবনের সাধনা কি।

আশা আছে—এই জীবন-বাণী পাঠক-সমাজে উপেক্ষিত হইবে না। যে-যে কারণে এই আশা জন্মিয়াছে, তাহার একটু উল্লেখ করিতেছি। (১) অন্ধ হইবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Post-Graduate বিভাগে তেরবৎসর অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকিবার সময়—বিশেষভাবে নৃতত্ত্ব-বিভাগের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচিত বিষয়ের কিছু-কিছু আলোচনার সময়, মনে হইয়াছিল—সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মের আলোচনায় যুবকদের যথেষ্ট কৌতূহল আছে। (২) কলিকাতায় ও অন্য কয়েকটি বড় শহরে দেশের সুধীদের নানা সভায় যখন এই গ্রন্থের বিষয়গুলির অল্প-বিস্তর বিচার করিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম, তখন আলোচিত বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। (৩) প্রাচীন ভারতের এই ঐতিহ্য বড় গৌরবের যে, ধর্ম-বিষয়ের মতবাদ যত বিরোধী হইলেও স্থিরচিত্তে সকল বিরোধী মত এদেশে আলোচিত হইয়াছে। বিদেশের নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের মত কেহ কখনও সে আলোচনায় উত্তেজিত বা অসহিষ্ণু হয় নাই। এযুগে অনেক জিদের তর্ক বাড়িয়াছে বটে, তবে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস—হিন্দুরা তাহাদের প্রাচীন মানসিক প্রকৃতি হারায় নাই।

কলিকাতা
৩৩।৩ লেন্স্ডাউন রোড্
১২ই মাঘ, ১৩৪০

সূচী

পূর্বাভাস

সত্য সন্ধানের পন্থা

সাধুর উপদেশ, সত্য পথে চল। উপদিষ্টেরা কথার মানে বুঝিল না, যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। সাধুপুরুষ রাগে ও অভিমানে আওড়াইলেন—চোরায় না শোনে ধর্মের কাহিনী। ক্রটি হইল কাহার? সাধুর, না চোরের? সত্য কি? হইতে পারে, উহা জানা-অজানা সকল তত্ত্বের নির্য্যাস, তবে উহাকে অশরীরীরূপে বস্তু-নিরপেক্ষ করিয়া খাড়া করিলে, কেহই উহার মানে বোঝে না; যীশুর আমলে পাইলেট্ উহার অর্থ বোঝেন নাই, একালে আমরাও বুঝিতে পারি নাই।

মানুষে তাহাদের ভাত-কাপড়ের জন্য ও অন্য দশটা প্রয়োজনে খাটে; আর তাহাদের প্রাপ্য গণ্ডা পাইবার পথে বাধা জন্মিলে সেই বাধাকে জঞ্জাল ভাবে ও তাহাকে দূর করিতে চেষ্টা করে। এই বাধা বা জঞ্জাল পরিহার্য্য হইলেও অসত্য নয়, বরং পাকা রকমের সত্য; অন্যদিকে আবার বাঞ্ছিত ফল পাইবার পক্ষে ও বাধা দূর করিবার অনুকূলে যে উপায় মেলে, সেই উপায় হয় মানুষের কাছে উপাদেয় বাঞ্ছিত সত্য। মানুষে খুঁজিবেই খুঁজিবে ঐ যাহা তাহাদের কাছে বাঞ্ছিত সত্য; যাহা লোকে অনুভব করে উপাদেয় হিতকর সত্য বলিয়া, তাহা অবলম্বন করিবার জন্য কোন সাধু, গুরু বা মহাপুরুষের অপেক্ষা রাখে না। মানুষ যাহা নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ও অনুভবে উপাদেয়

মনে করে নাই, তাহা মহাপুরুষের মস্তিষ্কে বা শাস্ত্রনামে পরিচিত বইএর পৃষ্ঠায় আছে বলিয়াই তাহাকে প্রাণ দিয়া আকর্ষণ করিতে পারে না; যদি করে, তবে সে অসত্যকে সেবা করে ও তাহার ফলে মানুষ হয় জড়বুদ্ধি।

কি অটল নিয়মে চন্দ্র, সূর্য্য দেখা দেয় বা শরীরের রক্ত সঞ্চালন হয়, তাহা হইল প্রাকৃতিক অবস্থার সত্য। এখানে সে সত্যের কথা বলিতেছি না; উহা শিখিতে হয় বজ্ঞানের পরীক্ষায় আর সে পরীক্ষার শিক্ষাও প্রত্যক্ষ বোধের শিক্ষা। আমরা বিনা গুরুর উপদেশে শরীরের কলের নিয়মে নিঃশ্বাস টানিয়া বাঁচি,—গুরুর বচনের অপেক্ষায় দম আট্‌কাইয়া মরি না; কিন্তু গুরু আসিয়া যদি শিখাইতে বসেন যে, নিঃশ্বাস ফেলিবার ও টানিবার এমন প্রক্রিয়া তি ন জানেন যাহা অবলম্বন করিলে শরীরের মধ্যেকার শতদল বা সহস্রদল পদ্মের উপরে পরমেশ্বর আসিয়া বসেন, আর চিরকালের মত অমর হওয়া যায়, তবেই common sense-বা কাণ্ডজ্ঞান-ওয়ালা লোকের কাছে খট্‌কা বাধে। তখন নিজের সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করিয়া বুদ্ধির বলে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় যে কিরূপ অভিজ্ঞতা বা সংস্কারের ফলে গুরুর মনে ঐরূপ বিশ্বাস জন্মিল, আর ঐ প্রক্রিয়ায় যথার্থ ই কেহ মরণ এড়াইয়া 'গট্' হইয়া বসিয়া আছে কি-না, ও পরমেশ্বরের একটা মানস বা হৃদ্‌পদ্মে বসিবারই বা কারণ কি।

ধর্ম্ম সাধনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ কিরূপে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ও কি করিয়া পরলোকে সুখে থাকা যায়, প্রভৃতি বিচারের ক্ষেত্রে এমন অনেক বিধি-নিষেধ আছে, যাহার উপকারিতা বা দরকার না বুঝিয়াই মানুষে পালন করিয়া থাকে। কেনই যে একটা নির্দিষ্ট দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রাচীন কালের ভাষায় রচা মন্ত্র পড়িয়া ঈশ্বরকে প্রিয় করিতে হয়,

কেনই বা বাঞ্ছিত 'অনুষ্ঠানগুলি ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যে করাইতে হয়, কেনই বা স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু হইলেও কোনও কোনও খাদ্য খাওয়া মানা, আর কেনই বা দিন-বিশেষে বা তিথি-বিশেষে প্রয়োজনের কাজ করিতে দূরে যাওয়া নিষেধ, তাহা ধর্মের গুরুরা বুঝাইয়া দেন্ না ; বরং তাঁহারা দাম্ভিক বচনে বলেন যে, তুচ্ছ জড়-বিজ্ঞানের সাধ্য নাই যে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক বিষয়ের অর্থ ধরিতে পারে। হারিয়া নাকাল হইবার ভয়ে উঁহারা সপ্রতিভের মত আধ্যাত্মিকতার মন্দিরে খিল্ দিয়া তর্কের বালাই এড়ান্ না ত ? মানুষের হিতের জন্য এসকল বিষয়ের বিচারের প্রয়োজন আছে। অতি স্পষ্টভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত —আমাদের অনুষ্ঠিত এমন অনেক বিষয় আছে যাহা অহিতকর কুসংস্কারের ফলে বাঁচিয়া আছে, আর সেগুলি ঠেলিয়া ফেলিতে না পারিলে মানুষ কিছুতেই তাহার বাঞ্ছিত উন্নতিলাভ করিতে পারে না।

যাঁহারা অনেক বই পড়িয়া হইয়াছেন পণ্ডিত, তাঁহাদের অনেকেই হয়ত বলিবেন যে তাঁহাদের পক্ষে এবিষয়ের বিচারের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে আমরা অনেক সংস্কারকে কুসংস্কার বলিয়া জানি, তবে নিজেদের শান্তির খাতিরে প্রাচীন ঠাটের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে আমাদের উন্নতির বাধা হয় না ; আমি এ উক্তি যথার্থ বা সুবিবেচিত মনে করি না। কুসংস্কার জানিয়া যাঁহারা 'অধিক' মানুষের খাতিরে উহার মধ্যে মাথা গুঁজিয়া থাকেন, তাঁহারা যে অধিকের দোহাই দিয়া সমাজদ্রোহী ও উন্নতির বিরোধী, তাহা অতি সহজেই পরে দেখিতে পাইব। এখানে দেখাইব, তাঁহারা যে কুসংস্কার ছাড়িয়াছেন বলিয়া দম্ভ করেন, তাঁহাদের অনেকের হাড়ে-হাড়ে আছে সেই কুসংস্কার, আর সেইজন্যই তাঁহারা ডাকে-হাঁকে সেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারেন না।

শিক্ষিতদের অনেকের সমাজ-মেরামতের কাজে মজ্‌লিসি বিচারে স্থির হয় যে, মায় জাতিভেদ অনেক প্রাচীন প্রথাই উঠিয়া যাইবে, কিন্তু যাঁহারা সভা জলুস্‌ করেন তাঁহারা ঘরে ফিরিলেই দেখিতে পাই যে তাঁহারা সনাতন হইতেও পুরাতন। অতীত বা ভূত মানুষকে সহজে ছাড়ে না। তর্কের বেলায় নিরর্থক বা মিছা বলিয়া বুঝিলেও আমরা কেন, কি নিগূঢ় টানে 'ভূতের বোঝা বহি পিছে, ভূতের বেগার খেটে মরি মিছে'—তাহা ধরিবার প্রয়োজন আছে। শুধু যে দশের বিরাগের ভয়ে শিক্ষিতেরা হ'ন্‌ কাপুরুষ ও নিষ্কর্মা, তাহা নয়; শিক্ষিতেরা আত্মপরীক্ষায় দেখিতে পাইবেন যে, 'নর-নারীর সমান অধিকার' বিষয়ে তেজাল বক্তৃতা করিবার পর তাঁহারা যখন নিজেদের সম্পর্কিত কোনও বিধবার বিবাহের কথা শোনেন্‌, তখন তাঁহারা কলঙ্কিত হইলেন ভাবিয়া মনে মনে বিষণ্ণ হ'ন্‌। যাঁহারা সদর্পে বলেন—দিন-ক্ষণ দেখিয়া চলা বর্ব্বরের কাজ, তাঁহারাও গোপনে পাঁজি দেখিয়া অশ্লেষা-মঘা এড়াইয়া পা বাড়াইয়া থাকেন।

যাঁহারা ডাকে-হাঁকে কুসংস্কার ছাড়িয়া সমাজের আদর্শ গড়িবার জন্য দল বাঁধিয়াছেন, তাঁহাদেরও অনেকের মধ্যে উপরের বর্ণিত অবস্থাটি দেখিতে পাই। দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাঁজিতে যেমাসে ও যেদিনে শুভ বিবাহ নির্দিষ্ট আছে সেই মাসে ও সেই দিনে সন্দেশের চড়া দামের সময়েও তাঁহাদের বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। ঈশ্বরের উপাসনার বেলায় ইঁহারা এমন অনেক প্রাচীনকালের মন্ত্র পড়েন, যাহার মানে বদ্‌লাইয়া না নিলে তাঁহাদের নূতন মতের ঠিক অনুরূপ হয় না। হাড়ে-মাসে আছে—না বুঝিয়া শাস্ত্র মানার অনুরাগ, কিন্তু কেহ কেহ বুঝাইতে চা'ন্‌ যে, প্রাচীন সংস্কৃত পদ্যের সুরের মাধুরীই না-কি কেবল তাঁহাদের অনুরাগের কারণ। ভাষায় কি প্রাণের কথা মধুর ছন্দে গড়া চলে না

যে তাঁহারা জোড়া-তালি দিয়া মনে মনে অর্থ বদ্‌লাইয়া প্রাচীন মন্ত্রে উপাসনাকে শুদ্ধ করেন ?

এই যে আছে হাড়-মাসের মধ্যে অজ্ঞাতে লুকাইয়া অবোধ্য প্রাচীন সংস্কারের প্রতি অনুরাগ, তাহার প্রতীকারের উপায়—প্রাচীন সংস্কারের জন্মের ইতিহাস জানা। কি-জানি, প্রাচীনের মধ্যে কি উপকার গোপনে লুকাইয়া আছে ভাবিয়া কিছু-না-মানা শিক্ষিত পুরুষ যে অনেক সময়ে এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া পরিচিত মুখ দেখিতে না পাইলে ষষ্ঠীতলায় গিয়া গড় করেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত জানি। একালে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে এই একটি উপায় কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে যদি কোন রোগী হিষ্টিরিয়ার মত রোগে ভোগে, তবে তাহার মনে পড়াইয়া দিতে হয় যে সে এক সময়ে কোনও একটা আতঙ্কে চম্‌কিয়াছিল, আর তাহার ফলেই হইয়াছে রোগের সৃষ্টি। রোগের উৎপত্তির ইতিহাস সুস্পষ্ট জানিলে বৃথা আতঙ্কের বীজটুকু মরে ও রোগী সুস্থ হয়। বিনা যুক্তি-প্রমাণে অনির্দিষ্ট ধারণার অনুরাগে প্রাচীনের প্রতি যে নিগূঢ় অবোধ্য টান আছে, আর যাহার ফলে যুক্তি-তর্ক না মানিয়া প্রাণ আঁৎকায়, তাহার প্রতীকার প্রাচীন সংস্কারের ইতিহাস জানা। 'জুজুর ভয় ছাড়'—প্রবন্ধে ধর্মবিষয়ের সংস্কারের ইতিহাস দিয়াছি ও অন্যান্য প্রবন্ধে আরও নানা সংস্কারের উৎপত্তির কথা লিখিয়াছি। যাহাতে প্রফুল্ল মনে নির্ভয়ে মানুষ চলার পথে চলিতে পারে, তাহাই এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য।

আদর্শ সাহিত্য

[যে সাহিত্যে চিত্তের বিনোদ, তাহা মনের প্রফুল্লতায় জন্মে,—বিতণ্ডা বা জিদের তর্কে জন্মে না ; তাই সেই সাহিত্যে অতর্কিতে জীবনের কামনা ও লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি ফোটে ভাল। জীবন-রহস্যের আলোচনায় সেই জন্য গোড়ায় এই আলোচনা করিতেছি।]

প্রয়োজনের নানা পণ্যের হাট-বাজার বসে, বড় বড় মেলা বসে। মেলার কাছে ছাউনিতে ছাউনিতে থাকে কত খেয়াল মিটাইবার আয়োজন ; এখানে নাগর-দোলা, সেখানে ভোজের বাজি, সেখানে গানের পালা। কড়াক্রান্তির হিসাবি বুদ্ধিমানেরা পেটের খাদ্য ও পিঠের কাপড় প্রভৃতি ছাড়া বড়-জোর দু-একটা পুতুল কেনে ; কিন্তু খেয়ালে কিছু খরচ করে না। সাধারণ লোকে কিন্তু একটুখানি অভাবের কথা ভুলিয়া দু-একটা ঘূর্ণিপাক খায়, কৌশলের খেলা দেখে ও দু-একটা গান শোনে। লাভ-লোকসানের হিসাব ছাড়িয়া যখন কবির গানে শোনে—মনে রইল সই মনের বেদনা, তখন ঘর-সংসারের অভাবের দুঃখ ভুলিয়া মনে একটা অজানা বেদনা কুড়াইয়া বিনা লাভে উদাস বুদ্ধির চালনা করে। ব্যথা-বেদনার কিছু ছিল না, কিছু হারাইয়া সে শোক পায় নাই ; তবু গান শুনিয়া লোকের মনে হয়—কি যেন সে হারাইয়াছে, কে-যেন মনের মানুষ আছে যাহাকে সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। কাহাকে যেন কিছু বলিবার ছিল, বলিবার আছে, কিন্তু—বলি, বলি, কথা বলা হো'ল না। খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকা ছাড়াও

মানুষে একটা অজানা ভাবের সেবা করিয়া সুখী হইতে চায় ; ইহাকে কি কবিত্ব-বুদ্ধি নামে ব্যাখ্যা করিব ?

এই যে মানুষের মনের প্রকৃতি যে সে মনোহর দৃশ্যে বা মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইলে একটা অজানা নূতন ভাবের ঢেউ তাহার মনকে আঘাত করে, আর সে ঠিক বুঝিতে পারে না যে তাহার মনে বিস্মৃত অতীত যুগের কথা মনে পড়িতেছে, না, একটা নূতন রাজ্যের দিকের অনুভূতির জন্য তাহার ভাবের কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে, ইহা কবি কালিদাসের একটি অসাধারণ কবিতায় অতি মনোহর ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কবির কবিতায় প্রাণে নূতন কুঁড়ি ফুটিবার ইঙ্গিত নাই ; আছে বিস্মৃত অতীত দিকের ভাবনার কথা। অতুল্য কবিতাটি এই :

রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিনোঽপি জন্তুঃ।
তৎ চেতসা ভবতি নূনমবোধপূর্ব্বম্
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।

মনের চারিপাশ হইতে অনাদি, অতীত ও অশেষ ভবিষ্যতের ভাব মুছিয়া ফেলিয়া কড়া-গণ্ডার হিসাব করিয়া কাজের লোক হইবার জন্য রুষের নূতন যুগের প্রবর্ত্তক লেনিন হইয়াছিলেন দৃঢ় ও কঠোর-কর্মা। তাঁহার সহকারী ও মিত্র গর্কী লেনিনকে বিঠোবেনের সঙ্গীত শুনাইতে নিয়াছিলেন ; সঙ্গীত শুনিয়া লেনিন উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়া গর্কীকে বলিয়াছিলেন—ঐরূপ সঙ্গীত কর্মের বাধা, কেননা, উহাতে মন এমন কোমল ও ভাবে অবশ হয় যাহাতে কঠোরকর্মা হইয়া সমাজের হিতের জন্য প্রয়োজনের নর-বধ অসম্ভব হয়। এইখানে প্রশ্ন ওঠে যে আমাদের জীবন-বাণী ফুটিয়া ওঠে নিরবধি কঠোর কর্মে, না, অবসরের একটুখানি খেয়ালের উদ্রেকে ?

যতই আমাদের দৃষ্টি সংযত করিয়া কর্ত্তব্যের হিসাবের খাতায় লাগাই না কেন, আপনার অচ্ছেদ্য স্বাভাবিক প্রকৃতিতে মানুষ চাহিবেই চাহিবে অসীম চারিদিকের মধ্যে, যে অসীমের অতি নগণ্য কোণায় সে ক্ষুদ্র ও পরিমিত। আমাদের মন হইতে, চেতনা হইতে এই স্বয়ম্ভূ ভাবকে কিছুতেই তাড়াইতে *পারিব না যে আমরা অজানা অনাদি ও অশেষের মধ্যে বিচরণ করি। আমাদের চেতনার প্রতি* বিন্দুতে, আমাদের সমগ্র মনে অনন্তের অলোপ্য ছাপ রহিয়াছে ; সেই-দিকে আমাদের মন ফিরাইলে আমরা মনোহরের স্বপ্নে বিভোর হইবই হইব, আর সেই ভাবের মধুরতাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ তৃপ্তিদায়ক সামগ্রি জানিয়া তাহার দিকে নিরন্তর হাত বাড়াইবই বাড়াইব। কবি গয়েটের ফাউষ্টের মত জীবনের বহু বিভ্রাট ও যুদ্ধের পর সয়তান মেপিষ্টো-ফিলিসের প্রভাব এড়াইয়া মনকে প্রসারিত করিয়া বলিতে বাধ্য হইব—Eternal Nature, where shall I grasp thee, o, where ?

চেতনায় অসীমের ছাপ-দাগা মানুষ, যে প্রকৃতির প্রভাবে অনন্তমুখো হয় ও অফুরন্তকে ভাবিয়া পরমতৃপ্তি পায় সে প্রকৃতির নাম দিয়াছি কবিত্ব-বুদ্ধি ; বিশেষ শ্রেণীর আস্তিকদের ব্যবহৃত 'ভক্তি' শব্দে উহার ব্যাখ্যা হয় না, কেন-না, 'ভজ' ধাতুমূলক ঐ শব্দে ভজনা করিবার ও তোয়াজ করিবার ভাব আছে, আর উহাতে আনন্দময়ের ভাব পরিস্ফুট নয়। প্রেম বলিলে, উহার অভিব্যক্তি হয় চমৎকার, কিন্তু ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিশেষের হাতে প্রেমের গায়ে লাগিয়াছে একটা হাল্কা (vulgar) ভাব যাহা দূর না করিলে প্রেম শব্দের মর্য্যাদা থাকে না। উদ্ভবের অনন্ত উৎসের দিকে তাকাইয়া সেই উৎসের সঙ্গে উদ্ভূতের বাঁধন আঁটিতে না পারিয়া যাঁহারা সন্দেহবাদী নাম পাইয়াছেন বা নাস্তিক

নাম পাইয়াছেন তাঁহারাও অনন্তমুখী হইয়া বিস্মিত ও তৃপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ কবিত্ব রসে উদ্ভাসিত তিনি প্রাণস্পর্শী মধুর ধ্বনিতে বা নৃত্যে আত্মহারা হইয়া অফুরন্তকে ভোগ করেন। নিশাকালে ধ্বনিত পাখীর সুস্বরে কবি Keats আত্মহারা হইয়া ভাবিয়াছিলেন—তিনি *অনন্ত প্রসারের মধ্যে উপিয়া গিয়া ও গলিয়া ভুলিতেছিলেন সেই ব্যথার* যাতনা, যাহার সঙ্গে বনের পাখীর আনন্দ-গীতি যেন অপরিচিত। Fade far away, dissolve, and quite forget, What thou amongst the trees hast never known, ইহাই কবির উচ্ছ্বাসের বাণী। কবির যে ভাব হইয়াছে সুস্বরে উদ্দীপ্ত সেই ভাব যে, বিশ্বের উদ্ভবের দিকে তাকাইলে আর সেই উদ্ভবের মনোহারিত্বের সঙ্গে প্রাণের অনুভূত হর্ষ-বিষাদকে জুড়িলে অতি অধিক মাত্রায় জীবনকে উচ্ছ্বসিত ও তৃপ্ত করে তাহা কোন কবিতার দৃষ্টান্ত না তুলিয়াই বুঝিতে পারি। কবি Browning এই ভাবের মোহে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন—যাহা প্রেমিকের শরীরের clay clod তাহাকেই মথিয়া প্রেমিকেরা পায় অনন্তকে—ঈশ্বরকে।

যাহা ক্ষুদ্রতায় আয়ত্তের অধীন ও সুন্দর, তাহার ভোগের পারে আছে যে অনায়ত্ত ও মনোহর তাহাই যে অশরীরী ছায়ার মত চেতনায় প্রকাশিত হইয়া প্রেমকে গভীর ও অফুরন্ত করে, তাহাই আমাদের কবি রবীন্দ্র বুঝাইয়াছেন 'মদন ভস্ম' নামে কবিতা জোড়ায়। শারীর সম্ভোগের তৃষায় চিত্ত অরুণ বর্ণে রঞ্জিত হয় ও সুরভিমুগ্ধ হয়, কিন্তু প্রেম যেখানে সুন্দরের পারে মনোহরের উপাসনা পায়, সেখানে বিশ্বের অসীমে আকাশে বাতাসে প্রেমের রস ঝরিয়া পড়ে। প্রেমিক তাহার আয়ত্তের কুসুমরথের কাছেই প্রণত হইয়া কেবল আঁচলের ও প্রাণের সুরভি ফুল উপহার দিয়াই সুখী হয় না; অসীমের দিকে

তাকাইয়া তাহার বাণী উচ্চারিত হইতেছে—পঞ্চশরে দগ্ধ করে,' করেছ *একি সন্ন্যাসি!*

সুন্দর বলি তাহাকে যাহার অবয়ব যেন সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া আমাদের অনুভূতিতে স্নিগ্ধতা দেয় আর কোমল মধুর ভাবের সঙ্গে জড়িত হইয়া যেন পূর্ণরূপে উপভোগ্য হইয়া ওঠে। কিন্তু শুধু মনোহর নামেই অল্প-বিস্তর ব্যাখ্যা করা যায় তাহাকে যাহা সুন্দর হইয়া বা না হইয়াও তাহার প্রাণের প্রভাবে আমাদের প্রাণকে আকর্ষণ করে। তোমার সন্তানের রূপের অবয়ব অপরের অনেক সন্তানের রূপের অবয়বের তুলনায় অসুন্দর হইলেও তোমার কাছে তোমার আদরের সন্তানেরা পৃথিবীর সকল শিশুদের মধ্যে সর্বাধিক মনোহর; তোমার প্রাণের ভালবাসা সেখানে অল্পের মধ্যে না ঘুরিয়া কূলহারা হইয়া প্রসারিত হয়। যে নারীর অবয়বের রূপের বা বর্ণের উজ্জ্বলতার গৌরব নাই, যে রূপোত্তমা—তিলোত্তমা নয়, বরং যে রূপের হিসাবে দশের চোখে অসুন্দর বলিয়া প্রতীত সে যখন আপনার ক্ষুধার জ্বালা অগ্রাহ্য করিয়া গভীর স্নেহে সন্তানের মুখের পানে তাকাইয়া আহারের সারা গ্রাসটি সন্তানের মুখে দিয়া তৃপ্ত হয়, তখনকার মনোহর দৃশ্যে আমাদের প্রাণ অভিভূত হয় অপরিমিত ভালবাসার অসীম উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়া। আবার যে *দৃশ্য* সৌন্দর্য্যে কেবল অল্প অনুভূত আর অতি অধিক পরিমাণে আমাদের অনুভবের অনায়ত্ত হইয়া আমাদিগকে বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়া মনোহর হয়, ইংরেজিতে এক শব্দে তাহার নাম Sublime. প্রাচীনের যে উপনিষদাদি গ্রন্থে অসীমের উপাসনা আছে সেখানে উপাস্যকে কোথাও "সুন্দর" বলা হয় নাই। যিনি উপাস্য তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি আরও কিছু; কিন্তু কোথাও তিনি ক্ষুদ্র 'সুন্দর' শব্দে অভিহিত বা অনুভূত হন্ নাই। ঐ সকল গ্রন্থে আদিম

যুগের অনেক অমার্জিত সংস্কারের কিছু কিছু প্রভাব আছে; কিন্তু *কোথাও মনোহর অনাদিকে সুন্দর বলিয়া ছোট করা হয় নাই।*

বলিতেছি না যে যাহা ক্ষুদ্র সুন্দর তাহা গ্রাহ্য নয় বা মনোহর নয়; যাহা গ্রাহ্য, যাহা আয়ত্তাধীন, যাহা মনোরম ও সুন্দর, সেই উপভোগ্য যেখানে অফুরন্ত অসীমের ইঙ্গিত দেয় না অথবা তাহার আভাসকে পরিস্ফুট করে না সেখানে আমরা স্থায়ী রসের নির্ঝর পাই না। যে সাহিত্যে এই স্থায়ী রস নাই, তাহা কালজয়ী হইতে পারে নাই; বুদ্বুদ-সাহিত্য বুদ্বুদে মিলাইয়া যায়। আমাদের লীলার যে বুদ্বুদ ফুটিতেছে ও নিবিতেছে তাহা আমাদের কাছে প্রিয়; সানন্দে ও সশোকে আমরা সেই বুদ্বুদের লীলা বর্ণনা করি। বুদ্বুদগুলি সার বাঁধিয়া আলোকে ভাস্বর হইয়া ফোটে; কিন্তু যখন তাহাদিগকে তরঙ্গের ফেনিল শিরে দেখিতে পাই, তখন যদি অফুরন্ত রঙ্গলীলা ও তরঙ্গ-লীলার তলায় অসীম স্রোতের খেলা ভুলিয়া যাই, অথবা ঐ স্রোত ও তরঙ্গের সঙ্গে বুদ্বুদের লীলাকে জুড়িয়া না দেখিতে পাই, তবে বুদ্বুদের সাহিত্য বুদ্বুদে মিলাইয়া বিস্মৃত হয়। প্রেমের বুদ্বুদ যেখানে প্রাণের অফুরন্ত টানের গায়ে গায়ে না ফোটে সেখানে অল্প ভোগেই প্রেম উপিয়া যায়; কবি Browningএর প্রাণস্পর্শী ভাষায় আছে—
We cannot touch these bubbles then, but they break.

প্রেম যখন প্রাণের অসীম ভাবের উচ্ছ্বাসে তরঙ্গিত তখন প্রিয় বা সুন্দরের ভোগকে চলিত কথায় 'সুখ' নাম দিয়া বুঝান যায় না আর উচ্ছ্বাসকেও যেন ব্যথার মত বেদনারূপে প্রতীত হয়। কবি ভবভূতি এই মনোহর অবস্থাকে সুখ-দুঃখের অতীত মনোহর আকর্ষণ বলিয়া বুঝাইয়াছেন; রাম সীতাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন—ন জানে সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা। এই সঙ্গে বলি, আমাদের চিত্তপটে

কালিদাসের আঁকা সেই চিরমনোহর ছবির কথা। শকুন্তলা যেখানে যৌবনের বিকাশে ও লাবণ্যের প্রভায় উজ্জ্বল নন্ বরং যেখানে তাঁহার মুখে বিষাদের কালি ও পরণে ধূসর বসন, আর যেখানে তিনি অপরিমিত প্রেমের অফুরন্ত বিশ্বাসে ও নিষ্ঠায় অযত্ন গ্রথিত কেশে দাঁড়াইয়া আছেন, সেইস্থানে (যাহাকে যথার্থ ই জীবনলীলার স্বর্গ বলা চলে) দুষ্মন্ত দেখিলেন দেবীর মনোহর প্রতিমা—বসনে পরিধূসরে বসানা, নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী। এখানে যে অফুরন্ত বিশ্বাস প্রাণকে উজ্জ্বল করিতেছে তাহার স্থায়িত্ব কালের আঘাতে লোপ হইবার নয়।

তুমি যদি চাও তোমার একটি নির্দিষ্ট আকর্ষণের পদার্থকে বা ভোগের সামগ্রিকে তোমার একটি নির্দিষ্ট কামনার আয়ত্তাধীন করিতে, আর তোমার সেই আকাঙ্ক্ষায় ভুলিয়া যাও যে তোমার ভোগ্য বুদ্বুদটি অপর বুদ্বুদের সঙ্গে গাঁথা আছে ও বিশ্ব-নিয়মের স্রোতের সঙ্গে গাঁথা আছে, তবে তুমি কেবল তাহাকে নিত্য নূতন কামনার বর্ণে উজ্জ্বল করিয়াই সুন্দর করিয়া নিতে পার; কিন্তু সেপথে তোমার বাধা এই যে তোমার কামনা ও কাম্য যখন হয় অসীম হইতে বিচ্ছিন্ন তখন তৃপ্তির নামে একটি বিষ উৎপাদিত হয়—ইংরেজিতে যাহার নাম sad satiety. তাহাতে ভোগ্য হয় তোমার বিরাগের সামগ্রি। কবি Browning—In a year কবিতায় এই অবস্থাকেই বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেমিক তাহার প্রেমের পাত্রীর যে লীলায় যে অভিমানে আপনার প্রেম বাড়াইয়াছিল, সেইগুলি ধীরে ধীরে বা এক বৎসরের মধ্যে প্রেমের ক্ষয়ের কারণ হইয়া ওঠে,—অর্থাৎ আর সেগুলি ভাল লাগে না। মিলন যেখানে ক্ষণিক ভোগের উত্তেজনায় তখন যাহা উত্তেজনার সামগ্রি তাহা মলিন হইলেই প্রাণের আকর্ষণ উপিয়া যায়। অসীমের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য প্রাণ মিলন ফিরাইয়া

আনিতে চেষ্টা করে কিন্তু মিলন আসে না ; Browningএর ভাষায়—
We re-embrace but single still,

পৃথিবীর ছোট-বড় সকল আকর্ষণের বস্তু, অথবা আমার রূপকের ভাষায় সকল বুদ্বুদ বহু সম্পর্কে পরস্পরে বাঁধা আর তাহাদের সকল বাঁধন একটি অসীম বিশ্ব-নিয়মের সঙ্গে বা চির-প্রবাহিত স্রোতের সঙ্গে বাঁধা আছে। এইটুকু ভুলিলেই তৃপ্তিতে জন্মে বিষ আর প্রাণে প্রাণে ঘটে ছাড়াছাড়ি, অর্থাৎ ইংরেজিতে বলিতে পারি, আসে satiety আর divorce. ঐ যে বলিয়াছি বুদ্বুদে বুদ্বুদে বাঁধনের যোগ আর বিশ্ব-নিয়মের সঙ্গে তাহাদের বাঁধনের কথা, উহাই হইল প্রাণের স্থিতির নীতি বা moral relation. আমাদের জীবন-লীলায় এমন কিছু নাই যাহা এই স্থিতির নীতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইলে স্থায়ী রসে পুষ্ট হইতে পারে ; আমরা অনন্তকে ভুলিলে শুকাইয়া মরি। আমরা বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা, আমরা যদি স্থিতির নীতির সঙ্গে বাঁধন হারাই তবে জীবন-লীলায় অফুরন্ত তৃপ্তি না পাইয়া জ্বালায় অধীর হই ও ক্ষুদ্র ভোগ্যকে সরস করিবার জন্য রঙ্গ-এর উপর রঙ্গ ঢালিয়াও কিছু করিতে পারি না ; যে আনন্দ আসে অলক্ষ্যে আমাদের প্রাকৃতিক ধর্মে অফুরন্তের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া, তাহা কোন কৃত্রিম উপায়ে পাওয়া যায় না।

যাহাতে ইন্দ্রিয়-লিপ্সা বাড়ে সেই ধরণের রূপ যদি কেহ আঁকে তবে অতি বড় ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকও সেই চিত্রে অধিক সময় তাহার উত্তেজনার উপকরণ পায় না। ভোগের ইঙ্গিতের চিত্রটি ছাড়িয়া যদি ভোগলিপ্সুকে চিত্রের মূলের আস্ত জীবন্ত ভোগ্যকে দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সে দেখিতে পায় যে, মুহূর্তের মধ্যে সে পায় তৃপ্তির বিরামের হলাহল,—চিত্রের বা ভোগের দৃশ্যে সে জ্বালাহীন স্থায়ী আনন্দের নির্ঝর পায় না ; কেবল জ্বালার উপর তাহার মনে সেই

জ্বালা বাড়ে যাহাতে আনে তাহার শরীরের ক্ষয়, মনের জড়ত্ব ও কর্মে অপটুতা। যাহাতে জাগে এই জ্বালা বা feverish heat তাহা কখনও জীবনে ও সাহিত্যে আদৃত হইতে পারে না। উহাকে যদি বিষবোধে ত্যাগ করিতে না পারি, জঞ্জাল জানিয়া পোড়াইতে না পারি তবে জীবন হইবে দুঃস্থ ও সাহিত্য হইবে ঘৃণ্য।

যাহারা বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রকে উপাস্য করিয়া সাহিত্য গড়ে তাহারা যে কত চপল ও রসবোধহীন হয় তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। বলিয়াছি যে টানাটানি করিয়া বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রকে সুন্দর করিতে হইলে তাহার গায়ে রঙ্-এর উপর রঙ্ ঢালিতে হয়, তবুও আশ মেটে না। অতি উচ্চকণ্ঠে আমাদের দেশের থিএটারি ধরণে না চেঁচাইলে বীররস জমাইতে পারা যায় না ও মড়াকান্না না জুড়িলে করুণরসের উদ্রেক হয় না। তাঁহার ভাষায় চেঁচানি ও মড়াকান্না নাই বলিয়া কবি রবীন্দ্রনাথের রচনায় অনেকে করুণ রস পান না, একথা আমি নিজে অনেকের কাছে শুনিয়াছি। আশ্চর্য্য ঘটনাকে অতি দক্ষতার সঙ্গে ফুটাইলেও অনেকে চায় যে ঐ বর্ণনার গায়ে গায়ে অনেকবার 'হায় কি হইল' জোড়া চাই। কাঁচা বুদ্ধির উকিলেরা ধীরভাবে কোন নিষ্ঠুর ঘটনা বিবৃত করিতে পারে না,—তাহারা অনেক হাস্যকর উচ্ছ্বাসের ভাষায় বিচারককে বিরক্ত করিয়া নিজের মামলার জোরটুকু নষ্ট করে।

ধর্মের অনুষ্ঠানের আসরেও এই অসার চপলতার দৃষ্টান্ত অনেক মেলে যেখানে লোকে মানুষের সঙ্গে স্থায়ী সম্বন্ধ বাঁধিবার আগ্রহে ধর্মকে পায় নাই। যেখানে সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতায়—দুঃখ-অভাবের অমূল্য উপকারিতা বুঝিয়া ঈশ্বরের দিকে তাকায় নাই, অর্থাৎ যেখানে প্রাণের প্রাকৃত নির্দেশে অনন্তের দিকে মুখ ফিরায় নাই, আর উল্টাদিকে যেখানে এই অসম্ভব কামনা করিয়াছে যে সে দুঃখ তাড়াইয়া

ও চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া মুক্তিনামে 'নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ' পাইবে, সেখানে কৃত্রিম উত্তেজনায় কোলাহলে ও চীৎকারে—মনে একটা উত্তাপ জন্মাইয়া ভ্রান্তবুদ্ধিতে ভাবে যে তাহার মনে ধর্মভাব জাগিয়াছে। মত্ততা আনিবার জন্য একটা গানের বিচ্ছিন্ন অর্থশূন্য ছোট পদ ক্রমাগত উচ্চারণ করিতে থাকে আর চেঁচাইয়া ও লাফাইয়া মূর্চ্ছা আনিয়া ধূলায় গড়ায়। অসীমের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক তাহার মধ্যে এই উত্তেজনার স্থান কোথায়? আর চীৎকার করিবার অবসর কোথায়? অসীম মনোহরের দিকে দৃষ্টি পড়ে খাঁটি জীবন-লীলার অভিজ্ঞতায়,—উহার সঙ্গে সম্বন্ধ কাটাইয়া নয়, আর মনোহরের দিকে কবির দৃষ্টিতে আস্তিক, নাস্তিক যে-কেহ দৃষ্টি ফেলুক্ না কেন, সে অতি বিন্দুমাত্রে অসীমের স্পর্শের অনুভব পাইয়া এমন মধুরতা আস্বাদন করে যাহাতে লাফালাফির স্থান থাকে না। কিন্তু যাহারা কল্পনায় ভাবে যে কি-যেন একটা অজানা আছে যাহা দেখা দিবে একটা জানা-বস্তুর মত রূপ ধরিয়া, তাহারা লক্ষ্য না জানিয়া ভ্রান্ত বুদ্ধিতে কেবল মাথা কুটিয়া ধূলায় গড়াইয়া ও চীৎকার করিয়া কেবল কোলাহলেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। অসীমের সঙ্গে মানুষে যে পরিমাণে সম্পর্কশূন্য, সে সেই পরিমাণে চপল ও ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন; ইহাদের গড়া সাহিত্য স্থায়ী হইতে পারে না ও প্রাকৃতভাবে মানুষকে স্থায়ী আনন্দ দিতে পারে না।

যাহারা চায় জ্ঞানের গৌরব কমাইয়া, তর্ক বা সন্দেহ তাড়াইয়া ভক্তিনামক বৃত্তির জোরে সত্যকে ধরিতে, তাহাদের গোড়ার ভুল দেখাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমরা যাহা কিছু ঠিক দেখি, সে ত আমাদের জাগরণে চেতনা দিয়া,—ঘুমাইয়া, স্বপ্ন দেখিয়া নয়। মানুষের স্থিতির অর্থই তাহার চৈতন্যটুকু,—দীপ্ত সংজ্ঞাটুকু। এই

চেতনা বা জ্ঞানকে ঠেলিয়া সন্দেহের সম্ভাবনা ও তর্ক উড়াইবার জন্য ইহারা মাথা গুঁজিতে চায় সেই প্রবৃত্তিকে বড় করিয়া যাহাতে শুধু দেয় মনে খানিক অনুরাগ বা আঠা ; এ অবস্থায় মাথা গুঁজিতে হয় যে অন্ধকারে, তাহা ত অতি স্পষ্ট। অন্ধকারে মনের আঠা বাড়াইয়াও যখন কুলায় না তখন প্রতপ্ত মাথায় চীৎকার করিয়া জ্ঞানলভ্য সত্যকে পাইতে চায়—মস্তিষ্কের স্থিরতা উড়াইয়া, জ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করিয়া, অর্থাৎ দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া যাহারা চায় উষ্ণ মস্তিষ্কে আবৃত দৃষ্টিতে সত্যধারণা করিতে, তাহাদের কি বিড়ম্বনা! এই সঙ্গে এই কথাটুকুরও উল্লেখ করি যে যাহারা অতি ক্ষুদ্রকে অসীমের প্রতিকৃতি করিয়া খাড়া করে তাহারা নিজের চোখের কাছে ক্ষুদ্রতার আবরণ দিয়া অসীমকে উড়াইয়া দেয় বা বধ করে।

অতি ক্ষুদ্রকে যাহারা জীবনের আকাঙ্ক্ষার উপাস্য করে তাহারা সেই ক্ষুদ্রকে টানিয়া-বুনিয়া মধুর করিবার জন্য যে আয়োজন করে, তাহা সযত্নে লক্ষ্য করিতেছি। উপাস্যের মন্দির গড়ে এমন ললিত-লবঙ্গলতার বেড়া দিয়া যাহা আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতার কঠোর ঝঞ্ঝাবাতের আঘাত পায় না,—কেবল মৃদুমলয় সমীরণে দোলে ; আর যেখানকার কুঞ্জে কেবল আছে কুহুধ্বনি—যে ধ্বনি বর্ষার দিনের বজ্র-নির্ঘোষে মূক হইয়া লুকায়। উপাসকের মন ভুলাইবার জন্য উপাস্যের কাছে সাহিত্যের যে নৈবেদ্য দেওয়া হয় তাহা পুষ্টিবিধানের ক্ষমতা বর্জ্জিত মধুর কোমলকান্ত ভোগ। কোমলতার অনুরাগে মত্ততা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে এমন ভাষার সৃষ্টি হয় যাহার গায়ে—পুরুষত্বের জোর নাই, মনুষ্যত্বের তেজ নাই। ভাষা এমন কাঁটা-বাছা হাড়-বাছা ও এমন মাংসপেশীশূন্য যে সেই থলথলে জেলিফিশের মত ভাষা কেহ চিবাইতে পারে না,—কেবল উহা দাঁত এড়াইয়া গলায় ঢুকিতে চায়।

এই কোমলতার উপাসনায় পারলৌকিক ফল যাহাই থাকুক, আমাদের ইহজগতের সাহিত্যিক ফল অতি মন্দ। এই নিস্তেজ সাহিত্য আফিংএর নেশায় ঘুম পাড়াইবার মত বিশ্ব ভুলাইয়া অনাদি শক্তির দিকে অসীম দৃষ্টিরোধ করিয়া মানুষকে কল্পিত স্বপ্নের ঝোঁকে ডুবাইয়া রাখে। প্রবৃত্তি বাড়ে শুইতে—মঞ্জুতর কুঞ্জতল কেলি সদনে। অল্প পূর্ব্বেই moral relation বা স্থায়ী নীতির ইঙ্গিত করিয়াছি। যেখানে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে ভোগের ক্ষুদ্র তৃষায় ভুলিয়া যাই যে আমরা সকলে একটি বৃহৎ লক্ষ্যের দিকে নানা সম্বন্ধ বাঁধিয়া চলিয়াছি, আর যেখানে ভুলিয়া যাই যে অক্ষমতা, ক্রটি ও অপরাধ প্রত্যেক মানুষের জীবনে ঘটিবে আর নিশ্চিতই বদ্‌লাইবে সেইখানে আমরা অন্যের ক্রটি ও অপরাধ মার্জনা করিতে পারি না; ঐরূপ মার্জনা না করায় যে আমরা প্রকৃতিদত্ত বা ঈশ্বরদত্ত সঙ্গী হারাইতেছি ও কর্তব্যসাধনের পথে নিজেকেই ক্ষুণ্ণ করিতেছি, তাহা বুঝিতে পারি না। মানুষ যে মনুষ্যত্ব না পাইলে, মহৎ হইবার পথে না চলিলে অপরের অপরাধ ও ক্রটি ধরিয়া বিচ্ছেদ ও বিড়ম্বনা ঘটায়—তাহা কবি Browningএর মত হৃদ্য করিয়া কেহ বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যে প্রেমিক তাকাইয়া আছে প্রেমপাত্রীর ক্রটি ও অপরাধের দিকে তাহাকে জীবন-রসে অভিজ্ঞ প্রেমপাত্রী বলিতেছেন—What so false as truth is, False to thee ; Where the serpent's tooth is, Shun the tree. When the apples redden, Do not pry ; Lest we lose our Eden, Eve and I. ইহার পরে ঐ পাত্রীর বাণী এই—হে প্রিয়, তুমি যদি বিশ্বনিয়মের ধাতার দিকে চাহিয়া মহত্ত্ব ও দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া তোমাতে আমাকে মুগ্ধ করিতে পার তবেই মানুষ হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলে সুখী হইব। ঐ বাণী এই—Be

a god and hold me, With a charm, Be a man and fold me, With thy Arm.

এই যে প্রেমের পুণ্যময় ধর্ম সূচিত হইল, যাহাতে শুচিবাই নাই, আছে উচ্চ পবিত্রতার বোধে ক্ষমা ও প্রাণের অন্তরে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত মাহাত্ম্যের সঙ্গে মিলন, উহা ক্ষুদ্রতার মধ্যে জন্মে না। পুণ্যের ও ধর্মের নামে যাহারা কৃত্রিম ও অস্বাস্থ্যকর সমাজনীতি গড়ে, তাহারা বিশেষভাবে স্ত্রীলোককে দুর্বল জানিয়া কথায় কথায় অগ্নি-পরীক্ষায় পোড়াইয়া অক্ষমার পাশবিক অভিনয় করে। অনন্তের দৃষ্টিতে প্রাণকে প্রসারিত করিতে পারিলে কখনও ঐরূপ অক্ষমা, অসহিষ্ণুতা ও পাপ জন্মিয়া সমাজকে ও সাহিত্যকে কলুষিত করিতে পারে না।

অনন্তের দিকে চাহিতে না পারিলে কোন কল্পিত শিক্ষায় বা ব্রত-উদ্‌যাপনায় যে, মানুষকে পরের প্রতি অনুরাগী করা যায় না, আর মানুষ যে, বিশ্বব্যাপী নীতি-বন্ধনের মধুর বেদনা অনুভব করিয়া মনুষ্যত্বের গৌরব পাইতে পারে না, তাহাই বলিলাম। বলিলাম—তাহাই হইবে স্থায়ী সাহিত্য ও মধুর সাহিত্য, যাহাতে অনন্তের ইঙ্গিত আছে ও যাহা অনন্তের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইতিহাস সাক্ষী, মানুষের সমাজ যেখানে যত অধিক প্রসারতা লাভ করিয়াছে, যেখানে ধর্ম ও সমাজ প্রভৃতি বাঁধা নিয়মে কঠোরভাবে বাঁধা না পড়িয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অনেক সুবিধা পাইয়াছে আর বহুস্থানের জ্ঞান বাড়াইতে পারিয়াছে, সেইস্থানে সাহিত্য হইয়াছে স্থায়ী রসে তত কালজয়ী। আমাদের সেই ইতিহাস নাই যাহাতে জানিতে পারি যে প্রাচীনকালে ভারতের আর্য্য-সমাজ কিরূপে বহুলোকের সঙ্ঘের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। রাজাদের নামের ছড়া ছাড়া লোকসাধারণের স্থিতির বিবরণ অতি অল্পই পাই, আর

যাহাও পাই তাহা নানা কথা জুড়িয়া, অনুমানে। আমাদের অতি চমৎকার সাহিত্য মহাভারত যুগে যুগে নীতি-কথা ও ধর্মকথার অনেক উপদেশে এমন পরিপূর্ণ হইয়াছে যে উহার মধ্যে কেন্দ্ররূপে যে ভারতী কথা আছে তাহাকে অনেক জোড়া দিয়া খাড়া করিতে হয়; এইরূপে অল্পাধিক পরিমাণে খাড়া করিয়াও ভারতী কথা, যে সমাজের ফলকে রচিত হইয়াছিল তাহার স্বাধীনতা ও প্রসার দেখিয়া বিস্ময় জন্মে। পালি সাহিত্যে যখন পড়ি যে, শাক্যমুনি ধর্ম ও জীবন-সমস্যার ৬৩টি বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিতেছেন তখন Rhys Davidsএর মত সকলকে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে হয় যে কি করিয়া আমাদের এখনকার প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ্য শাসনের স্থিতির যুগে এত চিন্তার স্বাধীনতা ও মত-বৈচিত্র্য ছিল; বুঝিতে পারি, যে ইতিহাস বা ইতিহাসের আভাস একালে পাই, প্রাচীন ঠিক সেরূপ ছিলনা। থেরীগাথা প্রভৃতিতে নারীদের যে স্বাধীনতা লক্ষ্য করি, গৃহ্যসূত্রে ও ধর্মসূত্রে তাহার আভাস নাই। কাজেই মনে করিতে পারি, ভারতী কথার সমাজ ব্রাহ্মণ্য-শাসনের ইতিহাস দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা যাহাকে বলি বিবাহ বন্ধনের শিথিলতা ও জাতিভেদের শিথিলতা, তাহা সমাজের পক্ষে ভাল ছিল কি-না, তাহার বিচার না করিয়া বলিতে পারি যে, সমাজ ছিল ধর্মে-কর্মে বড় স্বাধীন। আবার অন্যদিকে কেবল মানসিক বিকাশের ও অভিজ্ঞতা লাভের প্রাকৃতিক নিয়ম লক্ষ্য করিয়াই বলিতে পারি যে, সেকালের সমাজ ছিল এমন প্রসারিত ও বহুলোক-চরিত্র জানিবার অনুকূল যাহা কড়া শাসনের সমাজে জন্মিতে পারে না। বিশ্বের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য ভারতী কথা-সাহিত্যে দেখিতে পাই যে, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দুর্য্যোধন, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন ও বিদুর প্রভৃতি বহু পুরুষের চরিত্রে এমন দক্ষতায় ও ব্যক্তিত্বের

জ্ঞানে অঙ্কিত যে উহাদের একজনের গায়ে অপরজন মেলে না ও সকলেই নির্দিষ্টরূপে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তি। পুরুষদের সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতির সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। আমরা একালে বহু দেশ-বিদেশের জ্ঞানের গৌরব করি, কিন্তু বেশির ভাগ সাহিত্যে একজন পুরুষ বা একজন নারী কেবল 'ভোল্' ফিরাইয়া নানা গ্রন্থে দেখা দিতেছেন দেখিতে পাই।

ভারতী-কথার বিস্তৃত আলোচনা করিতে বসি নাই কিন্তু যদি বহু পরিমাণে সামাজিক প্রসার না হইত তবে যে এমন সাহিত্য রচিত হইতে পারিত না, তাহা সুনিশ্চিত। আমরা যদি এখন এই বিশ্বের উন্নতির দিনে সমাজের প্রসারকে খর্ব করিতে যাই আর Nationalism নামে চিহ্নিত জাতীয়ত্ব গড়িবার দিকে মন দিই, অর্থাৎ যদি বহু জনসঙ্ঘের প্রতিভূস্বরূপ ভারতী-কথার পাঞ্চজন্য শঙ্খ ছাড়িয়া প্রাদেশিকতার একতারা বাজাইতে বসি, তবে আমাদের সাহিত্য কিছুতেই প্রসার লাভ করিতে পারিবে না।

সামাজিক প্রসার না পাইয়া ও বহুজাতির সঙ্গে রক্তমিশ্রণ করিতে না পারিয়া অনার্য্যদের বহু ক্ষুদ্রদল কিরূপে ক্ষয় পাইতেছে তাহার খাঁটি দৃষ্টান্ত পাই আফ্রিকার বান্টু-বুশ্‌মান্‌দের বিবরণে। যে যৌবনে বুদ্ধিশক্তির উন্মেষ হয় কার্য্যকরীরূপে সেই যৌবনেই ঐ জাতির লোকদের মস্তিষ্কের ব্যাবৃতি বন্ধ হইয়া আসে আর উহারা ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হয়। আশা করি আর্য্যের সমাজ-প্রসারের ঐতিহ্যের দেশে আমরা বান্টু-বুশ্‌মান্ সাহিত্য রচিব না।

ভারতী-কথার যুগের পর, অথবা বহু পরেও এক সময়কার বহু জাগ্রত জাতির বংশধরদের মধ্যে কালিদাস পাই, ভবভূতি পাই; কিন্তু তাহার অল্প সময়ের পরেই দেখিতে পাই সাহিত্য প্রাদেশিকতার চাপে

ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে, প্রাণশূন্য হইয়াছে ও তাহাতে *কেবল বর্ণনার জন্যই কৃত্রিমভাবেই অনেক কথা রচিত হইয়াছে।*

এখানে বলা চলে না ভারত-রাষ্ট্রের কি অবস্থায় প্রদেশে প্রদেশে অগণ্য রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিচ্ছিন্ন ভারতে জাতীয় উন্নতি বিধানের কর্ম ছিল না ও একসঙ্গে দশের প্রাণ জাগাইয়া মনুষ্যত্ব বাড়াইবার ব্যবস্থা বিহিত হয় নাই। বিস্তৃত কর্মভূমিতে যখন আনন্দের উৎস খোলে নাই, তখন নিষ্কর্মা ও কুকর্মা রাজাদের তুষ্টির জন্য যে সাহিত্য রচিত হইতেছিল, তাহাতে শারীর ভোগের লিপ্সাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা করা হইয়াছিল। চাটুকার সাহিত্যিকেরা চেষ্টা করিয়াছিল একদিকে গায়ে শুড়্ শুড়ি দিয়া আনন্দ বাড়াইতে আর অন্যদিকে কথার ভোজবাজিতে একটা চমক দেখাইতে। বর্ণনীয় কোন বিষয় ছিল না, তাই কতকগুলি সানুনাসিক শব্দ-যোজনা করিয়া অনুপ্রাসের ঘটা বাড়াইয়া এক শব্দের নানা অর্থ ফলাইয়া সাহিত্যিকেরা তাহাদের কৌশলের কেরামতি দেখাইত। সঙ্কীর্ণ বিধ্বস্ত সমাজে প্রেমে-পড়া উঠিয়া গিয়াছিল; কবিরা প্রাচীনকালে প্রেমে-পড়ার গল্প প্রাণহীন শব্দের যোজনায় লিখিতে লাগিল, আর আর প্রেম বিষয়ে অনভিজ্ঞতায় নায়ক-নায়িকারা এ উহাকে স্বপ্নে দেখিয়া প্রেমে পড়িয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইত। দময়ন্তীর বিরহ-ব্যথার বর্ণনায় বাঁধা নিয়মের কোকিল, মলয় সমীরণ প্রভৃতি আমদানি করিয়া শ্রীহর্ষ গোটা চল্লিশেক শ্লোক রচিয়াছেন; তাহা পড়িতে গেলে দময়ন্তীর বিরহ-ব্যথার কোন অনুভূতি জন্মে না, আর দময়ন্তীর চেয়ে অতি অধিক পরিমাণে ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হই আমরা অসার শব্দ-যোজনা ঠেলিয়া ও যথার্থ সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের বিরহ ঘটিয়াছে মনে করিয়া।

এই নির্জীব কর্মহীন ভারতে পরে পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত কৃত্রিম রচনার প্রাণহীন সাহিত্য অতিমাত্রায় বাড়িয়াছিল। নানা রাজসভার কবিরা মনের বিনোদের যথার্থ উপকরণ না পাইয়া শরীর খুঁড়িয়া ইন্দ্রিয়লিপ্সার উৎস খুলিয়া দিতেছিল আর মানুষের মনে জাগাইতেছিল পশুত্ব; তবে সুখের বিষয় এই যে, সঙ্কীর্ণতার গণ্ডিতে পড়িয়া যখন রাজসভায় চলিতেছিল এই ঘৃণ্য অধম ভাবের লীলা তখনও অতি প্রাচীনকালের পুণ্যের ধারা সমাজে অন্তঃসলিলা বহিতেছিল। তাই দেখিতে পাই যে, প্রাচীন বিধ্বস্ত বনিয়াদি বড় মানুষের পরিত্যক্ত ভিটায় যেমন এখানে-সেখানে কাঁটা-বনের জঙ্গলে প্রাচীনকালের বীজে ভাল ফুলের চারা দেখা দেয়, সেইরূপ লোক-সমাজের মধ্যে কোথাও কোথাও ভাল সাহিত্য দেখা দিয়াছিল। ময়মনসিঙ্ জেলার দূর পল্লীতে মুসলমানদের আমলে যেসকল প্রাণস্পর্শী গাথা রচিত হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন অন্তঃসলিলা ধারার পরিচয়। প্রাচীন যুগের পবিত্র ঐতিহ্য যে, অপবিত্র কৃত্রিম সাহিত্যের চাপে ধ্বংস হইতে পারে নাই, এখন আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি। বিদেশীয়দের প্রভাবে যখন দেশের প্রাদেশিকতার গণ্ডি অতি অল্প পরিমাণেও ভাঙ্গিতে লাগিল, তখনই বৈদ্যুতিক স্পর্শে জাগিয়া উঠিবার মত দেশের মূর্চ্ছিত প্রাণ অনেক স্থানে জাগিয়া উঠিল। রাজনৈতিক অধোগতির প্রসঙ্গে অনেক তর্ক-বিবাদ উঠিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে এই প্রত্যক্ষলব্ধ ঋদ্ধি অস্বীকৃত হইতে পারেনা যে আমরা এই নূতন যুগে পাইয়াছি রবীন্দ্রনাথকে, যাঁহার বহু রচনা অনন্তের ইঙ্গিতে উদ্ভাসিত হইয়া সতেজ প্রাণময় স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে।

বিদেশের সংস্পর্শে প্রাদেশিকতার গণ্ডি ভাঙ্গিয়া প্রাণের প্রসারের

কথা বলিলাম, কিন্তু এই সঙ্গে উল্লেখ করিতে ভুলিব না যে আমাদের *সমাজে এক সময়কার দুঃস্থ জীবনের অভিব্যক্তিতে যে কুৎসিৎ রুচির* সাহিত্য জন্মিয়াছিল তাহার প্রচ্ছন্ন প্রভাবের ফলে বিদেশের ইন্দ্রিয়জ মোহের সাহিত্য কোথাও কোথাও অঙ্কুরিত হইতে পারিতেছে। মানুষের প্রবৃত্তির যে বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের গ্রন্থে থাকিতে পারে, কিন্তু দশের চিত্ত-বিনোদনের সাহিত্যে অপ্রযুক্ত, সেই বিশ্লেষণের ফাঁকির অজুহাতে কোথাও কোথাও অতি ঘৃণ্য রচনা প্রচারিত হইতেছে। পদ্মের পঙ্কজ নাম ধরিয়া যাহারা উহার বিকশিতরূপে মুগ্ধ না হইয়া উহার রূপ বুঝাইতে চায় পাঁক খুঁড়িয়া দেখিয়া, সেই কাদা-খোঁচা সাহিত্যিকদের মনের অবস্থা বুঝিতে বাকি থাকে না; অনেক বেদে সাপের হাঁচি চেনে। মনে হয়, পচা-মাংস-লোলুপ হাড়গিলা-শকুনি শ্রেণীর সাহিত্যিক অধিক নাই। প্রাণ-বিনোদের যথার্থ উৎস না পাইয়া যাহারা শুষ্‌শুড়ি দিয়া শরীরের বিনোদ ঘটাইতে চায়, তাহারা শুষ্‌শুড়ির ফলের ক্ষয়ের দিকে নিশ্চয়ই তাকাইবে। বিদেশের কোন কোন ঘৃণ্য সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা রাক্ষস-রাক্ষসী সাজিয়া স্নেহ-প্রেম পায়ে দলিয়া ঐ যে নির্লজ্জ দম্ভে বলিতেছে:

স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ "জীবিতমপি বা যদি"
আরাধনায় 'শুষ্‌শুড়ে' মুঞ্চতু নাস্তি মে ব্যথা—

উহা যে প্রাণ-প্রসারের নবযুগের শিক্ষায় আদৃত না হইয়া পদদলিত হইবে, আশা করি।

ভ্রান্তবুদ্ধির সাহিত্যিকদের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, জীবনে যাহা প্রাকৃতিক, তাহা জুগুপ্সাব্যঞ্জক হইলেও সাহিত্যে চিত্রিত হইতে পারে। এই মতের বিরোধী কথা পূর্বে লিখিয়াছি; তবুও আবার

একটি কথা বলিব। মলমূত্র ত্যাগ করা শরীরের অবস্থায় নিতান্ত প্রাকৃতিক ; তাই বলিয়া উহার প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা চলে না,—বিষ্ঠা-সাহিত্য রচনা করা চলে না। এই সত্য বুঝাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি যে, যে সাহিত্যে—যে জীবনে, অনন্তের দৃষ্টি ফোটে *না, তাহা ধন্য জীবন নয়—স্থায়ী সাহিত্য নয়।*

স্বাধীনতায় বাধা

মানুষ মাত্রেরই প্রকৃতি এই, তাহার জীবনের বাণী ও নির্দেশ এই, সে স্বাধীন হইতে চায়,—আপনার পায়ে দাঁড়াইয়া আপনার শক্তি বাড়াইয়া ধন্য হইতে চায়, আর অন্যদিকে মানুষের সঙ্গে মিলিয়া মানুষের হিতসাধন করিয়া মনের ও প্রাণের প্রসার বাড়াইতে চায়। তবে যেমন সাম্প্রদায়িক ধর্মবুদ্ধির মলিনতায় সে হয় একদিকে সঙ্কীর্ণ ও ছোট, আর অন্যদিকে কল্পিত আতঙ্কে হয় কাপুরুষ, সেইরূপ সে সমাজেও নানা ভ্রান্তিতে আপনাকে করে ক্ষুদ্র ও কুকর্মা। কাম্য সুখটুকু না পাইলে যে যাতনা হয় তাহা অনুভব করে সকলেই; কিন্তু ঠিক কিসে যাতনা দূর হয়, তাহা না জানিয়া অনেকে প্রতীকারের জন্য এমন কাজ করে যাহাতে যাতনা বাড়ে বৈ কমে না। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিবার অশান্তির সময়ে শিশুদের যে কষ্টটুকু হয় ক্ষুধার ফলে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না; তাই তাহাদের যাতনার শান্তির দুধের বাটি লাথি মারিয়া ফেলিয়া কাঁদে। কাঁদিলেই যে দুঃখ যায় না,—উত্তেজনায় যাহা কিছু করিলেই যে কষ্ট যায় না, তাহা বয়স্কেরাও শিশুদের মত মলিন বুদ্ধিতে বুঝিতে পারে না।

দেশের চালকদের মনে চেতনা জাগিয়াছে যে চলার পথে স্বাধীনতা না পাইয়া দেশ হইয়াছে দুঃস্থ; তাঁহাদের মনে এই সঙ্কল্পও জাগিয়াছে যে দেশকে স্বাধীন করিয়া উন্নত করিতে হইবে। যাহা বাঞ্ছিত, তাহা কি উপায়ে পাওয়া যায়, এ অবস্থায় তাহাই হইয়াছে সমস্যা। দুঃস্থেরা কখনও হয় নিরাশায় নিষ্কর্মা, আর কখনও বা হয় দুঃখে ও

উত্তেজনায় এমন ভ্রান্ত যে তাহাদের উদ্‌ভ্রান্ত কর্ম্মে আপনাদের চলার পথে কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হয়, আর নিজেদের উত্তেজনার আগুনে নিজেরা পুড়িয়া মরে।

বিদেশের ইংরেজরা সারা ভারতবর্ষ আপনাদের মুঠার মধ্যে আনিয়া দেশ শাসন করিতেছে, আর আমরা তাহাদের মুঠা হইতে কাড়িয়া নিয়া এদেশকে শাসন করিতে চাহিতেছি। দেশ পরের হাতে গিয়াছে আমাদের কি অবস্থার ফলে, আর সেই অবস্থা বা দুরবস্থা এখনও আছে বা নাই, আর যদি থাকে, তাহা কি উপায়ে দূর হয়, ইহা যত ভাবিয়া দেখা যায়, ততই আমাদের মঙ্গল। হইতে পারে নেতা বা চালকেরা তাহা ঠিক বুঝিয়াছেন, তবুও যাহা মঙ্গলপ্রদ তাহা নিরন্তর ভাবিয়া দেখা উচিত।

স্মরণ কর সেই ঘটনা যে ১৭৫৭ অব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর প্রাচীন শাসনের স্থানে ইংরেজের নূতন শাসন আরব্ধ হইল। ১৭৫৭ হইতে ১৭৬৭ পর্য্যন্ত এই বঙ্গদেশে এমন কোনও সাহিত্য রচিত হয় নাই অথবা লোক-সাধারণের মধ্যে এমন কোন উক্তি প্রচলিত হয় নাই যাহাতে তিলমাত্রেও বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষে একবারও ভাবিয়াছিল যে পুরাতনের স্থানে তাহারা পাইয়াছিল নূতন। আলিবর্দির আমলে বর্গীর হাঙ্গামার প্রসঙ্গে যেমন "বর্গী এল দেশে" ছড়া পাই তেমন কোনও ছড়া ইংরেজের আমলে প্রথম দশ বৎসর কেন, প্রথম কুড়ি বৎসরের মধ্যেও পাই না। ইংরেজের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল, দেশের লোক নূতন প্রভুদের সঙ্গে যেন অজানত পাকা সম্বন্ধ পাতিল ও প্রভুদের আদেশ পালন করিয়া চলিল। ইহাই পাই সেই যুগের বিবরণে। বুদ্ধিতে ও কর্মে এতবড় জড়ত্ব কেন ছিল, তাহা বুঝিতে না পারিলে সমাজের নাড়ী টিপিয়া আমাদের

রোগের কারণ ধরা যাইতে পারে না। নন্দকুমার দেওয়ান হইবার পর তাঁহার বাড়ীতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের এক সভায় একজন চতুর পণ্ডিত কল্কিপুরাণ পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন—সত্যযুগে নাকি মহাদেব পার্বতীকে গোপনে জানাইয়াছিলেন যে, কলির ভাবী ভূপতিদের তালিকায় "ইংরেজাঃ" যাঁহারা "লণ্ড্রজাঃ" তাঁহারাই হইবেন ভূপতি। এবচনে ঋষিদের জ্ঞানের মহিমার নামে 'বাহবা' পড়িয়া গেল ও ব্রাহ্মণেরা পেট ভরিয়া খাইয়া ঘরে ফিরিলেন।

এই নিশ্চেষ্ট জড়তার ও উদাসীনতার দৃষ্টান্তের অনুরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত পাই মাদ্রাজ অঞ্চলে স্যর্ আয়র কুট্-এর যুদ্ধের সময়ের এক ঘটনায়। শ্রীরঙ্গপটমের যে স্থানে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহার অল্পদূরেই চাষারা নির্ভয়ে ক্ষেতের কাজ করিতেছিল। এমন যুদ্ধের সময় কেন যে চাষারা ছিল নির্ভীক্, তাহা ইংরেজ সেনাপতি তাঁহার দোভাষী দূতের মুখে শুনিয়াছিলেন। চাষারা হাসিয়া বলিয়াছিল যে যুদ্ধ হয় রাজায় রাজায়, আর যে জিতিয়া যায় প্রজারা তাহাকেই রাজস্ব দিয়া সুখে থাকে; প্রজা না থাকিলে ত কোন রাজারই চলে না। এই দেশ প্রজাসাধারণের নয়; তাহারা কেবল খাটিয়া ফসল তৈরি করিতেই অধিকারী, আর দেশের স্বাধীনতা বা অধীনতা তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অর্থশূন্য। যে নীতি ও প্রথার ফলে জন্মিয়াছিল এই দেশব্যাপী মনের ভাব, কিরূপে তাহা এখনও নানা আচার, অনুষ্ঠান ও প্রথা-পদ্ধতির মধ্যে তাজা বীজ নিয়া লুকাইয়া থাকিতে পারে, তাহা সযত্নে দেখিয়া নেওয়া উচিত।

রামায়ণে আছে, বিজয়ী রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করিবার পর বলিলেন যে তিনি মুখ্যভাবে সীতাকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধ করেন নাই, তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন নিজের কুলের মান ও গৌরব-রক্ষার জন্য।

অপরের স্পর্শের কলঙ্কে সীতার যখন নারীত্বের গৌরব গিয়াছে, তখন সে সীতা হনুমান-বিভীষণ প্রভৃতি যে কাহারও ঘর করিতে পারে, অগ্নি পরীক্ষার পূর্বে রামচন্দ্রের উক্তিতে তাহাই পাই। ভারতের নানা প্রদেশের রাজাদের সঙ্গে যখন ইংরেজদের যুদ্ধবিবাদ বাধিয়াছিল, তখন রাজারা তাঁহাদের কুলের গৌরব ও মান, আর না-হয় প্রচলিত ধর্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; আর রাজভক্ত প্রজারা—*যাহাদের জন্ম হইয়াছে রাজার সেবা করিবার জন্য ও যাহারা রাজাকে* দেবতার অংশে উৎপন্ন মনে করে—তাহারা সাজিয়াছিল রাজার সৈন্য। এ মুলুক আমার—এই কথা বলিয়াছিলেন ঝান্সির রাণী, কিন্তু প্রজারা বলে নাই সে মুলুক তাহাদের। ইংরেজ এদেশ দখল করিবার পর নিজেদের দেশে রাষ্ট্রীয় অধিকার পাওয়ার জন্য বিদ্রোহ হয় নাই ; ১৮৫৭-৫৮ অব্দে ইংরেজের অধীন দেশী সিপাইরা যে বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিল, তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ ছিল—পদার্থবিশেষ মুখে স্পর্শ না করিয়া জাতি ও ধর্ম রক্ষা করা,—রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যের বুদ্ধিতে নয়।

এখন দেশে শিক্ষিত নেতাদের মনে নূতন চেতনা ও সঙ্কল্প জাগিয়াছে, আর তাঁহাদের চালনায় অনেক স্থানে অশিক্ষিত লোকসাধারণের মধ্যে আন্দোলন দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু সে আন্দোলনও হিতৈষণার প্রেরণায় হইয়াছে, মনে হয় না। প্রজারা গতর খাটাইয়া নানা শস্য উৎপন্ন করে, আর সেই বৃত্তির জন্য রাজস্ব ও টেক্স দিতে হয়। যেমন করিয়া হোক্, ঐ প্রজাদের অনেকে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা গায়ের জোরে রাজস্ব ও টেক্স না দিলে ভবিষ্যতে সুখে থাকিতে পারিবে। দেশ স্বাধীন হইলে যে, শাসনতন্ত্রের সঙ্গে আড়ি করিয়া রাজস্ব না দিলে চলিবে না, তাহা বোঝে নাই। স্বার্থের দিকের বুদ্ধির সাময়িক প্ররোচনায় যে উত্তেজনা, তাহা ক্ষণস্থায়ী হইবেই হইবে।

যে শিক্ষিতেরা রাজনীতির সঙ্ঘ ও দল বাঁধিয়াছেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেশের অন্যান্য শিক্ষিত শ্রেণীর কথা যখন ভাবি তখন অনেক দৃষ্টান্তে মনে হইয়াছে—সারা ভারতবর্ষ যে, সকলের দেশ—এ বুদ্ধি তেমন জাগে নাই। প্রজাসাধারণ ত নিজেদের খানকতক গ্রাম, না হয় বড়জোর নিজেদের জেলা আপনাদের মনে করিতে পারে। শিক্ষিতদের আপনাদের দেশ যে ইহার চেয়ে বেশি বড় নয়, তাহা একটি দৃষ্টান্তে বুঝাইতেছি। *সম্বলপুরে একজন এম্-এ, বি-এল্, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ* যখন মেলেরিয়ায়-ঘেরা বঙ্গে বদ্‌লি হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন তাঁহার এই চেষ্টার কারণ আমাকে বলিয়াছিলেন—মধ্যপ্রদেশে বা পশ্চিম ওড়িষা অঞ্চলে তিনি যদি মরেন, তবে বাঙ্গালী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের হাতে তাঁহার চিতায় পুড়িবার সুখটুকু হইবে না। ইউরোপীয়েরা (কেবল ইংলণ্ড্ বা ঐরূপ অন্য দেশবাসী নয়) সারা ইউরোপের যে-কোন স্থানে আবাস গড়িয়া বিবাহ করিয়া সুখে বাস করিতে পারে, কিন্তু যে-দেশকে আমরা 'আমাদের' বলি, সে দেশের যে-কোন স্থানে গিয়া আমরা স্থায়ী বাস রচনা করিতে পারিনা, অর্থাৎ মনে-প্রাণে আমরা এদেশকে 'আমাদের' ভাবিতে পারি না। এ বুদ্ধির মূলে আছে যে ধরণের সাম্প্রদায়িকতার ভাব, যে জাতিভেদের বনিয়াদি ও পূজ্য নিয়ম, তাহা বজায় থাকিতে কি সমানে সারা দেশকে 'আপনার' বলা সম্ভব হয়? বাপের চাকুরির ক্ষেত্রে যদি কোন বাঙ্গালীর মাদ্রাজে জন্ম হয়, সেও মাদ্রাজকে ভাবিবে না, যখন স্বদেশ প্রেমের ছড়ায় পড়িবে—'যেদেশে জনম যেদেশে বাস।' দেশ এক করার এলাহি উদার মতের সভায় বক্তৃতা করিয়া ঘরে ফিরিবার পর দলে দলে শিক্ষিত ওড়িয়া ও শিক্ষিত বেহারী চেঁচাইয়া ও খোঁচাইয়া বলিতেছেন যে তাঁহাদের জন্মের ভিটা-ভূমিতে বাঙ্গালীরা বাস করে কেন? জাতিভেদের কড়া কথা ছাড়িয়াও দেখিতে পাই আমাদের

শিক্ষিতদের মধ্যে প্রভেদ-বুদ্ধি কত তীক্ষ্ণ ও গভীর। আমরা অস্পৃশ্য নামে দাগা জাতির লোকের গা-ছোঁয়া ও মন্দির-ছোঁয়ার অধিকার দেওয়ার জন্য তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছি, কিন্তু যাহারা স্পৃশ্য ও আদৃত, প্রতিবেশী বা প্রাদেশিক উচ্চ জাতির ভদ্রলোক, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরে প্রাণের ছোঁয়ায় পরস্পরকে ছুঁইবার জন্য তাহার হাজার অংশের এক অংশ আন্দোলন হইলেও উন্নতির অনুকূলে একটা কাজ করা হইত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ঘুচাইয়া বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যেও সৌহার্দ বাড়াইয়া বাস করা সম্ভব হইতেছে না। বিস্তীর্ণ রকমে যাহাকে জাতিভেদ বলি তাহা যদি না থাকিত, আর ওড়িয়া, বেহারী ও বাঙ্গালী ভদ্র জাতিদের মধ্যে বিবাহ চলিলে দোষের হইত না, তবে প্রদেশে প্রদেশে যে মারামারি আছে তাহা টিকিতে পারিত না। অন্যান্য জাতির সম্পর্কেও ওঠে যে জাতিভেদের কথা, এখানেও ওঠে সেই জাতিভেদের কথা; কাজেই ভাল করিয়া সন্ধান করিতে হয়— জাতিভেদের উৎপত্তির ইতিহাস। 'ইতিহাস' খুঁজিতে হয় এইজন্য যে, লোভের বশে হোটেলে খাওয়ার সময়ে বা বক্তৃতায় যশ অর্জন করিবার সময়ে জাতিভেদ অস্বীকৃত হইলেও প্রাচীন জাতিভেদের প্রতি মানুষের একটা গোপন টান থাকে,—অর্থাৎ কি-জানি কি উপকারের জন্য হিতকর জাতিভেদ জন্মিয়াছিল ভাবিয়া জাতিভেদ রক্ষা করিবার দিকে মনে মনে স্নেহ-মমতা থাকে। এইরূপ গোপন সংস্কারের টানে কাজ করার জন্য মানুষকে দোষ দেওয়া চলে না; পৃথিবীর সকল স্থানেই এই নিয়ম যে, লোকে তাজা বুদ্ধির জোরে কাজ করে যতটুকু, তাহার চেয়ে অনেকগুণে সেই অজানা ভাবের প্রেরণায় কাজ করে যাহার উৎপত্তির ভিত্তি বিস্মৃত প্রাচীন যুগের পুঞ্জীভূত সংস্কারে। কাজেই প্রাচীন

সংস্কারের ইতিহাস ও প্রকৃতি বুঝিয়া নিলে লোকে তাহাদের মনে কোন খুঁৎখুঁৎ না রাখিয়া সুবিচারিত নূতন পন্থা ধরিতে পারে।

পৃথিবীতে স্থলভাগ অপেক্ষা যেমন সমুদ্র-ঘেরা জলভাগের পরিমাণ তিন গুণ অধিক, বুদ্ধির স্থিরভূমির চারিদিকে অজ্ঞানতার প্রভাব সেইরূপ অতিমাত্রায় অধিক। অগণ্য লোক-সংখ্যার মধ্যে অল্পসংখ্যক বুদ্ধিমান চালকদেরও যে, প্রতি ব্যক্তি বিস্তৃত অজ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে বুদ্ধির ক্ষীণ প্রদীপ জ্বালাইয়া চলেন তাহা পদে পদে স্মরণ করা উচিত। আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা জাতিভেদের বাঁধন কাটিয়া দলে দলে ইউরোপে যাইতেছেন আর তাঁহাদের মধ্যে ইউরোপে পত্নী-সংগ্রহের দৃষ্টান্তও পাইতেছি। ইহাও দেখিয়াছি, যাঁহারা ইউরোপের নারীকে বিবাহ করিতে পারেন বা পারিয়াছিলেন, ঠিক তাঁহারাই দেশে ফিরিবার পর বিবাহের প্রয়োজন হইলে দেশপ্রচলিত জাতিভেদ মানিয়া পত্নী বাছাই করেন। যুবকেরা যত উচ্চ জাতির লোক হইলেও ইউরোপীয়দিগকে শ্রেষ্ঠতর মনে করেন, তাই ইউরোপীয়কে বিবাহ করিতে পারিলে ইঁহাদের গৌরব-রক্ষার বুদ্ধি কৃতার্থ হয়। কিন্তু দেশে ফিরিয়া বিবাহ করিবার সময়ে নিজের কুল ও পাত্রীর কুলের প্রভেদের সংস্কার জাগিয়া ওঠে। এ সম্পর্কে খৃষ্টিয়ানদের দৃষ্টান্তও দিতে পারি। খৃষ্টিয়ান্ হইলে এমনভাবে জাতি-কুল যায় যে কোনও উপায়েই হারাধনের পুনরুদ্ধার হয় না; তবুও নিজেদের পুরাতন জাতিতে জাতিতে বিবাহ ঘটাইবার প্রবৃত্তি অনেক স্থানে খুব অধিক। একজন কায়স্থকুলের ঘোষ তাঁহার মেয়েকে একটুখানি নীচের কুলের শিক্ষিত যুবককে বিবাহ করিতে বাধা দেওয়ায় পাদ্রি সাহেব যখন মিঃ ঘোষকে খৃষ্টিয়ান্দের ভ্রাতৃভাব বুঝাইয়াছিলেন, তখন মিঃ ঘোষ পাদ্রিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার বিলাতবাসী পুত্রের সঙ্গে তাঁহার মেয়ের বিবাহের উদ্যোগ

করিতে পারেন কিনা। পাদ্রি সাহেব তখন দুই আঙ্গুলে নাক চুলকাইয়া অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। কাজেই যে সংস্কার বংশপরম্পরায় বহিয়া আসিতেছে তাহার অসারতার খাঁটি ইতিহাস না দিলে মানুষের মনের খুঁৎখুঁৎ দূর করা অসম্ভব।

মহাত্মা গান্ধিজি প্রমুখ নেতারা বুঝিয়াছেন যে জাতি-ভেদেরকড়া নিয়ম বজায় রাখিলে ভারতবর্ষের সকল লোককে একজোটে খাড়া করা যায় না ও যাহা প্রার্থিত উন্নতি তাহা পাইবার পক্ষে উদ্যোগী হওয়া যায় না। জাতিভেদের নিয়ম শিথিল করিবার প্রথম উদ্যোগে গান্ধিজির এই নির্দেশ প্রচারিত হইয়াছে যে যাঁহাদের হাতে রহিয়াছে ঠাকুর দেবতাদের মন্দিরের অধিকার, তাঁহারা অস্পৃশ্য নামে চিহ্নিত লোকদিগকে মন্দিরে ঢুকিবার অধিকার দিন্। গান্ধিজি তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতির লোকে পাপ-বুদ্ধিতে ও পাপের আচরণ করিয়া যাহাদিগকে নীচ ও মনুষ্যত্বহীন করিয়াছেন, তাহাদিগকে ন্যায্য অধিকার দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন। মহাত্মার উদ্দেশ্য মহাত্মার মতই বটে ; তবে তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাসের এই উক্তি ইতিহাস-সম্মত সত্য নয় যে, ব্রাহ্মণাদিরা পাপবুদ্ধিতে অনেক জাতির উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সংশোধনের উপায়ে তাঁহার যাহা হুকুম বা নির্দেশ, তাহাও স্থায়ী কাজের উপযোগী কি-না সন্দেহ। সকল কথারই অল্প একটু বিচার করিতেছি।

'জুজুর ভয় ছাড়'—প্রবন্ধের প্রথম ভাগে বা অংশে দেখাইয়াছি যে এই অসম্ভব ঘটনা কখনও ঘটে নাই যে, অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণেরা (পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা ?) স্বার্থের বুদ্ধিতে ঠকামি করিয়া অনেক কোটি মানুষকে অবাধে পায়ে দলিয়া নীচ ও অস্পৃশ্য করিয়া দিয়াছে, আর স্পৃশ্য জাতিদের বহুসংখ্যক লোককেও বঞ্চিত করিয়া মন্দিরের অধিকার

ও পুরোহিতীর অধিকার নিজেদের মুঠায় নিয়াছে। জাতিভেদ না মানিলেও আমি ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া একথা লিখি নাই,—ইতিহাসের প্রমাণেই লিখিয়াছি। সারা পৃথিবীতে ধর্মযাজকদের উৎপত্তির এই ইতিহাস যে গোড়ায় যখন পিতৃপুরুষদের আত্মার বা ভূতের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল ও তুক্-তাক্ মন্ত্রে ভূত ও দেবতা বশ করিবার প্রথা হইয়াছিল ধর্ম, তখন অসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে ভূত সাধিবার ওঝা, Wizard, Saman ও পুরোহিত মিলিয়াছিল অল্প সংখ্যায়। উহারা ভূত ও দেবতা বশ করিয়া রাজ্যের হিত সাধন করিতে পারিত—বিশ্বাসে লোকে স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে প্রাধান্যে বরণ করিয়া নিয়াছিল, আর তাহার পর বংশে-বংশে গুণ ও মহিমা সংক্রামিত হইবার বিশ্বাসে পুরোহিতের বংশে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের বংশে ব্রাহ্মণ সমাজে স্থায়ী হইয়াছে। ইহার পর দ্বিতীয় কথা এই যে, হাড়ে-হাড়ে বদ্ধ ধর্মবিশ্বাসে যখন ব্রাহ্মণাদি হইয়াছে বড়, তখন সে বিশ্বাস না বদ্‌লাইলে কিছুতেই ঠাকুর-দেবতাদের মন্দিরে ব্রাহ্মণের প্রভাব কমাইয়া এই ব্রাহ্মণ্যপ্রথা স্থায়ীরূপে বদ্‌লান যায় না। অন্য যে-কোনও লোক মন্দিরে ঢুকিতে পারিবে, বা ঠাকুর ছুঁইতে পারিবে, অথবা ব্রাহ্মণের মেয়েরাও ঠাকুর ছুঁইবার বা ঠাকুর-পূজা করিবার অধিকার পাইবে, এ প্রথা চালানো সহজ নয়। আমার ঐ প্রবন্ধটিতে দেখিয়াছি যে পলিনেসিয়া প্রভৃতি অন্য দেশেও পুরোহিতের দল ছাড়া অন্য কেহ ঠাকুর-মন্দির ছুঁইতে পারে না ও ছুঁইতে সাহসী হয় না। যাহাতে অধিকার নাই, তাহা করিলে হাত পুড়িয়া যাইবে, না-হয় দৈব বিপদে মরিতে হইবে—এ বিশ্বাস বিদেশের ঠাকুর-পূজার ধর্মেও আছে, এদেশেও আছে। মন্দিরে ঢুকিবার পর যদি কাহারও বিপদ ঘটে, তবে সে বিপদ্‌কে দেবতার অভিশাপ ভাবিয়া মানুষে আঁৎকাইবে ও নূতন অধিকার নিজের ইচ্ছায় পরিহার করিবে।

এ সম্পর্কে আর একটি কথা আছে। আর্য্যেরা তাহাদের ধর্ম-বিধানের অনুরূপে ব্রাহ্মণ্য-বিধানে মন্দিরাদি গড়িয়াছে; আর সে মন্দির গড়িয়াছে তাহাদেরই জন্ম যাহারা ব্রাহ্মণ্য-বিধানের ধর্ম মানে। যাহারা ব্রাহ্মণ্য-বিধান না মানিয়া মন্দিরে প্রবেশ চায়, তাহারা আবার ব্রাহ্মণের মন্দিরেই ঢুকিতে চায় কেন? ব্রাহ্মণের মন্দিরের গৌরব ত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম রক্ষায়; আর তাহা রক্ষিত না হইলে ত মন্দিরের মাহাত্ম্যই উড়িয়া গেল ও সে মন্দিরে ঢোকা নিস্ফল হইয়া গেল। তাহার পর কথা এই, যাহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম এপর্য্যন্ত মানে নাই তাহারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পায়ে মাথা রাখিয়া তাহাদের মন্দির প্রভৃতিতে যদি অধিকার চায় তবে ত বাড়িবে তাহাদের গোলামি বুদ্ধি। এই গোলামি বুদ্ধিতে উৎসাহিত করিলে মানুষের পক্ষে স্বাধীনতার বুদ্ধি জন্মান সম্ভব হয় না। যাহারা এখন দূর হইতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ত ব্রাহ্মণ্য-বিধান মানাই ধর্ম। গোলামি বুদ্ধিতে পরের ঘরে ছোট হইয়া একটু স্থান পাওয়া অপেক্ষা নিজেদের মন্দির নিজেরা গড়িয়া নিলেই ত চলিতে পারে? অধিকার দিলে ব্রাহ্মণদের উদারতা বাড়িতে পারে, কিন্তু যাহারা অধিকার চায়, তাহাদের বাড়িবে গোলামি বুদ্ধি।

কথাটি এখানেই শেষ হয় নাই। আর্য্যেরা ও আর্য্যদের পন্থা অনুসরণকারীরা যখন আপনাদের গ্রাম, নগর প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিল, তখন অসম্পর্কিত অনার্য্যেরা আপনাদের এলাকায় আপনাদের প্রথা-পদ্ধতি ধরিয়া বাস করিতেছিল। কয়েকটি অনার্য্য জাতির পক্ষে এঘটনাও ঘটিয়াছিল যে তাহারা পাকা-রকমে দল বাঁধিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে নাই; তাহারা দুঃস্থ হইয়া ও বিচ্ছিন্ন হইয়া আর্য্যদের কাছে আশ্রয় চাহিয়া আশ্রয় পাইয়াছিল। তবে

তাহাদের স্থান হইয়াছিল আর্য্য-গ্রাম হইতে কিছু দূরে। পাণিনির "শূদ্রানাম্ অনিরবসিতানাম্"—সূত্রে ইহার যথেষ্ট আভাস পাই। এই যাহারা আর্য্যদের অনুগ্রহে ও দয়ায় (পাপে নয়) আর্য্যদের আবাসের কাছে স্থান পাইয়াছিল ও আপনাদের বিশ্বাসের মতে ধর্ম-পালন করিবার অধিকার পাইয়াছিল, তাহারা এখন কি দাবিতে বলিবে যে—হে অন্ন-আশ্রয়-দাতা, আমি তোমার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া শুইব? যদি মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বাড়াইয়া দেশের জন্য তাহাদের মনে ভালবাসা বাড়াইতে হয়, তবে নূতন নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিলে চলিবে না; বুদ্ধির আমূল সংশোধনের দিকে চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টার ফল যতদিনেই ফলুক্, স্থায়ী উপকারের জন্য সেই চেষ্টাই চাই। ভাবপ্রধানতার বক্তৃতায় চলিবে না, সে বক্তৃতার বক্তা যিনিই হউন্।

স্ত্রী-স্বাধীনতার কাজে স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ ভাল লেখা-পড়া জানা নারীদের এমন কাজ করিতে দেখি, যাহা স্বাধীনতার ডাহা বিরোধী; সে কাজ তাঁহারা অপ্রত্যক্ষ প্রাচীন কুসংস্কারের ছদ্ম প্রেরণায় করেন। ইঁহারা মুখে বলেন যে—স্ত্রীলোকেরা জীবনের ধর্মের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়া পতির পত্নী হইবেন, কিন্তু পতির ইচ্ছায় পালিত দাসী হইবেন না। তবে ইঁহারা স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছায় বিবাহ করিবার সময়ে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত সেই বিবাহ প্রথায় বিবাহিত হ'ন্ যাহাতে পতির পক্ষে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করায় আইনের হিসাবে বাধে না, আর প্রথম পত্নীকে দুয়া-ভার্য্যা হইয়া দুঃখে দিন কাটাইতে হয়। পতি-পত্নীরা প্রথম প্রেমের আঠায় বলিতে পারেন যে তাঁহাদের প্রেম আর দশজনের প্রেমের মত খেলো পদার্থ নয়, আর তাঁহারা চিরদিনই স্বাধীন ভাবে ও প্রেমে জোড়া বাঁধিয়া চলিবেন। সমাজে তাহাকেই আদর্শ ও পালনীয় করা উচিত যাহা দশের জন্য উপযোগী ও উপকারী।

যদি বুঝিতে হয় যে এমন দিন আসিয়াছে যখন লোকে দুষ্ট হইবে না ও কুকার্য্য করিবে না, আর রহিল কেবল—'শ্রুতৌ তস্করতা' তাহা হইলে ত বালাই নাই ; কিন্তু আদালতের কাজ ও উকিলের ব্যবসায় উঠিবার মত অবস্থা কল্পনা করা ত অসম্ভব! এক-আধজন বলিতে পারেন—পতির ভালবাসা গেলে তিনি দুঃখেই দিন কাটাইবেন, কিন্তু সকলের পক্ষে ত সে ব্যবস্থা করা চলে না। পতি যদি পালাইতে চা'ন, পালাইতে পারেন্ ; তবে তিনি পত্নীকে দুঃস্থ করিয়া নিজের সুখের ধ্বজা উড়াইয়া বেড়াইতে পারেন না।

যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা এ অবস্থার ফলের কথা ভাবেন না কেন? তাঁহাদের না ভাবিবার একটি কারণ শুনিয়াছি এই—যাহা প্রচলিত সনাতন প্রথা তাহাতে বিশ্বাস না থাকিলেও নাকি তাহা মানিয়া চলা গৌরবের কথা! আশ্চর্য্য যে এতবড় নির্বুদ্ধিতার কথা উচ্চারিত হইতে পারে! চিরাগত বা সনাতন মানিয়াই যদি চলিতে হয়, তবে ত কোন পরিবর্ত্তন বা কোন উন্নতি কোন সমাজেই হইতে পারে না। নানা সংস্কারে হাত দিয়াও যখন ইঁহারা এইরূপ কথা বলেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, হয় ইঁহারা কোনও স্বার্থে দশের মন রাখিবার জন্য হইয়াছেন কাপুরুষ, আর না-হয় অপ্রত্যক্ষে প্রাচীন সংস্কারের উপর মায়া আছে বলিয়া স্বাধীনতার প্রয়াসী হইয়াও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেন।

ইঁহাদের দ্বিতীয় উক্তি শুনিতে পাই যে, একনিষ্ঠ বিবাহ ঘটাইতে হইলে রেজেষ্ট্রি করার আইন ধরিতে হয়, যাহা বিদেশী রাজাদের হাতে বিধিবদ্ধ বলিয়া অপবিত্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে ও অনুন্নতদের সমাজে এ প্রথা ছিল ও আছে যে কেবল স্বজাতির লোকের মধ্যে ঢাক-ঢোল পিটিয়া ও জ্ঞাতি-বন্ধু জড় করিয়া বৈধ বিবাহ বিজ্ঞাপিত হইতে পারে।

সমাজের প্রসার কিন্তু যেখানে বাড়িয়া যায় আর বিবাহাদি হয় অনেক সময়েই নিজেদের পরিচিত জন্মস্থানের বহু দূরে, আর নানা প্রদেশের লোক আগেকার রীতি ছাড়িয়া এ-সম্প্রদায় সে-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ চালায়, তখন অনেক ফাঁকির অস্বীকার ও গোলযোগ এড়াইবার জন্য আইনের বিধানের বিবাহ রেজেষ্ট্রি করা ছাড়া উপায় থাকে না ; আইন যদি চাই-ই, তবে যে আইনের বাধ্যবাধকতায় বিবাহ অস্বীকার করিবার পথ থাকে না, সেই আইন চালাইতে হয়। এরূপ আইন ত শাসনকর্তাদের হাতে গড়া ছাড়া অন্য উপায়ে অসম্ভব। প্রয়োজনের সকল বিষয়ে আইন মানিতে হয় ; কাজেই প্রয়োজনের এই গুরুতর বিষয়ে এই পারিবারিক বিধানে হিতকর বাঁধা নিয়ম না মানা আহাম্মকি। নারীর স্বাধীনতা রক্ষার উপযোগী এই রেজেষ্ট্রি করিবার আইন গ্রহণ করা উচিত, না, একটা ফাঁকা ভাবের উচ্ছ্বাসে অহিতকর গোলযোগের সৃষ্টি করা উচিত ?

১৮৭২ অব্দে বিবাহ রেজেষ্ট্রি করার আইন পাস্ হইয়াছিল ; সে আইন নূতন সংস্কারকদের উদ্যোগে প্রবর্তিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অতি বড় সুখের কথা এই যে, সেই আইন কোন নির্দিষ্ট দলের বা ধর্মবুদ্ধির লোকের প্রতি প্রযুক্ত বলিয়া প্রচারিত হয় নাই। যদি সেরূপ হইত তবে সেই নির্দিষ্ট সংস্কারকদলের সঙ্গে যুক্ত না হইলে ঐ আইনে অন্য কেহ বিবাহ করিতে পারিত না। তবে এই আইনে এমন একটি বিধান আছে যাহার জন্য কোন-কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে অযথা আঁৎকাইতে দেখিয়াছি। বিধান আছে যে, বিবাহার্থীদিগকে প্রচার করিতে হইবে যে তাঁহারা সেই Hinduism মানেন না, অর্থাৎ সেই ধর্মমত মানেন না, যে মত অনুসারে বিবাহ হইতে হইলে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত প্রভৃতি চাই ও যে বিবাহে পতি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে

পারেন। এই Hinduism অর্থাৎ বামুন-তাই এর হিঁদুয়ানি যাঁহারা মানেন না—ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ জাতি স্বীকার করেন না—ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য না হইলে কোনও অনুষ্ঠান নিষ্ফল হইল মনে করেন না, তাঁহাদের মধ্যেও যদি বুকের পাটা এতটুকু না থাকে যে যাহা মানেন না তাহা তাঁহারা স্বীকার করিবেন, তবে ত বড় দুর্ভাগ্যের কথা! Hinduism বা উক্ত বর্ণিত হিঁদুয়ানি না মানার অর্থ যে, ভারতবাসীর জাতিবাচী হিন্দু শব্দকে দূর করা নয়, তাহা ত আইনেই পাকা রকমে সাব্যস্ত হইয়াছে; যাঁহারা ঐ আইনে বিবাহিত, তাঁহারা যে 'হিন্দু আইনে' সম্পূর্ণ শাসিত, তাহা ত স্থির হইয়াছে। চিতাবাঘ যেমন তাহার গায়ের দাগ মিটাইতে পারেনা, সিন্ধুর পূর্ব পারের ভারতবাসীরাও জাতিবাচী হিন্দুনাম অস্বীকার করিতে পারে না। মুসলমানেরা ঐ নাম নিতেছে না বটে, তবে পারস্য, আরব, ইউরোপ প্রভৃতি দেশের লোক উহাদিগকে হিন্দু বলে। তবে এ কথা ঠিক যে, মুসলমানেরা (গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশ বিশেষ ছাড়া) উত্তরাধিকার প্রভৃতিতে নিজের দেশের হিন্দু আইন মানে না। একজন ইংলণ্ডের লোক যদি খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্ম অস্বীকার করে, তবে সে ইংরেজ নাম হারায় না; এদেশের লোকেও যদি সুবিচারিত বিশ্বাসে হিঁদুয়ানি না মানেন, তবে তাঁহাদের হিন্দু নাম লোপ পায় না। ঐ হিন্দু নামটুকুর আকর্ষণেই এত গোল ঘটে বলিয়া উহার দীর্ঘ আলোচনা করিলাম।

বেরিষ্টার গৌর ১৮৭২ সালের ঐ আইনখানির সঙ্গে এমন কয়েকটি নূতন বিধি জুড়িয়া দিয়াছেন যাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিয়াছে। যাঁহারা কাজে অন্তরূপ হইলেও মুখে মানিবেন না যে—Hinduism মানেন, তাঁহাদের মন বুঝাইবার জন্য যে গোটাকতক নূতন বিধি জোড়া হইয়াছে, তাহার ফল কি হইয়াছে, বলিতেছি। গৌরের প্রবর্ত্তিত নূতন বিধি

অনুসারে বিবাহ সিদ্ধ হইতে হইলে পুরোহিত চাই না,—রেজেষ্ট্রি মাত্রই যথেষ্ট। তবুও নাকি Hinduism স্বীকার করা হইল! এ আইনের ফল যাহা হইয়াছে, তাহাতে কিন্তু উল্টা বুঝিলেন রাম। যে-সকল আইনসঙ্গত অধিকার হইতে ১৮৭২ সালের মূল আইন অনুসারে বিবাহ-*কারীরা বঞ্চিত হ'ন্ না, সে সকল অধিকার হইতে গৌরের প্রবর্তিত আইনে বিবাহকারীরা বঞ্চিত হ'ন্; হিন্দু আইনে তাঁহাদের উত্তরাধিকার* নির্ণীত হইতে পারে না। তাঁহারা হিন্দুর কোন প্রতিষ্ঠানের Trustee প্রভৃতি থাকিতে পারেন না ও বিবাহকারী পুরুষের পিতা, পুত্রটি বাঁচিয়া থাকিতেও পোষ্যপুত্র নিয়া পুত্রকে বংশের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন। তবুও পাকে-চক্রে Hinduism মানার গৌরবটুকু উহা না মানিয়াই, রক্ষা করিতেছেন ভাবিয়া, মনের ভাবের কল্পিত মোহকে চরিতার্থ করিতেছেন।

এত দৃষ্টান্ত দিলাম এই অবস্থাটি বুঝাইবার জন্য যে, মানুষ যে কুসংস্কার মানে না, অতর্কিতে সেই প্রাচীন কুসংস্কারের মায়ায় কেমন করিয়া কর্তব্যভ্রষ্ট হয়। ধর্মের দিকে যে কারণে অসার Sentiment বা ভাবের প্রতি অতর্কিতে মায়ার মোহ থাকে, তাহা 'জুজুর ভয় ছাড়" প্রবন্ধে লিখিয়াছি। এখানে শুধু এই কথাটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মানুষের পক্ষে কুসংস্কার ছাড়িয়া অবাধে স্বাধীন চিন্তায় ও কর্মে প্রফুল্ল মনে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে প্রাচীন সংস্কারের নিরপেক্ষ আলোচনা করা চাই ও সেই আলোচনায় বুঝিয়া নেওয়া চাই যে, প্রচলিত কুসংস্কারের যথার্থ বীজ বা মূল কোথায়।

মরণ ভোল

১

"শৃণোত্তু যো বা মরণাৎ বিভেতি"

ছেলেবেলায় বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম, মরণ ভোলা চাই, জরা-মরণ ভুলিয়া বিদ্যা অর্জন করা চাই, যাহা কিছু প্রাণ-ধারণের উপযোগী তাহা অর্জন করা চাই; যে তাহা করে, সে প্রাজ্ঞ বা পণ্ডিত বা বুদ্ধিমান্। যে বয়সে এই উক্তি পড়িতে হয়, তখন স্বপ্নেও জরার দুঃখ মনে আসে না, মরণ-ভয়ের জুজু দেখা দেয় না; কাজেই সেই উপদেশের বাণী মনে ধরে না, স্মরণে থাকে না। বুড়া যখন মর্মে-মর্মে বোঝে তাহার দিন ফুরাইয়াছে, তখন এ উক্তি তাহার কাছে নিরর্থক—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

সাধারণ কথা এই—মানুষেরা মরিতে চায় না, মরণকে ডরায়; অতি দুঃখেও কত বুড়া এই পরিচিত পৃথিবীকে আর এখানকার বাঁধা ঘরের ভালবাসার পদার্থকে ছাড়িতে চায় না। সেই অক্ষম ও দুর্বল বাঁচিয়া কি করিবে জানে না, তবুও বাঁচিতে চায়। অন্য দিকে আবার এ কথাও খানিকটা সত্য, কেহ কেহ দুঃখে বা অভিমানে ভাবে—মরিলে বাঁচি,—চোখ বুজিলে সকল জ্বালা জুড়ায়। এমন লোকও অনেক আছে যাহারা এই চিন্তায় বা ভাবের স্বপ্নে আঁৎকাইয়া ওঠে যে অমর হইতে হইবে,—এই জীবনের অভিজ্ঞতার বোঝা চিরকাল বহিতে হইবে—একদিন চোখ বুজিয়া সকল সুখ-দুঃখ ভুলিতে পারিবে না। চির জাগরণের স্বপ্ন মরণের ভয়ের মত বিভীষিকা। দেখিতে পাই বটে, কেহ

বাঁচিয়া থাকিতে চায়, কেহ চায় না; তবে ইসপের গল্পের যম কাছে ঘনাইলে প্রায় সকলকেই বলিতে হয়—জীবনের বোঝা নিও না, আবার মাথায় তুলিয়া দাও।

মানুষ-সৃষ্টির প্রায় প্রথম দিন হইতে নিদান পক্ষে পাঁচ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষেরা মরণের ভয়ে জড়সড় হইয়া উহার ছায়া দেখিয়া কেবল কাঁদিয়া আসিতেছে। এই যত্নের শরীর, এই সুখ-ভোগের শরীর, এই বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ও আশা মাটিতে মিলাইবে বা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, এ চিন্তা লোক-সাধারণে পুষিতে পারে না, সহিতে পারে না। জীবনের প্রতি মানুষের যে মৌলিক টান আছে তাহার নিগূঢ় ঝোঁকে সে পাঁচ লক্ষ বৎসর আগে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, স্বপ্নে যখন অশরীরী হইয়া নানা স্থানে নানা কাজ করা যায় ও দুর্গম স্থানে যাওয়া যায়, তখন আমাদের মধ্যে একটা অশরীরী আমি আছে, যে জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, মরণে মরে না। সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়া পাঁচ লক্ষ বৎসরেরও আগে পাহাড়ের গুহায় মৃতের শরীর পুঁতিয়া মৃতের ও পারের ভোগের জন্য কত কিছু ভোগের সামগ্রি মৃতদেহের কাছে পুঁতিয়া রাখা হইত। সে বিশ্বাস মানুষের সমাজে আজও আছে। এ দেশের শ্রাদ্ধের পিণ্ডদানের মত, শ্মশান-ঘাটে পারের কড়ি দেওয়ার মত ও ভোগের সহচরী করিয়া মৃতের পত্নীকে চিতায় পোড়াইবার মত নানা রকমের আয়োজন পৃথিবীর নানা দেশে দেখিতে পাওয়া যায়; হয় ত এখন লোকে বিশ্বাস করে না যে, মানুষের আত্মার মত পারের কড়ির আত্মাগুলি বা পিণ্ডের আধ্যাত্মিক রসটুকু ওপারে গিয়া পৌঁছায়, কিন্তু তবুও প্রাচীন বিশ্বাসের অনুযায়ী প্রথা সমাজে রহিয়াছে।

এই মানুষের মধ্যে একটা স্থায়ী মানুষ আছে বা আত্মা আছে—এই বিশ্বাস বা ধারণা সারা পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই প্রবল। সে আত্মা

শরীরের মালমসলায় গড়া নয়, ইহাই মৌলিক ধারণা; তবে উহার রূপের ও প্রকৃতির বিবরণ অনেক সাহিত্যে ও প্রবাদে পাওয়া যায়। এ দেশের প্রাচীন কালের নানা বর্ণনার মধ্যে একটা বর্ণনা এই, সে আত্মা অবয়বে হাতের বুড়া আঙুলের মত, আর শরীর ধ্বংস হইলে মাথার চাঁদি ফাটাইয়া বা ফুটা করিয়া চলিয়া যায়; সেই জন্য মাথার সেই স্থানের নাম হইয়াছে ব্রহ্মরন্ধ্র। ইহা ছাড়া এ ধারণাও আছে যে, আত্মাকে ধরিতে পারা যায় না বটে, তবে তাহার রূপ হুবহু বাহিরের শরীরের মত; আর সেই রূপধারী ও সূক্ষ্মশরীরধারী আত্মাকে বেড়িয়া আছে ঠিক ঐ রকমেরই সাতটা খোসা। জ্ঞানে অভিমানী থিয়সফিষ্টেরা এ দেশের সেই ধারণার অনুরূপ আত্মাকেই মানেন ও সেই রকমের সূক্ষ্ম শরীরে অনেক মৃত লোকের আত্মাকে দেখিতে পান বলেন। এ দেশে ও অন্য নানা দেশে আত্মা সম্বন্ধে আরও অনেক রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সকল ছেলেমানুষি খেয়ালি কল্পনার তলায় এই মূল বিশ্বাসটি আছে অটল যে, ক্ষয়শীল শরীরের মধ্যে আছে এক অক্ষয় আত্মা। এ সঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, একটা আত্মার সঙ্গে জুড়িয়া হউক, আর না জুড়িয়া হউক, এই মাটির শরীরটিকে এক সময়ে মানুষে খাঁটি ক্ষয়শীল মনে করে নাই। মরণ-কথার প্রসঙ্গে তাহা বলিতেছি।

চিরদিন মানুষ চলিয়াছে অফুরন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বহিয়া মরণকে ডরিয়া ও মরিতে না চাহিয়া। কিসে মানুষের ধাতু বা ধাত্ বদলাইয়া তাহাকে অমর করা যায়, না হয় নিদান পক্ষে বৈদিক ঋষিদের প্রার্থনীয় আয়ু পাওয়া যায়, অর্থাৎ "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" কথাটি ঠিক থাকে, তাহার জন্য এ কালের জীবন-বিজ্ঞানের সাধক পণ্ডিতেরা বহু চেষ্টায় নানা পরীক্ষা করিতেছেন। বুড়ার শরীরে বাঁদরের "গ্লাণ্ড"

ঢুকাইয়া তাহাকে জোয়ান করিবার অনেক পরীক্ষা চলিতেছে। অতি সেকালে মানুষেরা গভীর দুঃখে ভাবিয়াছিল, কেন তাহাদের আকাঙ্ক্ষার *শরীর, ভোগের শরীর ফুরাইয়া যায়, আর এই পৃথিবী যেমন ছিল তেমনই থাকে। এ চিন্তায় এই মোটামুটি সিদ্ধান্ত করিয়াছিল* যে, মানুষের মরণ তাহার পাপের দণ্ড। দেবতা মানুষকে যাহা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, সে অবাধ্য হইয়া তাহা করে নাই ও তাহার ফলে তাহাদের নারী জাতি ইচ্ছায় মানস-সন্তান না পাইয়া গর্ভধারণের ক্লেশ সহিবার অভিশাপ পাইয়াছিল, আর সারা মানুষের ভাগ্যে মরণের অভিশাপ আসিয়াছিল। প্রকারান্তরে সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই মরণের এই ইতিহাস পাওয়া যায়, ও মনুর মত মানসপুত্র না পাইবার কারণ পাওয়া যায়, তবে বাইবেলের জন্ম-মরণতত্ত্বে এই তত্ত্বটি আছে অতি সরল ভাষায় ব্যাখ্যাত। আমরা এখন আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি যে, মানুষ সৃষ্টির আগে যখন গাছ-পালা ও পশু-পক্ষীর সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া সকল দেশের শাস্ত্রেই স্বীকৃত আছে, তখন বুদ্ধি বেশি প্রখর না থাকিলেও মানুষেরা এক সময়ে জন্ম-মরণের এমন বোকাটে তত্ত্ব খাড়া করিল কেন! গাছ পালা জন্মিত, বাড়িত, মরিত, আর তাহা ছাড়া অধিকতর প্রত্যক্ষ ছিল জীব-জন্তুর গর্ভধারণ, জন্ম ও মরণ। তাহারা ত পাপ করিয়া পাপের দণ্ড পায় নাই, তবে তাহারা ভব যন্ত্রণা বা জন্মের যন্ত্রণা বা গর্ভধারণের ক্লেশ পাইল কেন, আর মরণ ভুগিতেও বাধ্য হইল কেন? তাহার মানে এই, মানুষেরা গভীর স্বার্থ-বুদ্ধিতে আপনাদের কথাই ভাবিয়াছিল, আর নিজেদের কথা ভাবিবার সময় পরের দিকে তাকাইবার কৌতূহল ও বুদ্ধি পায় নাই।

এ দেশে এক সময়ে কেহ কেহ যখন দেখিয়াছিল যে, নাকে বাতাস

না টানিলে প্রাণ বাঁচে না, শ্বাস বন্ধ হইলে মরণ ঘটে ও আরও যখন, দেখিয়াছিল যে পরিশ্রম করিলেই হাঁৎ-ফাঁৎ করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে হয়, তখন এই কৌশল খুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছিল যে কিসে হাঁৎ ফাঁৎ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্বাসের পুঁজি খরচ হইয়া না যায় ও কিসে নিশ্বাস টানিবার নিয়ম গড়িয়া নিশ্বাসকে অশেষ করা যায়,—অর্থাৎ প্রাণটাকে চিরকাল বাঁচাইয়া রাখা যায়। বাঁচিবার জন্ত মানুষের আছে প্রাকৃতিক মৌলিক টান; তাই সে আগ্রহে এ কৌশলের পরীক্ষা করিয়াছে। এ সাধনায় কেহ অমর হয় নাই বটে, তবে অন্যান্য প্রাণ-পোষা সংস্কারের বেলায় যাহা ঘটে এখানেও তাহা ঘটিয়াছে; মনে করিয়াছে ঠিক যেমন করিয়া শ্বাস টানার কাজ করিতে হয়, তেমন করিয়া করা হয় নাই। এই কৌশলের শিক্ষকেরা বা গুরুরা বুঝাইয়াছেন যে ঐ রকমের সাধনায় কেহ কেহ যুগ-যুগান্তর বাঁচিয়াছেন ও কেহ কেহ বা অমর হইয়া গট্ হইয়া বসিয়া আছেন। মরাটা যখন দুর্ভাগ্য, তখন এ আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ অপ্রত্যক্ষ ঘটনাকে অনেকে খাঁটি সত্য বলিয়া মানিয়াছিল, অথবা এখনও অনেকে মানে। সকল দিক দিয়াই দেখি, না মরিবার সাধনাই মানুষের বড় সাধনা।

শরীরকে মানুষেরা, যে আকাঙ্ক্ষায় অমর করিতে চাহিয়াছে, সে আকাঙ্ক্ষার বীজ নিশ্চয়ই আমাদের শরীরের মৌলিক ধাতুর মধ্যে গূঢ় ভাবে আছে। শরীরের ইতিহাস পাইলেই সেই ইতিহাস পাইব। এই শরীরের ইতিহাস পাই জীবনবিজ্ঞানের (Biology) আলোচনায়। *শরীরের সেই সত্যকার ভিত্তি বুঝিবার পর আত্মার তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা* করিলেই ভাল হয়; তবে তাহার আগে মানুষেরা বাঁচিয়া থাকিবার নিগূঢ় টানে নিছক কল্পনার খেয়ালে যে তত্ত্ব বা ফিলসফি গড়িয়াছে, তাহার অসারতা আগে বুঝিয়া নেওয়া ভাল। কুসংস্কারের আঁধার না

গেলে সেই সত্যের আলোকের আভাস পাওয়া যাইবে না, যাহা মানুষের আত্মাবিষয়ক ধারণার মূলে স্থির ভাবে আছে।

যাহারা মরিয়া সূক্ষ্ম আত্মা হইয়া থাকার চেয়েও না মরিয়া এই শরীরটাকেই তাজা রাখিতে চাহিয়াছিল, তাহাদের আকাঙ্ক্ষাতেই ঠিক ধরা যায়, কেন মানুষেরা চিরজীবন কামনা করে। মানুষেরা সশরীরে চিরজীবী হইতে চাহিয়াছিল এই জন্য যে, তাহারা যে সকল ভোগের সুখ চায় ও আনন্দের উচ্ছ্বাস চায় তাহা এই শরীরযন্ত্র খসিয়া পড়িলে পাইবার আশা করিতে পারে নাই। আমার শরীর আছে, তাই ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের আনন্দ আছে। শরীর ধ্বংস হইলে সূক্ষ্ম আত্মার সেরূপ ভোগের কামনা ও পরিতৃপ্তির সুখ থাকিতে পারে না। প্রেমের বেলায়ও সেই কথা। শরীর আছে বলিয়াই যেমন ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, সেইরূপ আমাদের শরীরের প্রকৃতির ফলেই প্রেমের জন্ম। আমরা বাড়িয়া উঠি মা-বাপের কোলে বসিয়া, সখা-সহচরদের সঙ্গে খেলা করিয়া ও ঝগড়া করিয়া ও অন্য রকমে পরের মুখ চাহিয়া। বয়সে আমাদের শরীরের অবস্থায় যৌন আকর্ষণ বাড়ে, আর সেই আকর্ষণে পতি-পত্নীর সম্বন্ধ ঘটাই ও বংশ বাড়াইয়া জীবনে প্রেমের মহাকাব্য রচনা করি। যে প্রবৃত্তির স্থায়ী মূল এই শরীরযন্ত্রে, সে মূল যখন একেবারে যন্ত্রখানি গেলেই শুকাইয়া মরিতে বাধ্য, তখন আর কেমন করিয়া শরীর-নাশের পরে সেই প্রেমের উৎসবের আনন্দ ভোগ করিবার তৃষ্ণা থাকিতে পারে? পরের মুখ চাহিবার প্রয়োজন এই শরীর-জাত ও সমাজ-জাত অবস্থার ফল। কাজেই শরীর গেলে সে আকাঙ্ক্ষা থাকে কই, যাহার পরিতৃপ্তির জন্য মরণের ছায়া দেখিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদি? যে আকাঙ্ক্ষা দিয়া আমাদের না মরিবার আশা গড়া, সে আকাঙ্ক্ষা হইল যদি খরগোসের শিঙ্ দেখিবার মত

আকাঙ্ক্ষা, তবে সে আকাঙ্ক্ষায় গড়া যে রকমের আত্মা কল্পিত হয়, সে আত্মার থাকা-না-থাকায় প্রভেদ কি? মাথা না থাকিলে আর মাথা ব্যথা থাকে কোথায়!

এই প্রসঙ্গে একজন বিদেশী বড় কবির সুরচিত লউ দেমিয়া কবিতাটির দৃষ্টান্ত দিতেছি। পতি গেলেন যুদ্ধে মরিয়া পরপারে, আর তাঁহার সাধ্বী পত্নী স্বামীকে দেখিবার জন্য যমের দুয়ারে ধন্না দিয়া বর পাইলেন—একবার তাঁহার স্বামী তাঁহাকে দেখা দিবেন। স্বামী আসিয়া সূক্ষ্ম শরীরে দেখা দিলেন; পত্নী কোনও শারীরিক সম্ভোগের কামনা না রাখিয়া যাহাকে পবিত্র প্রেম বলে সেই প্রেমে, শোকে, উচ্ছ্বাসে দু'হাত বাড়াইয়া স্বামীর সূক্ষ্ম শরীরকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। স্বামী পত্নীকে বুঝাইলেন যে, সেই আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা, সেই প্রেমের উচ্ছ্বাস পরপারে অজ্ঞাত ও অভাবনীয়। আমরা বুঝিয়াও বুঝি না, আমাদের প্রেমের যে গভীর অনুরাগ জীবনের শিরোমণি ও আকাঙ্ক্ষার বেদনায় মধুর, তাহা শরীরের বিয়োগে হয় কল্পিত আকাশ-কুসুম। জীবনের মানে কি, অথবা পরিণতি কি, ও আমাদের চিরজীবনব্যাপী আকর্ষণের মূলে কি সত্য আছে, তাহা বুঝিবার আগে যাহা কল্পনা ও ধাঁধা তাহা উড়াইবার প্রয়োজন আছে।

থিয়সফিষ্টেরা ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অলিভার লজের দলের লোকেরা যে ভাবে আত্মার ছবি দেখেন, সেই ভাবে এ দেশের একজন মিডিয়মের ঘাড়ে ভূত চাপাইয়া বছর কুড়িক আগে "নব্যভারত" মাসিকে পরপারের খবর লিখিতেন ও মৃত পরিচিত বড় লোকদের বিবরণ দিতেন। আমি তখন "ভূতের কথা" নাম দিয়া নব্যভারতে ১৩১৮ সালে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। লিখিয়াছিলাম ঠাট্টা তামাসার উপযোগী হাল্‌কা ধরণে; তবুও এখন তাহার খানিকটা অংশ এই সঙ্গে ছাপিতেছি।

ভূতের কথা

আমরা ভূত—বহুবচনটা সম্পাদকীয় নয়, গৌরবের অর্থেও নয়; আমরা বহু আত্মা এপারে আসিয়া একসঙ্গে প্রায় মিশিয়া যাই বলিয়াই এই বহুবচন। সে কথা পাঠকেরা পরে বুঝিতে পারিবেন। আমরা ভূত; সেকালে মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের বাহুল্যের পূর্বে স্ত্রীজাতির ঘাড়ে চাপিয়া, নাকি-সুরে কথা কহিয়া খাসা আসর জম্‌কাইতাম। এখনও যে ছাপা পত্রিকাগুলি স্ত্রীলোক অপেক্ষা মানুষের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করে তাহা নয়। তবে অন্তঃপুরচারিণীর গতিবিধি পত্রিকা পরিভ্রমণের মত অবাধ নয় বলিয়া একালে সম্পাদকদের স্কন্ধই আমাদের আবির্ভাবের সুপ্রশস্ত আসর। বৃষস্কন্ধ সম্পাদকেরা ক্ষুণ্ণ হইবেন না; তাঁহাদের ঘাড়ে যে সকল জীবিত লেখক আত্মকর্মক্ষম-দেহের ভার চাপাইয়া থাকেন, আমাদের অশরীরী আত্মা তাহা অপেক্ষা ওজনে লঘু। অন্য দিকে আবার আমাদের অজীবিত জীবন কাহিনী অতি মধুর। একে লঘু, তায় মধুর; কাজেই এই ভূতের কথা বৈদ্যশাস্ত্র-মতে নিশ্চয়ই সুপথ্য হইবে।

ইতিহাস শুনাইবার পূর্ব্বে আমাদের নাম কি, তাহা বলা আবশ্যক। আমরা জড়শরীর ফেলিয়া দিয়া তোমাদের চক্ষে অদৃশ্য হই বলিয়া, তোমরা প্রাচীন কালে আমাদিগকে "ইহলোক হইতে গত" অর্থে "প্রেত" নাম দিয়াছিলে। ধাতুর অর্থ বদলায় নাই, কিন্তু তোমাদের ধাতু এমনই বিগড়াইয়াছে যে, প্রেত অর্থে একটা ঘৃণ্য পদার্থ বুঝিয়া থাক। তোমরা কোন্ ধর্ম্মমতে ও কি সাহসে আমাদিগকে গণবর্গের ভূত সংজ্ঞাটি দিয়াছ, তাহা জানি না। অন্য দিকে আবার আমরা জীবিত না হইলেও অতীত নয়, বরং এখন আজকালের প্রভেদ বুঝিতে পারি না, ইহলোক-

পরলোকের প্রভেদকে ধাঁধা বলিয়া বুঝিয়াছি। তবু আমাদিগকে ভূত বা অতীত বলিবে কেন?

এই দেখ, যেদিন বিহারীলাল ভাদুড়ি থিয়সফি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর ডাইলিউশন প্রয়োগ করিয়া আমার জড়শরীরের উত্তাপটুকু রাখিতে পারিলেন না, দ্বারিক কবিরাজ আমার নাড়ী টিপিয়াই পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়া গেলেন ও ডাক্তার জগবন্ধু বসু আমাকে গতাসু মনে করিয়া ত্রস্তপদে ও ব্যস্তহস্তে ফিসের টাকা পকেটস্থ করিলেন, তখন সকলেই বলিল, আমি নাই। আমি কিন্তু তখন হোমিওপেথির জল, বৈদ্যের গুলি ও ডাক্তারের চোঙ্গাকে অগ্রাহ্য করিয়া শরীর-পরিহারের নব অনুভূতি উপভোগ করিতেছিলাম। পৃথিবীতে মাটী নাই, সাগরে জল নাই, আকাশে বায়ু নাই, ব্যোমপথে শূন্যতা নাই, আলোক নাই, কেবল আমি বা আমরা আছি। আমরা লক্ষ লক্ষ আত্মা স্বতন্ত্র থাকিয়াও এমন ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া মিলিত হইতে লাগিলাম যে, যদি আমার পা থাকিত, তবে সে পাখানি চুলকাইলে বুঝিতে পারিতাম না যে, কাহার পা চুলকাইতেছি। আমার এই মুখবন্ধ হইতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে আমি খাঁটি ভূত, মেকি নয়।

কে খাঁটি, কে মেকি, পাঠকেরা একটু তাহা বুঝিয়া নিবেন। যাঁহারা এপারে আসিয়াও তোমাদের ওপারের লেখা অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতেছেন, অথবা মরিয়া গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াও হাতড়াইয়া যুক্তি দিয়া পরলোকের কথা বলিতেছেন, অথবা অশরীরী আত্মার জন্য সপ্তমলোক অষ্টমলোকের কল্পনা করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয় জাল, অত্যন্ত মেকি অথবা নিরবচ্ছিন্ন ধাঁধা। এবার আমাদের প্রশান্ত ভূতের রাজ্যে নূতন ধরণের ভূতের উৎপাত দেখিয়া ভূতকুলের কলঙ্ক নিবারণের জন্য সম্পাদকের গুরু শরীরে একটু লঘু চাপ দিতেছি।

অনেকেই ভূত-দেখার গল্প শুনিয়া থাকেন ; গল্পগুলি যে মিথ্যা, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝাইয়া দিতে পারি। পৃথিবীতে যাহার শরীরের যেমন চেহারা ছিল, সেই চেহারা নিয়া, সেই পরিচ্ছদ নিয়া, সেই দাড়ি-গোঁফ নিয়া কোন উপায়ে আত্মা কাহাকেও দেখা দিতে পারে না। অথচ ভূতের গল্পে পরিচিত রূপ ও পরিচিত পরিচ্ছেদের কথা ওঠে। আত্মাকে অশরীরী বলিয়া স্বীকার করিয়া আবার তোমরা কেমন করিয়া সে আত্মার অবয়ব দেখিতে পাও, আমরা তাহার কৈফিয়ৎ চাহিতেছি। তোমরা কি বলিতে চাও যে, মানুষের আত্মার মত তাহার পরিচ্ছদেরও আত্মা আছে ? যদি না থাকে, তবে আমরা ভেল্কি করিয়া পরিচ্ছদ পরিয়া দেখা দিব কেন ? সমগ্র মানুষের একটা অশরীরী অরূপ আত্মা ছাড়াও কি বাহিরের দেহ-আয়তনের একটা স্বতন্ত্র আত্মা আছে ? যদি আমরা দাঁড়ি-গোঁফযুক্ত সূক্ষ্ম শরীর নিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে প্রতিদিন যত দাঁড়ি-গোঁফ ও চুল কাটা যায়, নিশ্চয়ই তাহাদের আত্মা স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিত। তাহা হইলে এতদিন এই পরলোক অথবা স্বর্গটি "চুলের স্বর্গ" হইয়া উঠিত।

যাঁহারা ভূতের গান শুনিতে পান, স্পর্শ অনুভব করেন, অথবা ভূতের কেশগুচ্ছ দেখিতে পান, নিশ্চয়ই জানিবেন যে হয় তাঁহারা শিরোরোগে ভুগিতেছেন, না হয় অতিমাত্রায় আফিম্ সেবন করেন, না হয় তাহা মিথ্যাবাদী। যখন একটা কণ্ঠ ছিল ও আমাদের পরিমিত ভাব কেবল সেই কণ্ঠপথেই বাহির হইত, তখন সঙ্গীত নামে পদার্থটির সৃষ্টি হইত। এখন মাথা গিয়াছে, মাথার ব্যথাও গিয়াছে—কণ্ঠ গিয়াছে, সঙ্গীতও গিয়াছে। আমাদের এপারের ভাবের উচ্ছ্বাসে যদি সত্য-সত্যই সঙ্গীত উঠিত, তবে তাহা কদাচ শারীর-সঙ্গীত হইতে পারিত না ; অর্থাৎ কণ্ঠের যন্ত্র-সাহায্যে যে-যে গান যে প্রকার শব্দ করিয়া

জাগিয়া ওঠে, অথবা স্বর ও কণ্ঠ-যন্ত্র পরিমিত বলিয়া যে সঙ্গীত একটা ছন্দের তালে তালে কাঁপিয়া ওঠে, সেই সঙ্গীত, সঙ্গীতের সে স্বর, সে ছন্দ, সে তাল, কদাপি আমাদের গানে থাকিতে পারে না। আমাদের ভাবের উচ্ছ্বাসবিশেষকে সঙ্গীত নাম দিলেও সে সঙ্গীত শুনিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। আমাদের বিশেষ অনুরোধ, তোমরা মেকি ভূতে বিশ্বাস করিও না। বর্বরের ঘাড়ে যে কৃত্রিম ভূত নামিয়া পল্লীবাসীদিগকে চমকিত করে, থিয়সফির সভাতেও তাহারাই ভদ্র পোষাক পরিয়া খেলা করে। তাহারা সকলেই জাল, সকলেই মেকি, সকলেই ধাঁধা।

তাহারা ধাঁধা, কিন্তু আমরা নই। কিন্তু হায়, এবারে মরিয়া বাঁচিয়া উঠিয়া ভাবিতেছি, আমরা ধাঁধা হইলাম না কেন। এই অসীম জীবনভার বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন জীবিত ছিলাম, ছিলাম ভাল; দুঃখ-কষ্ট হইলেই নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতাম, একবার মরিলে বাঁচি। তখন মৃত্যুর পারে দুঃখ-অবসানের একটা আশা ছিল; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে মরিয়াও সত্য-সত্য বাঁচিয়া থাকিতে হয়; যাহাকে "মরিলে বাঁচি" বলে, সে সুখটুকু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

রৌদ্রের সঙ্গে ছায়া নাই, জ্যোৎস্নার কোলে অন্ধকার নাই, দম্‌ফাটা আনন্দের সঙ্গে বুকভরা বিষাদের ভাবনা নাই। এই ছায়াহীন, এই নিশ্চিন্ত অসীম জীবন নিয়া বড় গোলে পড়িয়াছি। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে খৃষ্টিয়ানদের এঞ্জেলেরা একঘেয়ে সুরে এক অফুরন্ত মহিমার গাথা বা দেবস্তুতি কতদিন গাহিবে? একদিন রাত্রে ঘুম না হইলেই তোমরা ছট্‌ফট্ কর ও ঔষধ খাও; কিন্তু আমাদের এই অশ্রান্ত অপরিমিত জাগরণ ডুবাইবার কোন ঔষধ নাই। আমরা জাগিয়া জাগিয়া, বাঁচিয়া বাঁচিয়া পরিশ্রান্ত। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সকল জাতিরই

ধর্মকল্পনা বা পুরাণ পড়িয়া যে নরকের কথা শিখিয়াছিলাম, তাহা এখন অধিক প্রলোভনের সামগ্রি মনে করিতেছি ; কেন না, তাহাতে বৈচিত্র্য আছে। তপস্বীরা যে স্বর্গের প্রলোভনে সংসারের খাঁটি সুখটুকু উপেক্ষা করিয়াছিল, পাদ্রিরা যাহা লাভ করিবার আয়োজনে শান্তিময় পৃথিবীতে বিদ্রোহ ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, সে স্বর্গ এমন ভীষণ জানিলে, তাহারা নিশ্চয়ই নরক লাভের জন্য প্রার্থনা করিত। সুখে থাকিতে ভূতের কিল খাইয়া যাহারা সংসারকে উপেক্ষা করে, তাহারা যথার্থই পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করে ; কেন না, হাসিশূন্য শুষ্ক মুখ নিয়া নির্জনে পেচকসুলভ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিলে পৃথিবীর উপর স্বর্গের প্রতিবিম্ব পড়ে। যখনই ভাবি, এই সুদীর্ঘ জীবন কদাপি শেষ হইবে না, কখনও মরণের নিস্তব্ধ শান্তি আমাদের জাগরণের অশ্রান্ত শ্রান্তিকে ঢাকিয়া ফেলিবে না, তখনই হাঁপাইয়া উঠি।

বৈদিক ঋষিগণ মাথা খুঁড়িয়া এক শত বৎসর পরমায়ুর জন্য প্রার্থনা করিতেন ; কিন্তু নিশ্চয়ই ৭৭ বৎসর ৭ মাস ৭ দিনের পর যখন ভীমরথী উপস্থিত হইত, তখন ভোগময় যৌবনের প্রার্থনার ফল সুখকর হইত না। নিশ্বাসটাকেই জীবন মনে করিয়া যোগীরা যখন নিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া চিরজীবন বাঁচিয়া থাকিবার উদ্যোগ করিতেন, তখন যদি তাঁহারা দম আট্‌কাইয়া না মরিতেন, তবে নিশ্চয়ই অল্প দিনের পরেই যোগপথের নূতন পথিকদিগকে ঐ বিকট সাধনার পথ হইতে নিবৃত্ত করিতেন। ওপারে হউক, এপারে হউক, কোথাও নিরবচ্ছিন্ন জীবন সুখকর হইতে পারে না।

আমাদের লীলা-খেলা, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ভালবাসা, আমাদের আমি-জ্ঞান বা আত্মা যে দেহ-পিণ্ডের অবস্থা পরিবর্তনের ফল মাত্র, সে দেহ-পিণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে শুষ্ক জলাশয়ের তরঙ্গ ও বুদ্বুদের

মত আমাদের সকল তরঙ্গ, সকল বুদ্বুদ, সকল আত্মা মিলাইয়া যাইবে বলিয়া আশা ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, নাছোড়বান্দা আত্মা জোঁকের মত বিশ্ব-শরীরে লাগিয়া রহিয়াছে; দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের মত সে জলেও ডুবিল না, আগুনেও পুড়িল না।

আমরা এখন এই অসীম অনন্ত আত্মা নিয়া কি করিব? হেলেলুজা-গীতি তিক্ত হইয়া গিয়াছে, সাধুদের নয়ন-নিমীলিত সাধনার দৃশ্য অসহ্য হইয়াছে ও নেমাজ পড়িতে পড়িতে আত্মার কোমরে ব্যথা ধরিয়াছে। যাঁহারা ওপারে বেশ সুখে বসিয়া আছেন, ও আলোক-ছায়া ও সুখ-দুঃখে বিচিত্রতাময় অনুভূতি উপভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ সুখের নামে অস্বাভাবিক দুঃখের কল্পনা করিয়া কবি-নামে খ্যাতিলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সঙ্গীতে গীত হয় "সেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা, চিরদীপ্তিনীলাকাশে।"

সেকালের স্বর্গ ছিল ভাল। কিন্তু যে ক্রমবিকাশের নিয়মে বানরসদৃশ জীব মানুষ হইয়া উঠিল, সেই নিয়মে প্রাচীনকালের ইন্দ্র রাজার স্বর্গ পরিবর্তিত হইয়া অশরীরী আত্মার নূতন স্বর্গ গড়িয়া উঠিল। সেকালে মানুষ ছাড়া অন্য জীব-জন্তুর মত আত্মাও স্বর্গে আসিতে পারিত; জড় পদার্থের আত্মাও স্বর্গে আসিতে পারিত; কিন্তু এখন আর পারে না। শ্মশান-ঘাটে কড়িগুলি পড়িয়া থাকিত, কিন্তু তাহাদের আত্মা পারের কড়ি হইয়া ভবপারের খেয়াঘাটে উপস্থিত থাকিত,—শ্রাদ্ধের উৎসর্গ করা বৃষের আত্মার লেজ ধরিয়া বৈতরণী পার হইতে পারা যাইত। এত সুবিধা থাকিতেও সেকালের লোক সকল ভোগের সামগ্রি চিতায় পুড়াইয়া এপারে আনিত না। কেবল কখন কখন কতকগুলি স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া আসিত। সুবিধা থাকিতেও যে তাহারা ধনসম্পদ বহিয়া আনিত না, তাহার কারণ এই যে, যজ্ঞ করিয়া এপারেই

তাহারা অনেক ভোগের সামগ্রি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিত। তাহা ছাড়া আবার প্রভাত-ভ্রমণের জন্য মন্দাকিনীর তীর ছিল, বাগানবাড়ীর জন্য নন্দনকানন ছিল, ব্যায়ামের জন্য অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ ছিল, সন্ধ্যার শ্রান্তি অপনোদনের জন্য অফুরন্ত সুধা ছিল, ও বিনা টিকিটে ইন্দ্রের রাজসভায় নৃত্য-গীত দেখিবার সুবিধা ছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এখন আর চুল-দাঁড়ির স্বর্গ নাই ; মানুষের আত্মা ছাড়া আর কেহই এপারে আসিতে পারে না। কিন্তু যদি আসিতে পারিত, তবে স্বর্গবাস একটু সুখকর হইতে পারিত। গয়ায় পিণ্ডদান না করিয়া পুত্রেরা যদি শ্রাদ্ধের সময় থিএটারের অভিনয় দিতেন, পণ্ডিতসভার কচ্‌কচি না করাইয়া একটা ইয়ারদলের হাসি-তামাসার মজলিস্ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে একটু নৃত্য-গীত ও হাসির আনন্দ সেকালের বৃষের আত্মার মত এপারে আসিয়া পৌঁছিতে পারিত। কিন্তু তাহাতেই বা ফল কি হইবে? যতদিন মরণের ভয়ে বাঁচিয়াছিলাম, যতদিন আমার অনির্দিষ্ট জীবন-ধারণের বাসনা একটা অনন্ত-জীবন-পিপাসার মত ছিল, সেই বাসনার প্রমাণেই আত্মাকে অমর বলিয়া বুঝিয়া নিতাম ও কল্পনার বলে মৃত্যুভয় জয় করিতাম, সেদিনকার উৎসাহ আর নাই। পরলোক যখন অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত ছিল বলিয়া তাহার আভাস পাইবার জন্য থিয়সফির বক্তৃতা শুনিতাম ও কল্পিত ভূত নামাইয়া পরলোকের তত্ত্ব বুঝিতে চাহিতাম, সেদিনকার গাঢ় কুয়াসা কাটিয়া গিয়াছে। জীবনের পরপারে আসিয়া মৃত্যুর প্রহেলিকা সরল রেখার মত সোজা হইয়া গিয়াছে। ভ্রান্তিশূন্য দীর্ঘ জাগরণের পর সেই একই জাগরণ সূর্য্যের আলোক অপেক্ষাও প্রখর হইয়া আমার চিন্তাকে দগ্ধ করিতেছে। ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক, আমাকে বা আত্মাকে বাঁচিয়া থাকিতেই হইবে। এই দগ্ধ আত্মা বা

দুরাত্মা যে পথ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে, এখন সেই পথের দিকে তাকাই ও অতীতের অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া আলোকের তীব্রতা পরিহার করিতে চেষ্টা করি। মন ভুলাইবার সকল চেষ্টাই যখন বিড়ম্বনা, তখন আমাদের ভ্রান্তিহীন ভূতের জীবন যেমন আছে তেমনি থাকিবে।

আহার ও প্রেম শারীরিক জীবনের ভিত্তি ও অবলম্বন। না খাইলে কোন শরীরী বাঁচে না ও পরের সঙ্গে ভাব না করিয়া অর্থাৎ সমাজ না গড়িয়া কেহ বাড়িয়া উঠিতে পারে না। কাজেই যখন শরীর খসিয়া পড়ে তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত সকলই খসিয়া পড়ে। যখন পরের মুখের দিকে চাহিতে হয় না, পরের কাছে কিছু লাভ করিবার প্রয়োজন থাকে না, তখন শরীর-জাত ও সমাজ-সংঘর্ষণ-জাত সকল প্রবৃত্তি ও ভাবনাই অস্তমিত হয়। আমাদের সকল ভালবাসার মূলেই পরকে টানিয়া আপন করিয়া নিয়া আপনি বাড়িয়া উঠিবার প্রবৃত্তি রহিয়াছে। যখন বাড়িয়া উঠিবার প্রয়োজন দূর হইয়া যায়, তখন সে ভালবাসা আমূল শুকাইয়া মরে। মানুষের এমন সুখ, অনুভূতি বা চৈতন্য নাই, যাহা দুঃখ, অন্ধকার ও জড়তা-নিরপেক্ষ। মানুষের জীবন-নাশের গতিই দুঃখ, শারীরিক স্বাতন্ত্র্যই চৈতন্য ও পরিমিত অনুভূতির নামই স্বতন্ত্রতা ; ও সেই পরিমিত ভাবেরই একদিকের নাম আলোক, অন্যদিকের নাম অন্ধকার। কাজেই শরীর খসিয়া পড়িলে শারীরিক জড়তা হইতে মানসিক চৈতন্য পর্য্যন্ত কিছুই বাঁচিয়া থাকে না।

যাঁহারা এই জলের মত তরল প্রবন্ধটি পড়িয়াও পরলোক-তত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন, তাঁহাদিগকে একটা অমূল্য উপদেশ দিতেছি। পরলোক-তত্ত্ব মানুষের বুদ্ধির অগম্য ; কদাচ কেহ বুঝিতে পারে নাই, কদাচ কেহ বুঝিতে পারিবে না।

বুঝিতে পারে না বলিয়াই কল্পনাবলে ইহলোকের পরদাখানি ছিঁড়িয়া কত লোকে পরলোকের দিকে উঁকি মারে; ও কখনও বা মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া ও কখনও বা ধাঁধায় পড়িয়া "বুঝিয়া ফেলিবার" সুখলাভ করিতে চায়। আমরা বলি, যাহা বুঝিতে পারিবে না, তাহা বুঝিয়া কাজ নাই। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁহারা পিতার ক্রোড়ের সন্তানের মত পিতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন; তিনি যাহা করিবেন তাহাই মঙ্গলজনক হইবে বলিয়া আশ্বস্ত থাকুন। তোমাদের বিবেচনায় পরলোক যে প্রকার হওয়া উচিত মনে কর, অথবা কল্পনার তুলিতে নিজের বাসনার রঙ্-এ পরলোকের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া ঈশ্বরকে ন্যায়বান্ বল, সেইপ্রকার পরলোকই যে অশরীরী আত্মার জন্য বিহিত রহিয়াছে, এ কথা ভাবিবার তোমাদের কোন অধিকার নাই। দার্শনিক পণ্ডিতেরা ঊর্ণনাভের মত আত্মশরীর হইতে বুদ্ধির জাল বাহির করিয়া সেই জালে আপনাকে জড়াইয়া না মারিয়া ফেলিয়া যাহা প্রত্যক্ষ ও সুস্থির, তাহারই তত্ত্বে অনুরাগী হইলে ভাল হয়। সংসারে ধাঁধা যথেষ্ট আছে; আর অতিরিক্ত ধাঁধা রচনা করিয়া কি হইবে? বর্বর যুগের কল্পিত ভূতগুলিকে যদি গর্ব-স্ফীত মূর্খেরা নূতন পোষাকে সাজাইয়া থিয়সফির নূতন তন্ত্র রচনা করিতে চায়, কিম্বা সভ্যতার বাল্যযুগের দার্শনিক অদ্বৈতবাদ ও পুনর্জন্মবাদ যদি এ-যুগের দার্শনিকেরা অদ্ভুত তত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিতে চায়, তবে তোমরা তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে কশাঘাত করিও। এ উপায় অবলম্বন করিলেও যদি ভূতের কলঙ্ক না ঘোচে তবে লোকশিক্ষার জন্য ভবিষ্যতে আরও কিছু লিখিব।

মরণ ভোল

২

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"

এ বড় ভুল কথা যে মানুষে মরণ না ভুলিলে ভয়ে ভয়ে কাজ-কর্ম্ম করিবে ভাল করিয়া। উল্টা দিকে বরং ইহাই ঘটিতে পারে যে, বাঁচিয়া যখন বহুকাল ভোগের আশা নাই, তখন কোনপ্রকারে দিনকতক নিজের স্বার্থের কাজ করিলেই চলে। কেহ-কেহ তর্ক তুলিতে পারেন যে, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, মানুষের যদি ধারণা হয় যে, সে ভাল কাজ না করিলে মরিয়া কীট প্রভৃতির মত নীচ প্রাণী হইবে, তাহা হইলে মরণের ভয়ে ও নরকের ভয়ে কাজ করিবে ভাল। এ তর্ক যে টেঁকে না তাহা প্রাচীন কালের একটা গল্পের দৃষ্টান্তে বলিতেছি।

গল্পে আছে—এক যে ছিল দুষ্ট ধনী। তাহাকে নারদ আসিয়া ভয় দেখাইয়া বলিলেন যে, তাহাকে দুষ্কর্ম্মের জন্য যাইতে হইবে নরকে, হইতে হইবে একটা বিষ্ঠার পোকা, আর তখন এখানকার সুখের খাদ্য ছাড়িয়া খাইতে হইবে ঘৃণ্য পদার্থ। দুষ্ট ধনী উত্তরে বলিল—ঠাকুর উহাতে আমার ভয় নাই; কারণ যদি কীট হইয়া জন্মি তবে আমার মানুষের বুদ্ধি থাকিবে না,—মানুষের রুচিও থাকিবে না; হইবে কীটের বুদ্ধি ও কীটের রুচি। তাহা হইলে যাহা কীটের খাদ্য তাহা এই রাজভোগের মত মধুর হইবে, ও কীটের বুদ্ধিতে এ কথা মনে উঠিবে না যে আমি মানুষ হইবার সুখ পাইলাম না। ঠাকুর তখন এ জবাব শুনিয়া মাথা চুলকাইয়া স্বর্গে গেলেন। পুনর্জ্জন্মবাদে

না আছে ভয়, না আছে আশা। সত্যের হিসাবে এই পুনর্জন্মবাদ কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা পরে বলিতেছি।

এখন কথা এই যে, জন্ম-জন্মান্তরের কথা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, সে কথা যদি না-ই ভাবা যায়, ক্ষতি কি? অজানা কথা সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাইয়া হউক, বা নিজের কল্পনায় একটা স্বপ্ন খাড়া করিয়া হউক, পরলোকের একটা মানচিত্র আঁকিবার প্রয়োজন কোথায়? পূর্বেই একবার বলিয়াছি যে, যাহারা সত্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সত্যই মনে করে যে, অনাদি শক্তির হাতেই তাহারা বাড়িতেছে ও চলিতেছে, তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া জীবনকে নির্ভয় করিবে না কেন। আমি একটা তথ্য খাড়া করিলেই যে সেটা সত্য হইবে, আর পরমেশ্বরকে আমার তথ্য অনুসারে কাজ করিতে হইবে, ও না করিলে পরমেশ্বরকে হইতে হইবে আমার বিচারের অনুযায়ী একটি নিষ্ঠুর পুরুষ, ইহার ত কোন মানে নাই। তুমি যখন ঈশ্বরকে দয়াময় ভাবিয়াই পরলোকের মানচিত্র আঁক, তখন এ কথাটা ত ভাবা বড় সহজ যে, তিনি কোলের শিশুকে আছড়াইয়া না মারিয়া তাঁহার নিয়মে যাহা ভাল তাহারই একটা ব্যবস্থা করিবেন। মিছাই যাহা জানা যায় না, তাহা জানার জন্য অলিভার লজের পিছু ছুটিয়া পর্দা ছিঁড়িয়া ওপারটা দেখিবার জন্য পাগলামি করিবে কেন? ওপারটাকে দেখা অসম্ভব করিয়াই স্রষ্টা যেন এই জীবন গড়িয়াছেন; কেন-না এ জীবন যে ভাবে গড়া, তাহাতে মরণের ওপার অজ্ঞাত থাকাতেই জীবনের চিন্তা ও কাজ চলিতেছে ভাল। ঠিক এই কথাটি পরে বুঝাইব।

মরণ ভোলা—সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের যে নির্দেশ পাই তাহা উপাদেয়। বুদ্ধদেব বুঝাইয়াছিলেন যে, মানুষেরা তাহাদের দুঃখ না কমাইয়া আন্ত শরীরকে ব্যস্ত করিয়া খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া গায়ে ঘা সৃষ্টি করিয়া

দুঃখের মাত্রা বাড়াইতেছে ঐ অসার মরণের কল্পনাটাকে ফুলাইয়া ফুলাইয়া। তিনি প্রাণের শান্তির জন্য যে-সকল দুঃখদায়ক তৃষ্ণা *(তন্‌হা) অর্থাৎ উদ্বেগময় বাসনা ছাড়িতে বলিয়াছিলেন, তাহার* মধ্যে "ভব-তন্‌হা" একটা। ভূ+অ থেকে উৎপন্ন ভব শব্দের অর্থ জন্ম। সেকালে মানুষ চাহিত এই "ভব" এড়াইতে। জন্মিলেই দুঃখ; কাজেই আবার এই জন্ম না-হওয়া ও অন্য জীব হইয়া না-জন্মা ছিল প্রাণের প্রার্থনা। এখন অনেকে ভবসাগর বলিতে এই পৃথিবীটাকেই বুঝিয়া থাকেন; সেটা একালের মন-গড়া অর্থ। আমি জন্মিতে চাই, জন্মের সুখ চাই, অথবা জন্ম এড়াইয়া দিব্যলোকে সুখে বাস করিতে চাই—এইরূপ কামনাকে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—'একটা মহা দুঃখের কারণ'। এই ধর, তোমাকে *যাইতেই হইবে মগধ হইতে উজ্জয়িনী, ও তাহার পর উজ্জয়িনীর পরপারে* কোন অজানা রাজ্যে তোমাকে যদি যাইতেই হয়, তাহা হইলেও সুস্থ শরীরে ও নিশ্চিন্ত মনে তোমাকে উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত পৌঁছা চাইই-চাই। পরলোকে যাহাই থাকুক, এ-লোকের শেষ পাড়ি ঐ উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত না গেলে যখন চলে না, তখন দুঃখ-ক্লেশ এড়াইয়া প্রসন্ন মনে কি ভাবে রাস্তা হাঁটিয়া দশজনের সঙ্গে উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত যাইতে পার তাহার চেষ্টা কর। এই চেষ্টা অবশ্য অনুষ্ঠেয়,—পরলোক থাকুক্ আর নাই থাকুক্। এই অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্তব্য পালনের পথে তুমি একটা কল্পিত দুঃস্বপ্ন পড়িয়া কাল্পনিক ভয়-ভাবনা কুড়াইয়া প্রসন্ন মনে কাজ করিবার পথে বাধা জন্মাও কেন? বৌদ্ধ সাহিত্যে পাই, বুদ্ধদেবের শিষ্যেরা তাঁহাকে পরলোক সম্বন্ধে যখনই প্রশ্ন করিয়াছেন, তখন তিনি কোনও জবাব দেন নাই। প্রশ্ন হইল—পরলোক আছে? বুদ্ধদেব কথা কহিলেন না। প্রশ্ন হইল—তবে কি পরলোক নাই? বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন না।

কোন কাজের কাজে না লাগিলেও মানুষে অলস খেয়ালে যে-সকল প্রশ্ন করিত, বুদ্ধদেব সে সকল প্রশ্নের জবাব দিতেন না। তবে "উদানম্" বইখানিতে *'অথি ভিকৃখবে' প্রভৃতি বাণীতে যে অকৃত ও অচ্যুত স্থানের কথা আছে, তাহার বিচার এখানে করিব না; কারণ সে ভাবের* নিগূঢ়তা অনেক কথায় ব্যাখ্যা করিতে হয়।

বুদ্ধদেবের উপদেশ যাহাই হউক, আর অন্যান্য শাস্ত্রের মত যাহাই হউক, লোকসাধারণের মনের ভাব বিচার করিয়া দেখি যে, লোকে যে কাজ-কর্ম করিয়া চলিয়াছে, সে কি পরলোকের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া, না আপনাদের মনের ও প্রবৃত্তির প্রাকৃতিক টানে? শিশুরা মরণের কথা জানে না ও ভাবে না; তাহারা শরীরের প্রকৃতির ফলে নাচিয়া-খেলিয়া আনন্দে বাড়িয়া ওঠে। মানুষেরা ক্ষুধা-তৃষ্ণার খোঁচানিতে কিছু উপার্জনের জন্য "ছুটাছুটি করে ভূমণ্ডল"; সুখে বাড়িয়া উঠিবার তাড়ায় পৃথিবীর দশজনের সঙ্গে মিলিয়া মনের ও প্রাণের প্রসার বাড়ায়; যৌন-ভাবের আগ্রহে বিবাহ করে, সন্তান পালন করে ও ঘর-বাড়ী সাজাইয়া অতি দূর হইতে দূর ভবিষ্যতের জন্য আপনার ও আপনার বংশধরদের জন্য স্থিতির ব্যবস্থা করে। এ সকল কাজে লোকসাধারণ পরলোকের মালা জপিয়া চলে না; নিজে কতদিন বাঁচিবে, জানে না; জানে—একদিন বুড়া হইয়া, না হয় অন্য রকমে মরিবে। জানে না সে—যে নারিকেলের মত গাছগুলি পুঁতিতেছে, তাহার ফলভোগ সে করিবে কি-না, আর তাহা মনে না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য গাছ লাগাইয়া চলিয়াছে। তাহার আশার গুড়ে বালি পড়িবে কি-না, না ভাবিয়া ক্রমাগত ভবিষ্যতের দিকে ছুটিতেছে। একদিন তাহার আর ভোরে ঘুম ভাঙ্গিবে কি-না, তাহা মনে না করিয়া ভবিষ্যতের দিকেই পা বাড়াইয়া চলিতেছে। মানুষের শরীরের প্রকৃতির মধ্যে,

তাহার শারীরিক মৌলিক ধাতুর মধ্যে এমন একটা অচ্ছেদ্য স্থায়ী টান আছে, যাহার কথা সে কোন তর্ক করিয়া না বুঝিয়া জীবনের পথে হাঁটিতেছে। জীবনের এই যে নিগূঢ় টান, যাহা মানসিক ধারণার অতর্কিতে কাজ করিয়া মানুষকে ভবিষ্যৎ-মুখী করিয়া চালাইতেছে, তাহার মানে কি? সৃষ্টিতে এই জীব-রক্ষার রহস্য যতটুকু বুঝিতে পারা সম্ভব, তাহা জীবনের উৎপত্তির বিবরণে আলোচনা করিব।

ফিলসফি রচিয়া অর্থাৎ নিজের ভাবের সূতায় ভাব গাঁথিয়া যে ঐ রহস্যটুকু ধরা যায় না, তাহার একটু আভাস দিতেছি। এই যে আমাদের চেতনায় সংজ্ঞা ফুটিয়াছে—আত্মপর-বোধ ফুটিয়াছে, জীবনের স্পৃহা ও ভবিষ্যতের আশা জাগিয়াছে, আমরা কি ভাবিয়া-ভাবিয়া তাহার উৎপত্তির ইতিহাস ধরিতে পারি? আমরা যে সংজ্ঞা ও সংজ্ঞা-জাত বুদ্ধি দিয়া সকল কথা বুঝি ও প্রত্যক্ষ করি, তাহা দিয়া কি ঐ সংজ্ঞাটারই গোড়ার অবস্থা বা উৎপত্তির ইতিহাস ধরিতে পারি? সকল মানুষের মধ্যেই ঐ যে আছে তাহাদের সংজ্ঞা ও বুদ্ধি জড়াইয়া একটা মনন, সেটা একই ধাতুতে গড়া। এই যাহার নাম দিলাম মনন, তাহাকে একখানা ছুরির মত ভাবিয়া নিতেছি। ছুরিখানি দিয়া নানা জিনিস কাটা যায়, অর্থাৎ নানা জিনিসের অবস্থা বা প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়; তবে কেমন করিয়া ঐ এক ধাতুতেই গড়া ঐ ছুরিখানি দিয়া ঠিক ছুরিখানাকেই কাটিব। এ যে নিজের ঘাড়ে নিজে পা দিয়া ঘাড়ের উপর দাঁড়াইবার চেয়েও অসম্ভব চেষ্টা! কেমন করিয়া স্তরের পর স্তরে—জীবের পর জীবে চেতনা ফুটিয়াছে, আত্ম-সংজ্ঞা ফুটিয়াছে, তাহার যেটুকু শারীর ইতিহাস পাওয়া যায়, সেই ইতিহাসে বা বিবরণে নিগূঢ় রহস্যটির কোন আভাস পাওয়া যায় কি-না দেখিব। যাঁহারা আত্মা বা মানুষের বিকশিত চৈতন্যের অনন্ত স্থায়িত্ব ঠিক ভাবে বুঝিতে চান্, তাঁহাদের পক্ষে গোড়ায় চেতনার উদ্ভবের

ইতিহাস জানা চাই ; তাহা হইলে কুসংস্কার কাটাইয়া খাঁটি জ্ঞানের পথে চলিতে পারিবেন। চৈতন্যের উদ্ভবের ইতিহাস দিতেছি।

আমাদের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিশ্বের আদি কি, বীজ কি, উহার মূল কোথায় ? এক 'সময়ে' কিছুই ছিল না, আর 'পরে' বিশ্বের উপাদান জন্মিল, ইহা মানুষের চিন্তার অতীত,—কল্পনায় ধারণা করা অসম্ভব। 'সময়' বলিতে গেলে, বুঝি আজ-কাল দিয়া গাঁথা 'আগের' ও 'পরের' একটা অশেষ ধারা ; এই সময়ের ভাবনা এড়াইয়া এমন একটা আদি কালের কথা ভাবিতেই পারি না যখন 'সময়' ছিল না,—'আগে পরে' দিয়া গাঁথা অবস্থাটি ছিল না।

অন্যদিকে আবার 'আগে' ও 'পরে' ভাবিতে গেলেই একটা 'স্থানের' ভাবনা জাগে ; অর্থাৎ একটা অবস্থা আগে ও একটা অবস্থা পরে বলিলেই তাহার অর্থ হয় যে, সেই অবস্থা একটা 'স্থান' জুড়িয়া 'আছে'। মনে পড়ে 'আছে', 'নাই' অবস্থাটি মানুষের ভাবনায় জাগে না। 'না ছিল এ সব কিছু' মানুষের মনের কথা নয়,—একটা মিথ্যা কথার ফাঁকা আওয়াজ। যিনি কবিতায় লিখিয়াছেন 'না ছিল এ সব কিছু', তাঁহাকেই উহার সঙ্গে জুড়িয়া লিখিতে হইয়াছে—"আঁধার ছিল অতি ঘোর 'দিগন্ত' প্রসারি" ; অর্থাৎ কিছু ছিল বলিতে হইয়াছে ও যাহা ছিল তাহা একটা স্থানে ছিল বলিতে হইয়াছে। বিশ্বের উপাদান ছিল না ও পরে হইল, এরূপ ভাবনা করিবার চেষ্টা অতি অসম্ভব চেষ্টা। শ্রেষ্ঠতম মানুষের ভাবনায় যাহা অসম্ভব, তাহা ছাড়িয়া সম্ভবকে নিয়াই উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজিতে হইবে।

যে 'মহাশূন্য' এড়াইয়া কিছু ভাবিতে পারি না, 'মহাকাল' ভুলিয়া আমাদের চিন্তা নাই, তাহা ধরিয়াই বিশ্বের উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজিতে হইবে। আমাদের জ্ঞানের মূলে ও জ্ঞানকে জড়াইয়া আছে এই যে মহাশূন্য, উহাতে সূক্ষ্মদর্শীরা অশেষ তরঙ্গলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। *এই তরঙ্গিত মহাশূন্যকে আকাশ বলিব না; যাহা ফুটিয়াছে অর্থাৎ মোটা দৃষ্টিতে প্রকাশ (প্র+কাশ) পাইয়াছে তাহাই লোকসাধারণের* ভাষায় আ+কাশ—ইংরেজি sky। সুবিধার জন্য পণ্ডিতেরা ইহার নাম দিয়াছেন ইথর (ether)। এই ইথর শব্দে এখন একটা কিছু বিরোধ আছে বটে, তবে নাম দিয়াই যখন বস্তু-নির্দেশের সুবিধা করিতে হইবে, তখন এই সহজে উচ্চার্য্য ইথর শব্দটিকে আমরা ব্যবহার করিলাম।

এই তরল হইতেও তরল ইথরে কাঁপুনি উঠিয়া ঢেউ খেলিল কেমন করিয়া ? এই কাঁপুনি বা গতি ঐ ইথরের স্থিতিগত প্রকৃতি বা ধর্ম। পদার্থ বলিতেই বুঝিতে হইবে তাহার একটা ধর্ম, যাহা দিয়াই সেই পদার্থটি বুঝি; উহা পদার্থ হইতে আলাদা বস্তু নয়। মানুষের রূপ যেমন মানুষ হইতে অভেদেই ভাবিতে হইবে, তেমনই ঐ গতিকে ইথরের সঙ্গে অভেদে উহার প্রকৃতি বা ক্রিয়া স্বরূপে ভাবিতেই হইবে। ইথরের প্রকৃতিতে বা ধর্মে দাঁড়াইয়াছে এই যে, উহার এক অংশে চলিয়াছে এক রকমের গতির খেলা ও অন্য অংশে চলিয়াছে অন্য রকমের গতির খেলা। একটা গোল বলের মধ্যে একটা কাঠি চালাইয়া উহাকে ঘুরাইলে যে রকমের বর্তুল গতি হয়, তাহাই এক অংশের গতির ধারা; ইংরেজিতে বলে rotational গতি,—আমরা বলিব বর্তুল-গতি। একটু লম্বা ছাঁচের বর্তুলের দুই প্রান্ত চাপা পড়িলে তরল বর্তুল যেরূপে ঘুরিতে পারে, সেই ভাবে ইথরের অন্য অংশে ঢেউএর আবর্তন

চলিয়াছে; এই ধরণের গতির ইংরেজি বিশেষণ irrotational, আর আমরা বলিব পরাবর্ত-গতি। নিজে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া না নিলে এই গতির ভেদ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাল ধারণা হইবে না। এই গতিবিভঙ্গে জন্মিতেছে ঢেউএর ফোট্‌কা, আর সেই ফোট্‌কাগুলি হইয়া ওঠে বিদ্যুৎগর্ভ। কোথা হইতে আসিল সেই বিদ্যুৎ? যাহাকে বিদ্যুৎ বলি, তাহা ঐ গতিরই একটা রূপান্তরিত অবস্থা। পদার্থের ধর্মে যাহা আছে তাহাই আলাদা আলাদা অবস্থায় নানা রূপে ফুটিয়া ওঠে। বিদ্যুৎগর্ভ ফোট্‌কাগুলির ইংরেজি নাম electron; দু-একজন পূর্ববর্তী লেখককে অনুসরণ করিয়া উহার সংস্কৃত নাম দিলাম বিদ্যুৎ-কোরক ও বাঙ্গালা নাম দিলাম বিদ্যুৎ-কুঁড়ি। এই বিদ্যুৎ-কুঁড়ির যোগে যাহা জন্মে তাহার নাম অণু বা পরমাণু; আর সেই পরমাণুকে বলি সারা বিশ্বের উপাদান। কি পদ্ধতিতে পরমাণুতে পরমাণুতে জোড়া বাঁধে, তাহা বলিবার আগে বলিয়া রাখি যে, আমাদের দেশে জোড়া-লাগা পরমাণু-সংহতির মধ্যে পরমাণুর সংখ্যা ধরিয়া ঐ সংহতির ভিন্ন ভিন্ন নাম পাই; যথা দুইটি পরমাণুর সংহতির নাম দ্ব্যণুক। সংখ্যা হিসাবে এইরূপ অনেক নাম থাকিলেও অতি ক্ষুদ্র পরমাণু-সংহতি-মাত্রের নাম দিতেছি দ্ব্যণুক, অর্থাৎ ইংরেজি molecule.

এই পরমাণু ও দ্ব্যণুক কত ক্ষুদ্র তাহা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছি। হাইড্রজেন নামক বাষ্পীয় পদার্থের ছত্রিশ হাজার দ্ব্যণুক যতটুকু স্থানে থাকিতে পারে তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের ঘন-পরিমাণ—এক ইঞ্চের ·০৩৯৩৭ অংশ মাত্র। এই যে আছে কল্পনার অতীত সংখ্যা পরমাণু, উহার মধ্যে 'জাতিভেদ' আছে, অর্থাৎ এক পরমাণু একরকম বাষ্পীয় পদার্থের gas বা মূল, আবার অন্য পরমাণু অন্যের মূল। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরমাণুদের মধ্যে এক হিসাবে ক্ষমতার প্রভেদ আছে; কোন

এক জাতির পরমাণু অন্য যে কয়েকটি পরমাণুকে আপনার *গায়ে জোড়া* লাগাইতে পারে, তাহার হিসাব আছে, যথা—হাইড্রজেন্ বাষ্পের একটি *পরমাণু অন্য পরমাণুর একটার সঙ্গে মিলিতে পারে, অক্সিজেনের* পরমাণু পারে অন্য দুইটিকে মিলাইতে, কার্বনের পরমাণু অন্য চারিটিকে মিলাইতে, আর নাইট্রজেনের পরমাণু অন্য তিনটি অথবা পাঁচটিকে মিলাইতে পারে ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই যাহা ঘটে, তাহা হইল পরমাণুর একটা প্রাকৃতিক লক্ষণ।

পরমাণুদের আর জন্মগত ধর্মের বা প্রকৃতির কথা বলিতেছি। প্রত্যেক পরমাণুতে যে গতি প্রকাশ পায়, অর্থাৎ নড়া-চড়া ক্ষমতা প্রকাশ পায়, তাহার একটা বিশিষ্টতা এই যে, প্রত্যেক পরমাণু এক-দিকে বোঁ করিয়া ছুটিয়া দুরান্তে পলাইতে চায়, আবার অন্য-দিকে অন্য পরমাণুকে টানিতে চায় ও অন্য পরমাণুর দিকে আকৃষ্ট হয়। মানুষের মধ্যে যেমন দেখি, এক-দিকে আছে তাহার বৈরাগ্য-বুদ্ধি ও অন্য-দিকে আছে প্রেমে সংসার গড়িবার বুদ্ধি—ঠিক যেন সেই রকমের দুইটি "টান" প্রতি পরমাণুতে একসঙ্গে মিলিয়া আছে, ও দুইটি "টানই" যুগপৎ একসঙ্গে কাজ করিয়া চলিয়াছে।

যে-সকল পরমাণুতে সকল পদার্থ গড়া ও আমরা গড়া, তাহার আর একটি প্রকৃতির পরিচয় দিতেছি। কোন একটা পদার্থ গড়িবার উদ্যোগে (বুদ্ধি করিয়া নয়) যখন পরমাণুতে পরমাণুতে অচ্ছেদ্য পাকা যোগ ঘটে (অর্থাৎ রাসায়নিক যোগ ঘটে), তখন ভিন্ন রকমের বৈদ্যুতিক অবস্থার পরমাণুরা অথবা বিদ্যুৎ-কুঁড়িরা পরস্পরকে অতি প্রবলবেগে (তড়িৎ প্রবাহে কাঁপিতে কাঁপিতে) অচ্ছেদ্য আলিঙ্গন-পাশে বাঁধে। কোন বিবাহে, কোন স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের মিলনে বা গভীর অনুরাগের আলিঙ্গনে অত বেগ নাই, অথবা উত্তেজিত ভাবের অত কাঁপুনি নাই।

এইমাত্র বলিলাম একটা "পাকা যোগের" কথা--যে-রকম যোগের ফলে পরমাণুরা আপনাদের *নিজের মত আলাদা আলাদা না থাকিয়া একটা বিশিষ্ট রকমের নূতনত্বের জন্ম দেয়।* উহার স্বরূপ বলিতেছি। জলে লবণ দিলে যে লোনা জল হয়, তাহাতে নূতন একটা পদার্থ জন্মে না; জল শুকাইলে বা উড়িয়া গেলেই লবণ আলাদা হইয়া পড়িবে। এটা হইল কাঁচা যোগ; এ-রকম যোগে একটার সঙ্গে আর একটা গুলাইয়া যায়, এই পর্য্যন্ত। আর পাকা যোগে রাসায়নিক পরমাণু গড়ে, তাহাতে বিভিন্ন ধর্মের পরমাণুকে আর মিলনের পরে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; 'ক' ও 'হ' এমন ভাবে মিলিয়া যায় যাহাতে জন্মে একটা 'খ'; সেই 'খ' হইল এমনভাবে আলাদা ও নূতন, যাহাতে 'ক'-কে বা 'হ'-কে আলাদা করিয়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দ্ব্যণুকদের মিলনের বিভিন্ন ধরণের ও ভঙ্গির ফলে, যে বিভিন্ন রকমের পদার্থ গড়িয়া উঠে, সেটাতে পরমাণুদের আর এক রকমের প্রকৃতি জানা যায়। মনে কর, পরমাণুরা এই ধরণের ও ভঙ্গিতে মিলিল, যেমন চা'ল দিয়া চূড়া করিয়া নৈবেদ্য সাজায় অথবা অন্য ধরণে কোন পদার্থকেই গোল করিয়া কিম্বা চৌকা করিয়া সাজায়; এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধরণে ও ভঙ্গিতে সাজিয়া মিলিবার ফলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের পদার্থ জন্মে। কয়লাতে যে জাতির পরমাণু পাই, হীরকেও সেই জাতির পরমাণু পাই; পরমাণুরা ভিন্ন ভিন্ন ধরণে ও ভঙ্গিতে মিলিবার ফলেই এক মিলনের ফল হইয়াছে—কয়লা, অন্য মিলনের ফল হইয়াছে—হীরক।

বুঝাইয়া বলিবার কথাটা হইল এই যে, যাহা কিছু হইয়াছে ও হইতেছে, গড়িয়াছে ও গড়িতেছে, তাহা পরমাণুদের মজ্জাগত ধর্মে,—পরমাণু হইতে অচ্ছেদ্য, পরমাণুর প্রকৃতিতে। গতি বল, আকর্ষণ বল, শক্তি বল, মিলনের ধরণ বা ভঙ্গি বল, বিদ্যুৎ বল, আলোক বল, উত্তাপ

বল—সে সকলই পরমাণুদের প্রকৃতিগত ধর্মের ফল; এক ধর্ম এক অবস্থায় ফুটিয়া ওঠে, আর অন্য ধর্ম অন্য অবস্থায় ফুটিয়া ওঠে, এইমাত্র। যে মহাশূন্যের ও-পারের ভাবনা মানুষের চিন্তায় অসম্ভব, সেই মহাশূন্যকে পাই ইথর-সাগররূপে। এই ইথর সম্পূর্ণরূপে বিশ্ববীজ। ইথরে ঢেউ খেলিয়া যায়, আর সেই ঢেউ-এ ফোটে বিদ্যুৎ-কুঁড়ি; বিদ্যুৎ-কুঁড়ির যোগে হয় পরমাণু, আর পরমাণুর নানারকমের যোগে জন্মে সকল রকমের পদার্থের সমষ্টি—এই সারা বিশ্ব।

মানুষের কাছে সকল তত্ত্বের বড় তত্ত্ব তাহার জীবনের রহস্য। এই যে বিশ্বের জড়পিণ্ড, এই যে পাথর, এই যে মাটি, এই যে জল, উহা যত সুসম্বদ্ধ হইলেও জড়মাত্র; আর জড়ে ও জীবে কত প্রভেদ! এই যে মানুষ চৈতন্যে উদ্‌বুদ্ধ, আত্ম-পরের জ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত, মননে নিরত, আশঙ্কায় ও আশায় উৎসাহিত, কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব, প্রীতিতে প্রফুল্ল, নির্বাণের ভয়ে ভীত, সে কি জড়পিণ্ড বৈ আর কিছু নয়? শরীর পুড়িয়া ছাই হয়; তখন তাহাতে তাহাই পাই যাহা অচেতন জড়পিণ্ডের উপাদান। কিন্তু সেই জড়ের উপাদান কি করিয়া জীবনে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, আর জীবনে উদ্‌বুদ্ধ চেতনা শরীরের ক্ষয়ে কি পরিণাম পায়, তাহাই হইয়াছে মানুষের চিন্তনীয় সমস্যা।

সমস্যাপূরণের পথে প্রথম প্রশ্ন এই—জীবনের রহস্য কি জড়ের রহস্য হইতে ভিন্ন প্রকৃতির বা গভীরতর? জড়ের সমস্যাপূরণে এইটুকুই বিশেষভাবে আমাদের অবোধ্য ও অসাধ্য যে, মহাশূন্য বা ইথর কিরূপে কোথা হইতে জন্মিল; সেই জন্মের রহস্যকে বা আদির রহস্যকে যদি স্বতন্ত্র হেঁয়ালি রূপে রাখি, তবুও জড়ের রহস্য অপেক্ষা জীবনের রহস্য গুরুতর হয় কি-না তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যাহা ইথরের ধাতুগত,—যাহা তাহার প্রকৃতি, তাহারই প্রকাশে এই বিশ্ব গড়িয়াছে,

বুঝিতে পারি ; সে স্থলে ইথরের জন্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা যাহা, ইথর যে বিশ্ব-বীজ হইল কেন, সে জিজ্ঞাসাও তাহাই। যাহা হইয়াছে, তাহা একটা ধাতুগত প্রকৃতি নিয়াই হইয়াছে।

ইথরে ঢেউ খেলায়, সে ঢেউ-এ আলোক ফোটে অথবা বিদ্যুৎগর্ভ স্ফোটক বা বিদ্যুৎ-কুঁড়ি জন্মে, বিদ্যুৎ কুঁড়ির যোগে পরমাণু হয়, আর পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন ধরণের যোগে ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু জড় পদার্থ দেখি, সে সকলেরই উৎপত্তি হয়। ইথরে এমন গুণ কোথা হইতে আসিল যে, উহা হইতে এতখানি বিকাশ সম্ভব হইল ? এরূপ প্রশ্নের এই একই অর্থ যে, ইথর হইল কোথা হইতে ? ঐ যে ঢেউ, আলোক, বিদ্যুৎ ও পদার্থের উৎপত্তির কথা বলা গেল, উহাতে সূচিত হইতেছে একটা গতি, শক্তি,—কর্ম্ম-ক্ষমতা। ঐ গতিটিকে, শক্তিকে, কর্ম্ম-ক্ষমতাকে ইথর হইতে অথবা পরমাণু হইতে অথবা একটা সুসম্বদ্ধ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ধরিতে পার না ; ও-গুলির স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই,—উহারা ইথর বা পরমাণুদের লীলায় পরিস্ফুট নানা অবস্থার নাম। নাম ও রূপ যেমন কোন পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র নয়, গতি প্রভৃতিও তেমনই পদার্থ হইতে অভিন্ন একটা শক্তি-মাত্র ; উহারা স্বতন্ত্রভাবে নিজের অস্তিত্ব নিয়া আছে, এইরূপ ভুল ধারণা অনেকের আছে বলিয়া এতখানি লিখিতে হইল। যে পদার্থকে কেবল যে ধর্ম্মের ফলে চিনিতে পারি, তাহার সেই ধাতুগত লক্ষণ যখন তাহার ক্রিয়ায় ফোটে, তখন সেই ক্রিয়াকে বা ক্রিয়ার লক্ষণকে আলাদা একটা পদার্থ বলিতে পারি না ; সুবিধার জন্য আলাদা অবস্থার আলাদা নাম দিতে হয়, এই মাত্র। এ কথা মনে রাখিলে জীবের শরীরে প্রকাশিত গুণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নূতন রকমের হেঁয়ালির বা রহস্যের আবর্তে পড়িব না। কথাটি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের এই পৃথিবী যখন অসাধারণ উত্তাপে ফাঁপা বাষ্প-গোলক ছিল, তখন পাথর, জল প্রভৃতি কিছুই পাথররূপে বা জলরূপে ছিল না। উহার তাপ খানিকটা উপিয়া যাইবার পর পৃথিবীর কাঠামরূপে উহার বাহিরের আবরণ বা খোসাখানি কঠিন হইল; পরে আবার বহু যুগযুগান্তের পর, অধিকতর শৈত্য আসিবার পর যখন জলের জন্ম সম্ভব হইয়াছিল, তখন তপ্ত বৃষ্টির ধারায় পৃথিবীর কঠিন আবরণের উপরকার বড় বড় খাতে বা গর্তে জল জমিয়া সমুদ্র হইল। পৃথিবীর কঠিন খোলসখানির বা স্থলের জন্ম যে, জলের জন্মের অনেক আগে, আমরা পৌরাণিক সৃষ্টির বিবরণের সংস্কারে তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। এই যে পাথর ও নানা ধাতু জন্মিল ও তাহার পর জল জন্মিল, উহা নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য পৃথিবীর স্রষ্টাকে উদ্যোগ করিতে হয় নাই; যত তপ্ত হইলেও পৃথিবীর পিণ্ডে যাহার বীজ ছিল, তাহাই তাপ-ক্ষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অনুকূল অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পাথর, মাটি, জল প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, জীব সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইবে না কেন? পৃথিবী তাহার শরীরের অংশগুলির পরে-পরে-বিকাশের ইতিহাস স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছে। গোড়ায় যে স্তর পড়িয়াছিল ও তাহার উপর আবার যে স্তর পড়িয়াছিল, তাহা আলাদা আলাদা করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়। গোড়ার স্তরে আমরা কোন জীবের কঙ্কাল পাই না; জীবের উদ্ভব হইয়াছিল জলের জন্মের পরে একটি নূতন অনুকূল অবস্থার আবির্ভাবের সময়ে। সকল শ্রেণীর জীবের (উদ্ভিদেরও বটে) জীবনের মূল যে "জৈবনিক" পদার্থ, উহা যে, ধাতু-পাথর জল প্রভৃতির মত পৃথিবীর আত্মশরীর হইতে অনুকূল অবস্থায় ফুটিয়া বাহির হয় নাই, এ কথা যে বলিবে তাহাকেই জৈবনিকের অপার্থিব সৃষ্টির প্রমাণ দিতে হইবে। অনুকূল ফুটিই,

পরে পরে সকল পদার্থ জন্মিতে পারিল, আর জৈবনিকের বেলায় কেন যে বলিতে হইবে সে অন্য মুল্লুক হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাহার কারণ পাওয়া যায় না। যাহা এক সময়ে জন্মিয়াছে এই পৃথিবীতেও রহিয়াছে এই পৃথিবীতে, তাহা যে এই পৃথিবীর নয়, এ কথা যিনি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন তিনি আশ্চর্য্য রকমের জীব।

এক সময়ের বিকাশের অনুকূল অবস্থায় (যে অবস্থা এখন আর আমরা ফিরাইয়া আনিতে পারি না) পৃথিবীর স্থল-ভাগ সাগরকে ঠিক কি-কি পদার্থ উপহার দিয়াছিল, সাগরের গর্ভে যাহার রাসায়নিক যোগে খানিকটা আঠার মত জৈবনিক রচিত হইল, তাহা এখনও জৈবনিকের বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে নাই। জীবন্ত জৈবনিকের রাসায়নিক উপাদান ঠিক্-ঠাক্ কি রকমের, তাহা এখনও ধরা পড়ে নাই বটে, তবে জৈবনিকের মরণের পরের বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে, উহাতে অর্দ্ধ তরল অবস্থায় সেই (albuminous) পদার্থ আছে, যাহা আমরা একটি ডিমের ভিতরকার শাদা ভাগে পাই। যেদিন পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ হইতে পারিবে, সেদিন জানা যাইবে যে, কি-কি জড় পদার্থের রাসায়নিক যোগে জৈবনিকের উৎপত্তি। এখনও জৈবনিকের ধাতু সম্পূর্ণ নির্ণীত হইতে পারে নাই বলিয়া উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে অপার্থিব কল্পনা চালান যায় না। যদি এখনও জানা না যাইত যে কি-কি বাষ্পীয় পদার্থের যোগে জলের উৎপত্তি হয়, তবে জলকে পৃথিবীর উপাদানের বাহিরের পদার্থে প্রস্তুত বলা অসঙ্গত হইত।

যে রাসায়নিক সামগ্রি (colloidal substance) জৈবনিকের ধাতু বা ভিত্তি, তাহার যে-যে প্রকৃতি প্রত্যক্ষ হয় তাহা এই—জৈবনিক তাহার নিজের প্রকৃতির ফলে নিজে নিজে বাড়িয়া উঠিতে পারে, পরিস্থিক রক্ষা করিতে পারে ও নিজের শরীর হইতে অন্য জৈবনিক

উৎপাদন করিতে পারে। জৈবনিকে এই যে বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, উহা জড় পদার্থে লক্ষ্য করা যায় না। মাটির ডেলাকে বাড়াইতে হইলে আর খানিকটা মাটি আনিয়া ডেলাটির উপর বোঝাই করিতে হয়, মাটির ডেলাটি নিজে তাহার ভিতরে কোন রস শুষিয়া তাহাকে মাটিতে পরিণত করিয়া মাটির অঙ্গ বাড়াইতে পারে না; ডেলাটি ভাঙ্গিতে গেলে উহা কুঁচকাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না, আর মাটি ডেলা-শিশুর জন্ম দেয় না।

সকল রকমের গাছ-পালা ও জীব-জন্তু যে এই জৈবনিক পদার্থের ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থার বিকাশের ফল, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কিছুমাত্র সন্দেহ বা মতভেদ নাই; কারণ নানা দিক্ দিয়া নানা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় জীবনের এই ক্রম-বিকাশ নির্ণীত হইয়াছে ও হইতেছে। সন্দেহ আছে ও জ্ঞানের অভাব আছে—জৈবনিকের উৎপত্তি অথবা উহার রাসায়নিক প্রকৃতির যথার্থ তথ্য সম্বন্ধে; সৃষ্টির যে নিয়মে জড়-জগৎ শাসিত, তাহাতেই সমগ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগৎ শাসিত।

পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়া বুঝাইয়াছি যে এরূপ প্রশ্ন অতি নিরর্থক যে, কোথা হইতে জড়ের প্রকৃতিতে এমন কিছু আসিল, যাহার ফলে নানা গতি, নানা ক্রিয়া ও নানা ফল ফলিয়া বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে; কারণ জড়ের উপাদানের জন্মের হেতু জিজ্ঞাসা করাও যাহা, ঐ অবস্থাগুলির কথা জিজ্ঞাসা করাও তাহাই। কি নিয়মে, কি পদ্ধতিতে, কিরূপ সংযোগের ফলে বিশ্ব গড়িয়া ওঠে, তাহাই বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধেয়।

জীবনের বেলায়ও সেই একই কথা। কি পদ্ধতিতে ও নিয়মে জৈবনিকের ক্রিয়ায় প্রথমে এক রকমের জীব বা উদ্ভিদ হইল ও পরে তাহা হইতে ক্রমবিকাশে উচ্চতর জীব ও উদ্ভিদ জন্মিল, তাহাই বিজ্ঞানে

নির্দ্ধারিত হয়। যেখানে স্নায়ুচক্রের বিকাশ হয় নাই, বা মস্তিষ্কের বিকাশ হয় নাই, অথবা শরীর একটি বিশিষ্ট রকমের কাঠামে গড়িয়া ওঠে নাই, সেখানে জৈবানিকের যে ক্রিয়া পাওয়া যায় না ও যে লক্ষণ ফুটিয়া ওঠে না, তাহা যদি বিশিষ্ট কাঠামের শরীরে স্নায়ুচক্র প্রভৃতির বিকাশে প্রকাশ পায়, তবে নিতান্ত অদ্ভুত রকমে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। উচ্চ জীবে যে "আমি" বলিয়া একটী জ্ঞান ফোটে, বেদনা ও চেতনা জন্মে, প্রেমের উচ্ছ্বাস বহে ও জ্ঞানের কৌতুহল জাগে, সে সকলই জৈবনিকের ক্রমবিকাশে বিশিষ্টরূপ শরীর-পরিগ্রহের ফলে।

আত্মা বলিতে কি বুঝি ও তাহা কেন বুঝি, তাহার বিচার এখানে হইবে না। গোড়ার অতি উত্তপ্ত পৃথিবীতে যাহা পুড়িয়া ধ্বংস হয় নাই, অনুকূল অবস্থায় চিতা-ভস্ম পার হইয়া জীবন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা জীবনের মৃত্যুর পরের দাহে কিরূপ পরিণাম পাইবে, সে তত্ত্বের বিচার পরে করিতেছি।

পার্থিব উপাদানেই পৃথিবীর উৎপত্তি, আর সেই উপাদানেই এই পৃথিবীর জীবন ও জীবের উৎপত্তি। আমরা পায়ের তলায় মাটি দলাই, আর মাটিকে ঘৃণ্য ভাবি; তাই সেই মাটি হইতে জীবনের উৎপত্তি ভাবিতে অনেকের মনে বাধে। কোন দেশের ধর্মশাস্ত্রেই বলে না যে, জড় গড়িয়াছিল একটা সয়তান্, আর জীব গড়িয়াছিলেন অন্যে। সসম্মানে ও সবিস্ময়ে যাহারা জড়ের দিকে চাহিতে পারে না, তাহারাই নাস্তিক ও পরমার্থ-তত্ত্বের বিরোধী। জড়ের মাহাত্ম্য বুঝিলেই সৃষ্টির ও স্রষ্টার গৌরব বুঝিব।

মরণ ভোল

৩

তাহা নাস্তিক তাহারা, অতি বড় স্থূলবুদ্ধির লোক তাহারা, যাহারা আত্মমোহে আপনাদের চৈতন্যটুকুর গৌরবে বাদবাকি সারা বিশ্বকে তুচ্ছ ভাবে,—জড় নামে পরিচিত পদার্থকে হেয় মনে করে। এই কুৎসিত চিন্তায় তাহারা খর্ব করিতে চায় তাঁহারই মহিমাকে যিনি অনাদি অনন্তরূপে বিশ্ব-বীজ। একদিকে ইহারা পড়া-পাখীর মত আওড়ায়—"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ", আবার অন্যদিকে বলে এই বিশ্বটা মায়ার ধাঁধা, এই জড় অতি অস্থায়ী অপদার্থ পদার্থ। যিনি চিরসত্য, তাঁহারই রচিত জড় নামে পরিচিত পদার্থের বিকাশে জীবের ও জীব-চৈতন্যের উদ্ভব; একথা স্বীকার করিতে মূঢ় লোকদের মানহানি হয়, যদিও জানে না—মহিমায় রচিত জড়ের নিগূঢ় রহস্য কি।

বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে এপর্য্যন্ত মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বল যতখানি বাড়িয়াছে তাহাতে সে দেখিয়াছে যে, সারা বিশ্বের উদ্ভবের ইতিহাস ধরিতে গেলে তাহাকে পৌঁছাইতে হয় এক অনন্ত শক্তি-স্রোতের কূলে, যেখানে আছে কেবল শক্তির লীলা ও অবিচ্ছিন্ন গতির খেলা। দেখিতে পাই, সেই গতির বর্তনেই বিদ্যুৎ-কুঁড়ি ফুটিতেছে, আর তাহা হইতে অণু-পরমাণু জন্মিয়া নানা ধরণের সংযোগে বিশ্ব গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। কাহারও সাধ্য নাই, তাহার ধ্বংস কল্পনা করে বা তাহাকে অস্থায়ী স্বপ্নের খেলা বা মায়ার খেলা বলিতে পারে।

বলিয়াছি, একদিন আমাদের এই পৃথিবী শবদাহের চিতার আগুনের চেয়ে কোটি-কোটি গুণে অধিক উত্তপ্ত আগুনের গর্ভ হইতে জন্মিয়াছিল, আর অনেকখানি শীতলতা লাভের পর জন্মিয়াছিল তাহার জড়-পিণ্ড বা কাঠামখানা, ও আরও অনেক পরে জন্মিয়াছিল তাহার গর্তে-গর্তে বা সাগরে-সাগরে জল। এ কথাও বলিয়াছি যে একদিন বিশেষ অনুকূল অবস্থায় পৃথিবীর কাঠামখানার কোন-কোন উপাদান সাগরের জলে পুষ্ট হইয়া সেই জৈবনিকের জন্ম হইয়াছিল, যাহা গাছ-পালা হোক, প্রাণী হোক, সকলেরই জীবনের মূল। এই ক্রম-বিকাশের লীলাতেই যে, জীবে-জীবে চৈতন্য জন্মিয়াছে ও আমাদের আমি-বুদ্ধির সংজ্ঞা জন্মিয়াছে, তাহা সবিস্ময়ে ও অকুণ্ঠিত ভক্তিতে মনে রাখিতে হইবে।

আমাদের চৈতন্যের প্রতিভায়, মননের ও কামনার প্রকৃতিতে ও জীবনভরা সকল কর্মের গতিতে এমন কিছুই নাই যাহার উদ্ভব ও পুষ্টি হয় নাই বা হইতেছে না জড়ের সংযোগে ও জড়ের রসে। যাহা জড়ের অণুতে অণুতে ছিল, তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে মানুষের সকল কর্মে ও ধর্মে, অর্থাৎ যাহা বিশ্ববীজে ছিল, তাহাই আমরা পাইয়াছি। যাহাদিগকে আমরা নীচ জীব বলি, তাহাদের মধ্যে যে চেতনা ও নানা প্রবৃত্তির লীলা ও কর্ম দেখিতে পাই, তাহারই অধিকতর বিকাশ দেখি মানুষে।

বাঁচিতে চায় সকলে। এই বাঁচার প্রার্থনা মানুষের মনে তাহার সংজ্ঞার সঙ্গে জুড়িয়া উচ্চারিত অথবা প্রার্থিত হয়; কিন্তু যেখানে এই প্রার্থনা সংজ্ঞায় জাগে না, কেবল শরীরের কাজে লক্ষিত হয়, সেখানেও এই প্রার্থনা আছে ষোলআনা। পরমাণুরা মরে না, তাহাদের মরণ নাই; ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা অন্য পরমাণুর সঙ্গে জুড়িয়া বৃহৎ হইতেছে,

বিশ্ব গড়িতেছে,—অক্ষয় হইয়া চলিয়াছে। সংজ্ঞাহীন এক কোষের ছোট-ছোট জীব মরণদায়ক বিষের স্পর্শে কোঁচকাইয়া সেই দিকে যায়, যে দিক তাহার স্থিতির অনুকূল। আঁধার স্থানের লতাটি ডগা বাড়াইয়া ধায় আলোকের দিকে, অজ্ঞাতে তাহার জীবন বাড়াইবার অনুকূল দিকে। অতি নীচের স্তরের জীব থেকে মানুষ পর্য্যন্ত সকলেই জীবন-মূলের জৈবনিকের ধর্মে বাঁচিয়া থাকিবার টানে ছুটিতেছে ও বাঁচিয়া বাঁচিয়া জীবনের পথের যত কর্তব্য তাহা মরণ ভুলিয়া সম্পাদন করিতেছে। এই মৌলিক মর্মান্তিক টানের গতিতে বা সুখে আমরা মরণ এড়াইয়া চিরজীবী হইবার বাসনা করি, আর শরীর পুড়িয়া গেলেও আমাদের চেতনা অনন্ত কাল অক্ষয় রহিবে, বিশ্বাস করি।

মানুষের এই আকুল বাসনা কি ধাঁধা? অণুপুঞ্জ মরে না; সে চিরস্থায়ী। এই জড় বিশ্বের কোথাও ধ্বংস বা মরণ নাই। সে বিশ্ব কেবল পরিবর্তনে নূতনতর ও উন্নততর হইয়া বাড়িতেছে। সকলেই বাঁচে; কেবল মরিবে আমাদের বিবর্তনে জাত চেতনার সংজ্ঞা ও আমিত্ব? এই প্রশ্ন পদ্যের আকারে ঠিক পঞ্চাশ বৎসর আগে একটি রচনায় লিখিয়াছিলাম; তাহার এক ছত্র এই—'সকলেরই পরিণতি —অক্ষয় অমর গতি, চৈতন্যের ভাগ্যে একা আঁধার নির্বাণ!' বিশ্বে উদ্ভূত কোন পদার্থই যখন মরে না, তখন মানুষের সংজ্ঞাবদ্ধ আমিত্বের বেলায় কেমন করিয়া এই বিশ্বব্যাপী নিয়মের ব্যতিরেক খাড়া করিয়া স্থির করিব যে, এই এখনকার মত শেষের দিকের এই সংজ্ঞাময় চৈতন্য কেবল ধ্বংস হইবার জন্য উদ্ভূত হইয়াছে? কোন মানুষের পক্ষে তাহার মরণের পরের চৈতন্যের পরিণতির কথা জানিবার উপায় নাই; কোন মানুষেরই আলাদা আর একটা চৈতন্য দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিতে পারে না যে, শরীরান্তে চেতনার কি হইল। জানিবার উপায় নাই বলিয়া

কল্পনায় মরণ-পারের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া মৃতের ভূতের ছবি তুলিতে পারি না অথবা মস্তিষ্কের বিকার ঘটাইয়া ভূতের বাণী শুনিতে ও শোনাইতে পারি না। অন্য দিকে আবার চেতনার স্বরূপ জানিবার চেতনা নাই বলিয়া—নিজের ঘাড়ে নিজে চড়িতে পারি না বলিয়া, স্পর্দ্ধায় বলিতে পারি না—সারা বিশ্বের নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটে ও আমাদের উদ্ভূত বা বিকশিত চেতনা দীপ নিভিবার মত নিভিয়া যায়। "জানি না"—বলিয়া স্থির থাকিবার বুদ্ধি ও বুকের পাটা অতি অল্প লোকেরই আছে। কেহ বা মূঢ়তায় ও চপলতায় পরলোকের মানচিত্র আঁকিয়া নানা মতবাদ সৃষ্টি করে, আর কেহ বা সমানে সেই মূঢ়তায় ও চপলতায় এই দাম্ভিক অজুহাতে চৈতন্যের স্থিতি অস্বীকার করে যে সে নিজে উহার স্থিতির প্রমাণ পায় নাই বা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রকৃতির অবস্থা ধরিয়া যখন বিচার করি, তখন বিকশিত আমিত্বের বিলোপ কল্পনা করা অসম্ভব হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবী যে অগ্নি-গর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে তাহার তাপের সঙ্গে তুলনায় আমাদের চুলার আগুন ও চিতার আগুন শীতল শিশিরের ফোঁটা। সেই দাহের পর পৃথিবী মনোহর রূপ ধরিয়া বাড়িল ও সেই দাহের মধ্যে তাহার অন্তরে যে জীবনের বীজ ছিল, তাহা বিকশিত করিয়া জীবলীলা বাড়াইল ও মানুষের মত জীবে সংজ্ঞাময় আমিত্ব জন্মিল। এই অবস্থার দিকে তাকাইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছি ও যাহা প্রকাশিত হয় নাই, তাহা এই :—

যমের বাণী ; ওহে প্রাণী, কিসের লাভে
দুঃখের পুঁজি বাঁচাতে চাস্—খুঁজে আবার নূতন আবাস ?
নির্বাণে তোর সকল জ্বালা নিভে যাবে।

বটেরে শঠ! এ যে বিকট ফাঁপা ফাঁকি!
সৃষ্টি যুগের দাহ সয়ে—জীবন-বীজের আধার বয়ে
উঠ্‌ল বেড়ে সজীব ধরা। জানিস্ না কি!

সেই যে বিকাশ, সেই ইতিহাস ভুল্‌বি কি তুই!
জন্ম-যুগের অগ্নি-সিন্ধু,—চিতার আগুন শিশিরবিন্দু।
যমের ছলায় জীবন বিলায় নেহাৎ ভীতুই।

দিব্য বুঝি দুঃখের পুঁজির গরব মহান্‌,
দুঃখ মনের ভ্রান্তি তাড়ায়—মাহাত্ম্যকে ফুটিয়ে বাড়ায়।
বিশ্বপতি তাই ত অতি দুঃখ সহান্‌।

শ্মশান-ঘাটের পোড়া কাঠেই তোমার দাবি!
দুঃখে গড়া মহৎ বিত্ত,—নিয়ে যাবে অমর চিত্ত;
তুই ত বেজায় ছাই মেখে গায় উড়ে যাবি!

কবিতায় প্রকাশিত আশাটুকু খাঁটি বৈজ্ঞানিক তথ্য বলিয়া প্রচার করিতেছি না; কেবল একটা ভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শরীর ভস্ম হইলে তাহার উপাদানপুঞ্জ পরিবর্ত্তিত হইয়া নানা অণুতে মিলিয়া এই পৃথিবীতেই জীবিত থাকে; উহার উপমায় কেহ-কেহ এই উপপত্তি বা মতবাদ খাড়া করিয়াছেন যে, শরীরের জড়পুঞ্জের রসে পুষ্ট চৈতন্যটুকু এই পৃথিবীরই এ-জীবে সে-জীবে জন্ম পাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সংসার-চক্র মতবাদের অনুকূলে যে প্রমাণটি দাখিল করা হয় তাহার বিচার করিতেছি। প্রথম কথা এই চৈতন্যের যখন থাকাই চাই,

তখন সে থাকে কোথা; দ্বিতীয় কথা এই আমরা দেখিতে পাই মানুষে-মানুষে শরীরে, মানসিক ক্ষমতায় ও ধর্মবুদ্ধিতে কত প্রভেদ। এই অবস্থাটির ব্যাখ্যায় বলা হয় কর্মফলে ভিন্ন-ভিন্ন মানুষের বা জীবের আত্মা ভিন্ন-ভিন্ন দেহ আশ্রয় করিয়া বাড়ে বলিয়া এই প্রভেদ ঘটে। এরকম প্রমাণের উপর যে ঐ মতবাদটি কিছুতে টিকিতে পারে না, তাহার আভাস দিতেছি। বীজ রাখার জন্য গাছে যে বেগুনটি পাকাই, সেটিকে কাটিলে দেখিতে পাই—বীজগুলির মধ্যে কতকগুলি আছে অন্য অনেক বীজের সঙ্গে ঠেসাঠেসি করিয়া, অবয়বে ছোট হইয়া অথবা কিছু বিকৃত হইয়া; আর কতকগুলি আছে বেশ মুক্তভাবে সুবিকশিত অবস্থায়। এখন বীজ বিভাগ করিয়া যদি বেগুনের গাছ লাগাও, তবে দেখিবে যে, ভাল বীজের গাছে ভাল বেগুন হইয়াছে, আর বিকৃত বীজের গাছে ভাল বেগুন ফলিতেছে না। বেগুনের ও বেগুনের বীজের সুকৃতি-দুষ্কৃতির কর্মফল কল্পিত হয় না, অথচ একই বেগুনের বীজের গাছে কত প্রভেদ ঘটে। মানুষের বেলায় যখন দেখিতে পাও, তাহারা নানা রকমের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শিক্ষা পাইয়া বাড়ে ও সন্তান উৎপাদনের সময়ে বিভিন্ন রকমের স্বাস্থ্যে ও মনের ভাবে সন্তানদের জনক-জননী হয়, তখন অযথা একটা কর্মফলের ফাঁকিতে আত্মার পুনর্জন্ম কল্পনা কর কেন? পূর্বে গোটাকতক জীবন-রহস্যের কল্পিত ব্যাখ্যার সমালোচনায় যাহা বলিয়াছি, এখানেও তাহাই বক্তব্য। জড়ের দিকে বা কোনও জীবের দিকে না তাকাইয়া ও বিশ্বব্যাপী নিয়মের কথা না ভাবিয়া মানুষেরা জীবনের সমস্যা পূরণ করিতে গিয়া পদে-পদে কেবল কল্পনার আশ্রয়ে ধাঁধা গড়িয়াছে। কোন কাজ করার মানেই হইল, সে-কাজের একটা ফল আছে; এই সোজা কথাটার উপর একটা ধাঁধা জুড়িয়া বেজায়

রকমের বিরাশী-দশ আনা ওজনের যে কর্মবাদ খাড়া করা হইয়াছে, সেটা মাকড়সার জালে জড়ান অতি অসার তথ্য। সুপ্রথায় সত্যের আলোচনার সময়ে এই সকল গুরু ওজনের তথ্যকে উপেক্ষা করাই ভাল। যাহা বুদ্ধিতে কুলায় না, তাহার ব্যাখ্যায় হেঁয়ালি রচনা করিলে বুদ্ধির উপরে বোকামিকে বড় স্থান দিতে হয়। যাঁহারা বলেন যে যাহা কিছু জ্ঞান বা বুদ্ধির জোরে বোঝা যায় না, তাহা বুঝিতে হইলে পৃথিবীর সকল অবস্থা ও ঘটনা ভুলিয়া অন্ধকারে বসিয়া ধ্যানের জোরে ধরিতে হয়, তর্ক করিয়া তাঁহাদের ধ্যান ভাঙ্গা অসম্ভব। জগদীশচন্দ্রকে ও রমন্‌কে যদি পদার্থ-নিরপেক্ষ হইয়া ধ্যান করিয়া তথ্য ধরিতে বলা যায়, তবে ফল কি হইবে?

আমরা মানুষের ভয়-ভাবনার বিষয়েই এত কথা লিখিতেছি; সেই জন্য কেবল বিচার্য্য এই—মানুষের মনে বিকশিত সুসম্বদ্ধ আত্ম সংজ্ঞার পরিণতি কি। এই যে বলিয়াছি যে যাহা কিছু উদ্ভূত বা বিকশিত, তাহাদের সকলেরই যখন স্থিতি আছে, তখন ঐ সুসম্বদ্ধ অবস্থার লোপ বা নির্বাণ ভাবা সুসঙ্গত হইবে কি না। এ বিষয়ে একটি যুক্তির কথা বলিব যাহা হয়ত সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সুবোধ্য না হইতে পারে। যাঁহারা বীজগণিতের থিওরেম্ অঙ্ক কষিয়াছেন, তাঁহাদের বিবেচনার জন্য এই যুক্তিটি দিতেছি। যেখানে আমরা একটা অজানা n বা একটা 'ক্ষ' অবস্থার মূল্য বা সত্য ধরিতে যাই, তখন অঙ্কটি কষি এইভাবে, যথা—'ক+খ'-কে প্রথমে একের গুণ চড়াইয়া গণি ও পরে পরে অন্য অঙ্কের মূল্য গণিয়া n—১ অথবা 'ক্ষ—১' গুণে গণিয়া দেখি যে, অজানার পূর্ব অবস্থা পর্য্যন্ত কতখানি প্রত্যক্ষ মূল্য পাওয়া যায়; তখন অঙ্ক কষিয়া স্থির করি যে যাহা ক্ষ—১ পর্য্যন্ত সত্য তাহা অনির্দ্দিষ্ট 'ক্ষ' সম্বন্ধেও সত্য। গণিতের এই সূক্ষ্ম বিচার ধরিয়া বলিতে

বলিতে চাই যে, অণু-পরমাণু হইতে পৃথিবীর সকল অবস্থাই যখন স্থায়ী, যখন সকল পরিবর্তিত অবস্থাতেই একটা নূতনের উদ্ভব বা উন্নতির উদ্ভব, তখন এই শেষ অজানা কথাটির বা চৈতন্যের উদ্ভবের বেলায় কেমন করিয়া বলিব যে উহার স্থিতি থাকিবে না বা উহা পারিবর্তনে নূতনতর উন্নতিতে বাড়িবে না। এখানে আমি প্রত্যেক ব্যক্তির মনে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র উদ্ভাসিত বা বিকশিত সংজ্ঞার কথা বলিলাম।

আমি বলিয়াছি, প্রতি মানবের মনে উদ্‌বুদ্ধ স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভাবে সু-সম্বদ্ধ সেই সংজ্ঞার কথা, যাহা আমিত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে জড়াইয়াই যথার্থ চৈতন্য নাম পাইতে পারে। সকল চৈতন্য একসঙ্গে জড়াইয়া আত্মপর-বোধ হারাইয়া যে অবস্থা ঘটিতে পারে সেই অচিন্ত্য ভাবের কথা বলি নাই, আর সেই ভাব যে আপন-পর-জ্ঞানে উদ্‌বুদ্ধ চৈতন্যের পক্ষে অচৈতন্য জড়ত্বের মত, সে কথা লক্ষ্য করিয়াও কিছু বিচার করি নাই। প্রতি ব্যক্তিনিষ্ঠ সংজ্ঞার প্রকৃতি ও পরিণতির কথাই আলোচনা করিয়াছি। আমরা ভাবিতে বাধ্য—বলিতে বাধ্য যে, এই বিশ্ব-প্রকাশের আদি ও অন্ত আমাদের এ-পর্য্যন্ত বিকশিত মনের ধারণার অতীত। এ কথাও খাঁটি সত্য—যে চপলতার ফাঁকা দাম্ভিক তর্কে যে-শ্রেণীর নাস্তিকতার কথা আগে শোনা যাইত, এখন আর ধীর পণ্ডিতদের মুখে তাহা শোনা যায় না। নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন ধারণা আছে তাহা উপেক্ষা করিয়াই বলিতে পারি যে, এই সাধারণ ধারণা জ্ঞানীদের মধ্যে প্রবল যে, এক অনাদি অনন্ত সত্তা এই অশেষ বিশ্ব-প্রকাশের মূলে। উদ্ভবের এই মূল সত্তা যে, সৃষ্টি শেষ করিয়া দূরে বসিয়া আছেন বা পেন্সন ভোগ করিতেছেন, এখন এই অবৈজ্ঞানিক চিন্তার উদয় অসম্ভব; আমরা দেখিতেছি প্রতি মুহূর্তে প্রতি পলে অনবরত জড় বিশ্বের ও মানবের মনে নূতন নূতন সৃষ্টির

পরিবর্তন ও উন্নতি চলিয়াছে। যে সত্তা হইতে আমাদের চৈতন্তের উদ্ভব, যাঁহাকে নিত্যই বুঝিতেছি তিনি অশেষ কর্মা—সেই চৈতন্য-দাতা তাজা।

অলিভার লজই হোন, আর যে কোন বুজরুকই হোন, কাহারও সাহায্যে বুঝিতে পারিব না যে আমাদের জীবনে বর্দ্ধিত সুসম্বদ্ধ সংজ্ঞা মরণান্তে কি ভাবে কোথায় থাকে। চেতনার প্রকৃতিতে যে জ্ঞান জন্মা অসম্ভব, তাহা আমার মধ্যে কিরূপে ফুটিবে, যদি চৈতন্তের প্রকৃতি না বদ্‌লাইয়া যায়? কাহারও চৈতন্য এমনভাবে বদ্‌লাইলে তাহা অনায়াসে ধরা পড়িত; কারণ দেখা যাইত যে তাহার সাধারণ দশটা কাজ বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের কাজ বুঝিবার ক্ষমতা হইতে ভিন্ন কি-না। এরূপ ভিন্নতা থাকার কোন নিদর্শন পাই না, অথচ যে-বিষয়ের পরীক্ষার সুবিধা নাই, সেই অদেখা বিষয়টির বেলায় একটা বুজরুকির দম্ভ শুনিয়া ভুলিব কি করিয়া? যে বুদ্ধিতে লোকে অজানা তত্ত্বের ব্যাখ্যায় ধাঁধা রচে ও বুদ্ধির মাকড়সার জালে নিজেকে জড়ায়, সেই বুদ্ধিতেই বুজরুকিতে বিশ্বাস করে। ঈশ্বরে বিশ্বাসীদেরও "জানি না" বলিয়া থাকার বুকের পাটা নাই।

পৃথিবীর সকল ঘটনার তুলনায় বুদ্ধির লজিক্-এ আমাদের ব্যক্তিনিষ্ঠ সংজ্ঞাকে অস্থায়ী বলিবার অধিকার আমাদের নাই; কিন্তু তাই বলিয়া পরলোকের একটা নক্সা গড়িবার ক্ষমতা বা অধিকার জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের জীবনের মূল যে জৈবনিক, তাহার নিগূঢ় ধাতুর প্রকৃতি এই—সে আমাদের সংজ্ঞাবদ্ধ জীবনকে অবিশ্রান্ত ভবিষ্যতের দিকে চালাইতেছে,—মরণের চিন্তা থাকিলেও মরণ ভুলাইয়া কর্তব্য পালনের দিকে ছুটাইতেছে। এ অবস্থায় জুজুর ভয় বাড়াইয়া কর্ম্মে অপটু হওয়া ভীরু কাপুরুষের কর্ম। জীবন যে-ভাবে বাঁধা আছে,

তাহাকে জুজুর ভয়ে বিধ্বস্ত না করিয়া উহাকে ঠিক একটি ঘড়ির মত বাঁধিয়া চল ; দম্ দেওয়ার ফলে ঘড়িকে যেমন একটা নির্দিষ্ট সময়ে দম্ ফুরাইয়া অচল হইবার থাকিলেও টক্-টক্ করিয়া ঠিক সময় রাখিয়া দম্ ফুরাইবার মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চলিতে হয়, তেমন-ই করিয়া দম্ ফুরাইবার মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মৃত্যু ভুলিয়া প্রফুল্ল মনে কাজ করিয়া যাও। এইভাবে জীবনকে বাঁধিতে হইলে ও প্রফুল্ল মনে কর্ত্তব্যের পথে চলিতে হইলে, মানুষের পক্ষে চাই—সেই অতি সত্য অনন্ত সত্তার দিকে দৃষ্টি ফেলা। উপনিষদে আছে, আমাদের সর্ব সংশয় ছিঁড়িয়া যায় (ছিদ্যন্তে সর্ব-সংশয়াঃ), যদি ঐ সত্তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে,—যদি যাহা খাঁটি সত্য তাহাকে সত্য বলিয়া ধারণ করি। তুমি যখন ইচ্ছা করিয়া বিশ্ব-ব্যাপী আইনকে বদ্‌লাইতে পারিবে না, তুমি যখন জান—'বিধাত্রা বিহিতং মার্গং ন কশ্চিদধিবর্ত্ততে',—তুমি যখন জান যে তোমার কল্পনায় গড়া মতবাদকেই অনন্ত সত্তা আপনার আইনরূপে রচনা করিবেন না, তখন তুমি এই প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে সেই সত্তাপ্রদত্ত জ্ঞান ধরিয়া অগ্রসর হও, মরণকে ভোল —

শৃণোতু যো বৈ মরণাদ্ বিভেতি
সত্তা নু নিত্যা ভুবনে নিগূঢ়া
জাগর্তি সা চেতসি সত্যমেতৎ
মৃত্যুর্হি ছায়া নবচেতনায়া।

চেতনায় এই "নব" কি হইবে জানি না। আমরা দেখিতেছি যে, জীবের উদ্ভব হইয়াছে, যাহাকে জড় বা অচেতন বলি তাহার রসে ; আর আমাদের আমিত্বযুক্ত সংজ্ঞা পুষ্টি পাইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে শরীরের ক্রিয়ার রসে, পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার রসে ; ও প্রত্যেক শরীরে সে নিজের

স্বতন্ত্র বিশেষত্ব বাড়াইয়াছে পৃথিবীর মানুষের সংঘর্ষে আসিয়া তাহাদের দ্বন্দ্বে ও প্রেমে। এই যে প্রেমাদি রসে পরিপুষ্ট স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চেতনা, সে নিজের নিজের বিশেষত্বে বৃদ্ধির কিরূপ টান বা গতি পাইয়াছে, তাহাতে সে যেদিকে আকৃষ্ট হইয়াই ছুটুক, তাহাতে ভাবনার কথা কিছুই নাই।

যাহারা বলে, আত্মা কেবল একাই দ্রষ্টা, তাহার গায়ে কিছু লাগে না, অর্থাৎ সে কোন পৃথিবীর রসে পুষ্ট হয় না, তাহাদের সেই কল্পিত আত্মার কেহ কখনও সন্ধান পায় নাই ; ভূত নামাইবার আসরেও এ যুগে রূপধারী আত্মার কথাই শুনি। আমরা যে বিকশিত চৈতন্যের কথা বলিলাম তাহা ত পৃথিবীর রসে উৎপন্ন ও প্রেম প্রভৃতি নানা ভাবে পরিবর্দ্ধিত। কাজেই এই যে সংজ্ঞাবদ্ধ চৈতন্যের কথা বলিতেছি, সেই বিশেষরূপে উদ্ভূত সামগ্রি স্থায়ী হইলে, সে ত যে-সকল রসে পুষ্ট হইয়াছে তাহা এড়াইয়া যাইতে পারে না ; অর্থাৎ তাহার ভাব জন্মাইবার ও পুষ্টি জন্মাইবার আধার বা পদার্থ যেখানেই পড়িয়া থাকুক, সেই বর্দ্ধিত চেতনাকে নিশ্চয়ই আধারগুলি হইতে প্রাপ্ত ফলে বা গুণে ভূষিত থাকিতে হইবে। ক্ষোভে ও বৈরাগ্যে মানুষ বলিতে পারে, তাহাকে পৃথিবীর সকল পদার্থ ছাড়িয়া যাইতে হইবে, কিন্তু এই সুসম্বদ্ধ সংজ্ঞার বা চেতনার যদি স্থিতি থাকে তবে সে তাহার অর্জিত কিছুই ফেলিয়া যাইতে পারে না; কারণ সকল অবস্থার ভাবের রসেই তাহার পরিবর্দ্ধন।

এই প্রসঙ্গে ও চিন্তায় মনে হইতেছে চৈতন্য সম্বন্ধে একটা কথা, যাহা কল্পনার খেয়ালে জাগা স্বপ্নের মত। যাহা জড়, তাহা যদি বিবর্তনের ফলে জীব গড়িল, ও আমিত্ব-সংজ্ঞায় ভূষিত আমাদিগকে গড়িল, তবে কি একদিন ভবিষ্যতের বিবর্তন-ফলে আমাদের সারা দেহ

জড়ত্ব পরিহার করিয়া চেতন হইয়া উঠিবে, অথবা অতি দূর দূর ভবিষ্যতে সারা বিশ্ব সংজ্ঞায় জাগিয়া অনন্তে আবর্তিত বিবর্তিত হইবে? যাহা অল্পে ফুটিয়াছে, তাহা কি বৃহত্তর প্রসারে ফুটিয়া ওঠা অসম্ভব? এ সম্ভব-অসম্ভব যাহাই হোক, একদিকে যেমন দেখিলাম, আমাদের বিকশিত চেতনা ধ্বংস হইবার নয়, অন্য দিকে তেমন-ই দেখিলাম, আমাদের পরিণতি যাহাই হোক, মৃত্যু ভুলিয়া কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়াই শান্তিতে জীবন-ধারণের শ্রেষ্ঠ পন্থা

জুজুর ভয় ছাড়

[পাঠকেরা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন—এ প্রবন্ধের পক্ষে উপযোগী হইবে প্রাচীনের সেই সংস্কারের আলোচনা যাহার মধ্যে তাজা জুজুর ভয় প্রচ্ছন্ন আছে। প্রাচীন শাস্ত্রের শিক্ষণীয় ও পরম আদরণীয় সামগ্রির বিবৃতি এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক।]

১

মানুষের প্রকৃতি—সে জাগ্রত মনে, সুস্থ শরীরে প্রাণের প্রফুল্ল আকর্ষণে সকল বাধা এড়াইয়া বাড়িয়া উঠিবে। তাহার এই বিকাশের কামনা কোঁচকাইয়া পড়ে জুজুর ভয়ে; অজানা আশঙ্কায় ও আতঙ্কে এমনই জড়সড় হয় যে সে জাগরণের প্রফুল্লতা হারাইয়া হয় দুর্বল, অকর্মা ও কুকর্মা। মানুষ তখন কাপুরুষ হইয়া ভাবে, অজানা কি যেন তাহাকে বাধা দিয়া ঘাড়ের কাছে টিক্‌টিক্ করিতেছে; কে যেন এক সয়তান বা সয়তানের দল বা রুদ্র তাহাকে পিষিয়া মারিবার জন্য জোট্ বাঁধিয়াছে আর বজ্র ওঁচাইয়াছে। ভীরু কাপুরুষ হাত জুড়িয়া স্তুতির মন্ত্রে পড়িতেছে—মা মা হিংসীঃ। এই কাল্পনিক দৈবকে পায়ে দলিবার শক্তি তাহার নাই; তাহার কানে এই বাণী পৌঁছায় না, দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা। স্বয়ং শক্তিদাতার ঘাড়ে এই সয়তান চাপিবার উপন্যাস প্রাচীন বাইবেলে সুস্পষ্ট আছে। সয়তান কল্পনার মানে হয় এই যে, পাপের স্রষ্টা সয়তান মানুষকে শাসন করিতেছে, আর তাহাকে বিপথে চালাইয়া মরণের ভাগী করিতেছে; আর মানুষেরা সেই বিপদে পড়িয়া ঈশ্বরকে স্তব-স্তুতি করিয়া সয়তানের হাত হইতে মুক্তি চাহিতেছে।

এই জুজু বা সয়তানের ভয় জন্মিবার ইতিহাস আছে। বৃথা কল্পনার মারাত্মক ভয় এড়াইবার পক্ষে সেই ইতিহাসের একটু আলোচনা বড় উপযোগী ; সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি।

এই-যে মানুষ ঘাড়ের উপরে মাথা ঠিক রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে, আর হাতের বা লাঠির উপর ভর না করিয়া চলিতে ফিরিতে পারে, আর তাহার মনের ভাব মুখের স্পষ্ট ভাষায় বলিতে ও বুঝাইতে পারে, তাহার উৎপত্তির বিবরণ না দিয়া কেবল এইটুকু বলি যে সে কম্‌সেকম্ পাঁচ-ছয় লাখ বছর আগে এই পৃথিবীতে দেখা দিয়াছিল। আমি বলিব এই খাঁটি আদি মানুষদের কথা,—তাহাদের পূর্ববর্তীদের কথা নয়। এই আদি পুরুষদের জ্ঞান ছিল একালের তুলনায় অনেক অবিকশিত ; সেই জ্ঞানেই তাহাদের মনে ফুটিয়াছিল কথঞ্চিৎ অসীমের ভাবনা। এ ভাবনায় ভয় ছিল না, ভক্তিও ছিল না ; ছিল কেবল বিস্ময়। আদিকালের এই মনের ভাবের একটুখানি সাক্ষী সে-যুগের মানুষের বাসের গুহায় রক্ষিত চিত্র, আর যে-ভাবে মৃত্যুর পর মানুষকে পরপারের জন্য ভোগ্য সামগ্রি দিয়া সমাধিস্থ করিত সেই সমাধি ; মনে হয় মৃত্যুকে সমাধিস্থ করিবার সময় পরপারে তাহার জন্য স্বজনেরা কল্যাণ কামনা করিত, আর সেই কামনা ছিল কিঞ্চিৎ ভক্তি-রসে পুষ্ট। অল্প কিঞ্চিৎ ভক্তি-রসের উদয়ের কথা বলিলাম এই জন্য যে, বিস্ময়ে অজানাকে মনোহর ভাবিবার বোধ আর মনোহরের প্রতি মধুর আকর্ষণের সৃষ্টি যুগ-যুগান্তরের জ্ঞানের উন্নতিতে ঘটিয়াছে আর আদি-যুগের কঙ্কাল বহু-পরিমাণে জ্ঞান-বিকাশের পরিচয় দেয় না।

যাহা বলা গেল তাহার সমর্থনে বিচারিত হইতে পারে এখনকার অনুন্নত জাতির মনের ভাব ও অজানার প্রতি বিশ্বাসের প্রকৃতি। 'কোল্‌'নামে পরিচিত জাতির লোকেরা যেখানে প্রতিবেশী হিন্দুদের

প্রভাবে বা আওতায় পড়ে নাই আর অসাধারণ প্রফুল্লতায় জীবন-ধারণ করিতেছে, তাহাদের দৃষ্টান্ত হইবে বড় উপযোগী। সীমায় বাঁধা নাই আর গাছ-পাথরের মত চোখে দেখা যায় না, এমন এক দেবতাকে ইহারা শ্রেষ্ঠ দেবতা বা মারাঙ্গ বোঙ্গা বলে আর স্বপ্নে ভুলিয়াও মনে করে না যে সেই মারাঙ্গ বোঙ্গা কোনও অত্যাচার বা উৎপীড়ন করেন। যিনি মানুষ গড়িয়াছেন আপনার ইচ্ছায় তিনি যে মানুষকে হিংসা করিতে বসিবেন, এ পাপ চিন্তা তাহাদের মনে ঠাঁই পায় না; তবে ইহাদের মনে বিস্ময়ের আধিক্যে বা প্রসারে অজানাকে মনোহর বলিয়া প্রাণে টানার ভাব জাগে নাই। ভাবের সে-রকমের সূক্ষ্মতা অধিকতর মানসিক বিকাশেই ঘটে। জ্ঞানের উন্নতিতে—ইন্দ্রিয়গুলির অনুভূতিতে সূক্ষ্মতা না বাড়িলে যে, মানুষের কাছে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ খুব স্থূল না হইলে অনুভূত হয় না তাহা স্মরণ করা চাই। ছবির গায়ে খানিক উজ্জ্বল রঙ্ ঢালা না থাকিলে যে, অনুন্নতের চোখে চিত্র সুন্দর হয় না,—তীব্র মধুর বা তীব্র ঝাল না হইলে যে, জিভের তৃপ্তি হয় না,—মাথা ধরাইবার মত চাঁপা ফুল নাকের গোড়ায় না শুঁকিলে যে, সুগন্ধের মাধুরী অনুভূত হয় না,—জোরে গায়ে ধাক্কা না দিলে বা আঁচড়াইয়া বা কামড়াইয়া পীড়ন না করিলে যে, স্নেহ-প্রেমের স্পর্শ গায়ে লাগে না আর উৎকট ঢাক-ঢোল, খোল-করতাল না পিটিলে ও বিকট চীৎকার না করিলে যে, সঙ্গীতের শব্দ কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে না—এ সকল দৃষ্টান্ত সকলেরই পরিচিত। আমরা জানি যে, গানে ও কবিতায় মড়া-কান্না না জুড়িলে অনেকের মনে করুণ রসের সঞ্চার হয় না।

যেখানে হিন্দুদের দৃষ্টান্তে অভিভূত হয় নাই সেখানে কোলেরা একেবারেই মারাঙ্ বোঙ্গাকে, পূজার নামে তোয়াজ করিতে বসেনা;

কেন-না এই বিস্ময়ে অনুভূত দেবতা রক্তলোলুপ ন'ন্ বা উৎপীড়ক রাজা ন'ন্। এই জাতির সমাজ-বাঁধনের পদ্ধতিতে কখনও রাজার সৃষ্টি হয় নাই, তাই রাজাকে তোয়াজ করার অনুকরণে ইহারা শ্রেষ্ঠ দেবতাকে রাজা বলিয়া তোয়াজ করিতে শেখে নাই। জীবনে আছে নানা রকমের দুঃখ-কষ্ট ও মরণ; ইহারা মনে করে, সে সকল বিপদ ঘটে কতকগুলি দুষ্ট ভূতের উৎপাতে। তাই বিপদের আশঙ্কার সময়ে বা বিপদের দিনে ইহারা পূজা করিয়া ও বলি দিয়া তৃপ্ত করিতে চায় ও থামাইয়া রাখিতে চায় ভূতগুলিকে। বিপদে না পড়িলে ভূতের পূজা করে না; তাই এক-একটা ভূতের পূজার জন্য এক-একটা দিন নির্দিষ্ট হয় নাই, অর্থাৎ দেবতার পূজার বাঁধা-বাঁধি নিয়মে সমাজ বাঁধা পড়িয়া আড়ষ্ট হয় নাই। ইহাদের "কর্মা" প্রভৃতি হিন্দুদের আওতায় নীচশ্রেণীর হিন্দুদের কাছে পাওয়া। এই যাহা পাওয়া তাহাও ইহাদের কাছে উৎসব,—কোনও ঠাকুরের পূজা নয়। ইহারা পরলোকে মুক্তি চাহিয়া চেঁচায় না। আমাদের পোড়া কপাল —কোল্ প্রভৃতি জাতির পোড়া কপাল যে ইহাদের ঘাড়ে নীচশ্রেণীর হিন্দুদের ধর্ম চাপাইবার জন্য স্বরাজ্য-সাধক শিক্ষিত একটি দল উদ্যোগী হইয়াছেন।

ভূত মানার জন্য অনুন্নতেরাই একা দায়ী নয়; সভ্য নামে পরিচিতদের অনেকেই পৃথিবীর সকল সমাজে ভূত মানে, আর যাহারা মানে না বলে, অন্ধকারে একলা-দোকলা চলিলে তাহাদেরও ভূতের ভয়ে গা ছম্ছম্ করে। উচ্চ জ্ঞানের অভিমানী অলিভার লজের দলে ও পাকা ব্রহ্মজ্ঞ বা থিওসফিষ্টদের দলে ভূতের লীলা-খেলা বড় অধিক। বহু জাতির দেব-পূজায় যে আছে ভূতের পূজা, তাহাও পরে দেখাইতেছি। কাজেই জুজু তাড়াইবার আয়োজনে ভূত-পেত্নীর

সংস্কারের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। প্রায় ৫০ বছর ধরিয়া নানা সময়ে নানা প্রবন্ধে সে ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি; তবুও এখানে আবার করিব। মৃত্যুর পর মানুষের চেতনা কি-ভাবে টিকিয়া থাকিতে পারে তাহার স্বতন্ত্র আলোচনা করিয়াছি "মরণ ভোল" নামে প্রবন্ধে। এখানে সে-কথা না তুলিয়া কেবল অল্পে-অল্পে বুঝাইব যে কি ভাবে জীবন-লোলুপ মানুষেরা গোড়ায় অমর আত্মা বা শরীরের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম শরীর কল্পনা করিয়াছিল।

আদি যুগের মানুষেরা বুঝিতে পারিত না—কেন-যে আলোকে তাহাদের শরীরের ছায়া পড়ে; অতি অল্পপরিমাণে গাছ পাথরের ছায়ার কথা মনে পড়িত। এই ছায়া যে, শরীরে বদ্ধ একটা খাঁটি বস্তু, এই বিশ্বাসের ছায়া এখনও আছে বলিয়া অনেকে মনে করে—গুরুজনের ও হেয় ব্যক্তির ছায়া মাড়াইতে নাই। ছায়াকে স্বাধীন বস্তু ভাবিবার ফলে প্রাচীনকালের রূপকের কল্পনায় এদেশে ছায়াকে সূর্য্যের প্রিয়া বা সহচরী বলা হইয়াছিল। জলে যখন অনুন্নতেরা এ-উহার প্রতিবিম্ব দেখিত, তখন সেটাকে যে, শরীরে স্থায়ী এমন একটা সূক্ষ্ম বস্তু মনে করিত—যাহা জলে ভেজে না ও ডোবে না তাহা উপনিষদের জ্ঞানী লেখকদের উক্তির দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাই। উপনিষদে দেখিতে পাই—ঋষিরা আত্মা পদার্থটিকে দেখাইবার ও বুঝাইবার জন্য শিষ্যদিগকে জলে দেখাইয়া দিতেছেন তাহাদের প্রতিবিম্ব; আবার এ-উহার চোখের তারায়, মানুষের আকারের যে খুদে ছবি দেখিতে পায় তাহাকেও ঋষিরা আত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া বুঝাইতেছেন। চোখে আছে আলোক ও সূর্য্যেও আছে আলোক; এই দৃষ্টান্তে সূর্য্যকে যেখানে চোখের দেবতা বলা হইয়াছে সেখানে চোখের উপমায় স্থির করা হইয়াছে যে, সূর্য্যের মধ্যে ঐ চোখে-দৃষ্ট আত্মা-

পুরুষ আছেন আর সূর্য্য যদি উজ্জ্বল আবরণ সরাইয়া নেন্ তবে সেই আত্মাপুরুষকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সূর্য্যের কাছে আত্মা দেখাইবার প্রার্থনায় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—তোমার হিরণ্ময় কোষ (Photo-sphere) অপাবৃণু সরাইয়া নও, আমি আত্মনকে দেখিব।

আত্মা বোঝার পালায় শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ছিল স্বপ্নের। আদি যুগের মানুষের গুহার দরজায় আছে পাথর চাপা আর সেই গুহায় সে রাত্রে ঘুমাইতেছে। সে স্বপ্নে দেখিল যে সে অন্যদের সঙ্গে মিলিয়া বনে-পাহাড়ে ছুটিতেছে ও পশু শিকার করিতেছে ও আরও কত কিছু করিতেছে। ভোরে জাগিয়া বিস্ময়ে ভাবিল যে কেমন করিয়া গুহার দুয়ারের পাথর না ঠেলিয়া বাহিরে গিয়া স্বপ্নে-দেখার কাজগুলি করিল। উহারা ধীরে-ধীরে ভাবিয়া নিয়াছিল যে তাহাদের যে প্রতিবিম্ব জলে ভেজে না ও ডোবে না, যে ছায়া আগুনে পোড়ে না ও কাঁটা-বন প্রভৃতির ভিতর দিয়া দিনের বেলায় হাঁটিয়া চলে সেই সূক্ষ্ম পুরুষই শরীর ছাড়িয়া রাত্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। মনে এই রকমের ভাব জন্মিবার পর যখন কোন ব্যক্তি জ্ঞান হারাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিল ও নানা তোয়াজে তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়াছিল তখন ভাবিয়াছিল যে, শরীরের সেই আসল বস্তু পালাইয়াছিল বলিয়া সে হইয়াছিল অজ্ঞান আর ফিরিয়া আসিয়াছিল বলিয়া পাইল চেতনা।

এইভাবে মানুষের ভিতরকার আর একটা মানুষের অর্থাৎ খাঁটি নিজের বা জড়ভাব-বিশিষ্ট 'আত্মায়' বিশ্বাস জন্মিবার পর মৃত্যু সম্বন্ধে হইয়াছিল নূতন ধারণা। মৃত ব্যক্তি মূর্চ্ছিতের মতই আছে ভাবিয়া প্রথমে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার উপায় হাতে নিয়াছিল, কিন্তু আত্মা যখন কিছুতেই ফিরিল না আর শরীর গেল পচিয়া, তখন মৃতের স্বেচ্ছা-

বিহারী আত্মা আকাশে-বাতাসে-জলে কোথাও চলিয়া গিয়াছিল মনে করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পর দৈবে যখন তাহাকে কেহ স্বপ্নে দেখিয়াছিল ও স্বপ্নে তাহার সহিত কথা কহিয়াছিল, তখন বিশ্বাস হইয়াছিল—সাধনা করিলে স্বপ্নে তাহাকে দেখা যায়। স্বেচ্ছাবিহারী আত্মা যখন নিশ্চয়ই আকাশের রাজ্যের, বাতাসের রাজ্যের ও নানা দেশের খবর রাখিত তখন তাহাকে ডাকিলে ঝড় ও জল-প্লাবন প্রভৃতি বিপদ এড়াইবার উপায় জানা যাইতে পারে, আর দূরের শত্রুদের গতিবিধি জানিয়া দেশরক্ষার উপায় হইতে পারে—মনে করিয়াছিল। স্বপ্নে সব সময়ে দেখা পাওয়া সহজ হয় নাই, তাই ধীরে ধীরে পরলোকের আত্মাকে নানা তোয়াজের মন্ত্রে ডাকিয়া জাগ্রতে কৃত্রিম স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া মৃতের আত্মাকে দেখিবার সাধনা হইয়াছিল। সকলের পক্ষে মৃতকে ডাকিয়া দেখা করিবার সাহস হয় নাই; তাই এজন্য একটি নির্দিষ্ট সাহসী সাধকদলের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই সাধকেরা পেটে অপবিত্র ময়লা জমিতে না দিয়া উপবাসে দুর্বল হইয়া, (ও পরে) নাকের ডগায় একাগ্র মনে দৃষ্টি রাখিয়া (অর্থাৎ যোগের কল গড়িয়া) নিজেদের মনে ভ্রান্তি ও স্বপ্ন রচিত ও সেই স্বপ্নে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের ফলে প্রেতাত্মার দেখা পাইয়া তাহার মুখে প্রয়োজনের কথা শুনিয়া নিত। এই যে বলিলাম—পেটে ময়লা না জমাইয়া পবিত্র হইবার চেষ্টা, অর্থাৎ ভূতের দেখা পাইবার চেষ্টা, তাহাও বিশেষ কারণে হইয়াছিল; পরে সে কথা বলিতেছি। গোড়ায় এই স্বপ্ন রচিয়া ভূত ধরার কাজে চালাকি ছিল না; তবে নিশ্চয়ই পরে অল্পসংখ্যক সাধকদল আপনাদের বিশেষত্ব বজায় রাখিবার জন্য বুজরুকি চালাইয়াছিল। যাহাই হউক মানুষেরা তাহাদের গুরু প্রয়োজনে

সাধকদলের বা পুরোহিতের সৃষ্টি করিয়া সমাজে প্রেত-পূজার বহর বাড়াইয়াছিল ও আপনাদের বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে একটি অল্পসংখ্যক সাধকদলকে সমাজের চরম উপকারী জানিয়া স্বেচ্ছায় পুরোহিতদলকে উচ্চতম স্থান দিয়াছিল। সমাজের লোকের ইচ্ছায় ও আদরে কেমন করিয়া পুরোহিতের দল পুরুষানুক্রমে আপনাদের পবিত্রতা বজায় রাখিয়া ভূতের ওঝা বা পুরোহিত হইয়াছিল অর্থাৎ দেবতাকে ডাকার বিশেষ ভার পাইয়াছিল, তাহা "জাতিভেদ" নামক প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি।

দেবপূজার পুরোহিত সম্বন্ধে এই বিশ্বাস এখনও যে জনসাধারণের হাড়ে-হাড়ে আছে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। অধিকার দাও সকলকে মন্দিরে ঢোকার ও ঠাকুর ছোঁয়ার, কিন্তু দেখিবে—সে কাজ করিতে বহুলোকের আতঙ্ক হইবে; আর যাহারা ঝোঁকের মাথায় মন্দিরের ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইবে তাহারা যদি ঐ কাজ করার পর ছোট-বড় কোন বিপদে পড়ে, তবে আঁৎকাইয়া ভাবিবে যে তাহাদের হঠকারিতায় পাপের ফলে বিপদ ঘটিয়াছে। এদেশের বাহিরে পলিনেসিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে পুরোহিতের দল ছাড়া আর কেহ কল্পিত কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের গায়ে আপনাদের ছায়াটুকুও ফেলিতে ডরায়। তাহাদের বিশ্বাস—ঠাকুর ছুঁইলে তাহাদের হাত পুড়িয়া যাইবে। এই সঙ্গে আর একটি কথা বলি। স্বপ্নেই যে খাঁটি আত্মার বা ঈশ্বরের খবর পাওয়া যায়, আর স্বপ্নের উপরকার সুষুপ্তিতে যে ব্রহ্মস্পর্শ অধিকতর হয়, এ বিশ্বাসের কথা এদেশের ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে অতি স্পষ্টভাবে উক্ত আছে। অর্থাৎ অনেক স্থানেই এই আজগুবি বিশ্বাসটি পাই যে, খাঁটি প্রদীপ্ত চেতনায় ঈশ্বরকে দেখা যায় না বা বোঝা যায় না; দেখা যায় বা বোঝা যায় অর্দ্ধলুপ্ত

এলোমেলো জড়তাময় চেতনায়। আদিকালের মানুষেরা সহজেই মনে করিত যে, ওপারের আত্মার সূক্ষ্ম শরীর তাহাদের স্থূলদেহের মত হইত না ও তাহাতে কুৎসিৎ ও দুর্গন্ধ নাড়ী-ভুঁড়ি থাকিত না ও মল-মূত্র জমিতে পারিত না। তাই ওপারের আত্মার আহ্বানের উদ্যোগে পেট পরিষ্কার রাখিত ও উপবাস করিয়া শরীরে মল-মূত্র জমিতে দিত না। প্রাচীন ব্রাহ্মণ সাহিত্যেও দেখি এই যুক্তি যে, বড় আত্মন্ যখন শরীর ও কুৎসিৎ নাড়ী-ভুড়ি প্রভৃতি বর্জিত, তখন যেসকল পাপ বা আধিব্যাধি শরীরের আশ্রয়ের সুবিধায় আমাদিগকে পরাভূত করে, সে পাপ-প্রভৃতি সূক্ষ্ম আত্মনে ঢুকিতে পারে না; তিনি হইলেন "অকায়, অব্রণ, অস্নাবির"—সেই অজুহাতে তিনি শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। পাপ প্রভৃতি যে একটা আলাদা বস্তু আর তাহা যে ঢুকিতে পারে না শ্রেষ্ঠ আত্মার মধ্যে বিশেষ কারণে—এরূপ কল্পনায় অনেক জড়ত্ব আছে। একজন মানুষের সঙ্গে অপরের যে ব্যবহার, তাহা হইতেই জন্মে আমাদের ভাল কাজের বা মন্দ কাজের জ্ঞান; যাহা হিতকর হয় তাহাকে বলি ভাল, আর অহিতকরকে বলি মন্দ। কাজেই যাহা মানুষের conduct বা আচরণের উপর নির্ভর করে ও যাহা আচরণের বিশেষ অবস্থার নাম, তাহাকে আলাদা একটা বাহিরের পদার্থ ভাবা একেবারেই বুদ্ধির জড়তা। এ ভাবনা খাঁটি থাকিলে সয়তানেরও জন্ম হয় না আর তুক্-তাক্ করিয়া পাপ ছাড়াইতে হয় না। মানুষ যদি একলা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত তবে তাহার conduct বা চরিত্র বলিয়া কিছু থাকিত না। এই কল্পনার অসারতা অতি অল্প কথায় বুঝাইতেছি।

তুক্-তাক্ করিয়া ও মন্ত্র-তন্ত্রের বলে দেবতা বশ করিবার ইতিহাস এই প্রবন্ধেই পরে বলিতেছি; এখানে কেবল এইটুকুই বলি, আত্মা

প্রভৃতি যখন ছিল খাঁটি ভূত তখন তাহাকে বা তাহাদিগকে চিরস্থায়ী করিয়া পৃথিবীতে ধরিয়া রাখিবার জন্য যখন তুক্‌-তাকের নিয়মে নানা মন্দির গড়া হইয়াছিল তখন যে-বস্তুতে দেবতা প্রাণের ভর দিবেন মনে করিত, সেই বস্তুতে মন্ত্রের জোরে দেবতার তাজা আবির্ভাব বাঁধিয়া রাখিত ও তাহার ফলে দেবতাদের সুনজর মন্দিরের বেড়ার বাহিরে চলিয়া যাইতে পারিত না। মন্দির ও মন্দিরের দেবতারা হইতেন জাগ্রত, আর দেবতাকে তুষ্ট রাখিবার ভার পাইতেন দেবপ্রিয় ওঝারা। এই পদ্ধতিটুকু খুলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে।

একজন মানুষ মরিলে যেখানে তাহাকে পোঁতা হইত, সেইখানে গোড়ায় একটা ঢিবি তোলা হইত। শরীরের সঙ্গে সম্পর্কের দরুণ সেই স্থানটি প্রেতাত্মার আবির্ভাবের উপযোগী বিবেচিত হইত। যাহাদের সমাধি হইত না, তাহাদের আত্মা বা ভূত কোনও একটা গাছে বা পাহাড়ে একটুখানি আশ্রয় বাঁধিত, আর ওঝারা ছাড়া অন্য কেহ সে সকল গাছ-পাহাড়ের কাছে যাইতে ডরাইত ও এখনও ডরাইয়া থাকে। যখন মানুষের ধন-দৌলত বাড়িল, তখন পাকা মন্দিরে নানা তুক্‌-তাকের মন্ত্র পড়িয়া ওঝা বা পুরোহিতেরা কোনও একটা প্রতিকৃতি বসাইয়া তাহার উপর আদি পুরুষের ভূতের ও পরবর্তী সময়ে অনেক দেবতাদের নজর ও আবির্ভাব বাঁধিয়া রাখিত। এই কারণে মন্দিরগুলি হইত জাগ্রত তীর্থ। যেখানে জাগ্রত তীর্থ গড়া হইত না বা হয় না, আর অস্থায়ীভাবে দেবতাদিগকে কোন প্রতিকৃতির উপর ভর দেওয়াইতে হয়, সেখানে প্রথমে করিতে হয় প্রতিকৃতিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, আর পরে 'গৃহং গচ্ছ' বলিয়া বিদায় দিতে হয়। মন্দিরের চূড়া যতটা আকাশের দিকে উঠিতে পারিত, ততই দেবতা টানিয়া আনিবার সুবিধা বেশি হইত।

অশরীরী আত্মাকে বা কল্পিত ভূতগুলিকে তুষ্ট করিয়া বশে আনিয়া বিপদ এড়াইবার জন্যই এত উদ্যোগ বা ধর্মের অনুষ্ঠানের সৃষ্টি ; তাহার পর যখন লোকে পৃথিবী-সৃষ্টির কল্পিত ইতিহাস ও পুরাণ রচিয়াছিল, তখন আকাশে, বাতাসে, জলে, চন্দ্রে, সূর্য্যে বহু দেব-দেবীর কল্পনা করিয়াছিল। এই পদ্ধতিতেই প্রায়-ভূতের মত প্রকৃতিবিশিষ্ট দেবতারা ভূতের আসন অধিকার করিয়া পূজা পাইয়াছিলেন। দেবতাদের উৎপত্তির ও প্রভাবের ইতিহাস অল্পপরিমাণে আলাদা-আলাদা লিখিয়াছি ; সে ইতিহাস পড়িলে ভূত ও দেবতাদের মধ্যে যে সমতা আছে তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে। সেই ইতিহাসের উল্লেখ না করিয়াও কিন্তু বলা চলে যে, ভূতই হোন্ বা ঠাকুর-দেবতাই হোন্, সকলকেই এইজন্য বেশির ভাগ স্তুতি করিয়া তুষ্ট করিতে হয়, যাহাতে তাঁহারা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের মত স্তবে ও উপহারে তৃপ্ত হইয়া মানুষের অনিষ্টসাধন করিবেন না ও যাহা প্রার্থনীয় তাহা স্তবে বশীভূত হইয়া দিবেন। কাজেই এই পূজা যে হয় কল্পিত জুজুর ভয়ে, তাহা সুস্পষ্ট।

জুজুর ভয় ছাড়

২

জুজুর জন্মের আর একটা দিক আছে। যাহা কিছু ঘটে তাহার একটা কিছু কারণ আছে,—সে কারণ জানাই হোক আর না জানাই হোক্। এই যে আছে আমাদের বিবেচনা, উহা আদিকালের মানুষেরও ছিল; তবে আদিমকালের মানুষেরা তাহাদের সেকালের বুদ্ধিতে অনেক ঘটনার কারণ সকল-সময়ে আমাদের মত পদ্ধতিতে ঠাওরাইত না। শরীরে দেখা দিল রোগ; সে কোথা হইতে আসিল? একালের বিজ্ঞানেও এ-সমস্যার পূরণ হয় নাই। মানুষে যখন ভূত-প্রেত মানিয়াছিল তখন প্রতি রোগে এক-একটা আলাদা বেসিলাসের মত এক-একটা ভূতকে এক-একটি রোগের কারণ মনে করিত। এই বিশ্বাস কোল্ প্রভৃতি অনেক অনুন্নত জাতির মধ্যে আছে। খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম যাঁহার নামে সেই যীশু একজন লোকের শরীরের রোগের ভূত তাঁহার মহিমায় তাড়াইয়া ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন একপাল শূয়ারের শরীরে; মানুষটির রোগ সারিল আর শূয়ারেরা ছট্‌ফট্ করিয়া মরিল—এই কথা নূতন বাইবেলে পাই। আত্মায় বিশ্বাস ও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস যখন জন্মে নাই বা ভাল করিয়া জন্মে নাই, তখন রোগকে শরীর হইতে আলাদা একটা বস্তু বলিয়াই আমাদের আদিমকালের পূর্বপুরুষদের ধারণা ছিল, আর এ ধারণা এখনও বহুপরিমাণে আমাদের অনেকের মধ্যে আছে। ঝাড়-ফুঁক করিয়া রোগের ভূত বা রোগ তাড়াইবার বিশ্বাস ছাড়াও দেখিতে পাওয়া যায়—মানুষে ভাবে যে কোন-কোন

ঔষধ শরীরের একটা জ্বরকে সম্পূর্ণ পিষিয়া মারিতে পারে নাই; জ্বর পদার্থটি শরীরের মধ্যে কোন এক কোনায় লুকাইয়া আছে বা 'জাপ্য' হইয়া আছে। এ বিশ্বাসের অর্থ ঠিক ইহা নয় যে, শরীরের বিকৃতি দূর হইলেও তাহার দুর্বলতার দরুণ এখনও শরীর রোগপ্রবণ আছে।

রোগগুলিকে যেমন ভাবিত আলাদা-আলাদা বস্তু সেইরূপ মানুষের দোষ-গুণকেও ভাবিত আলাদা-আলাদা বস্তু। একজন লোকের গুণ যে তাহার পুত্রের বা শিষ্যের ভিতর ঢোকে, এই বিশ্বাসটাকে বাঁচাইবার জন্য কেহ-কেহ বিজ্ঞানের Heredity-বাদ ও সৎসঙ্গের প্রভাবের দোহাই দিয়া থাকেন। Heredity-বাদের নামে যে সকল ভুল ধারণা আছে তাহা অন্য বড় প্রবন্ধে লিখিয়াছি; এখানে কেবল দেখাইব প্রাচীনের এ বিশ্বাসের ধাত্ আলাদা। গল্পে আছে—রাজার সকল গুণ শরীরে পুরিয়া জন্ম হইল রাজপুত্রের আর জন্মমাত্রে সৎমা তাহাকে ফেলিয়া দিল বনে-বাদাড়ে। লোকের গুণ যে পরের সঙ্গে ব্যবহারেই জন্মে একথা তখন কাহারও মনে ঢোকে নাই। তাই গল্পে আছে— রাজ-গুণের গন্ধ পাইয়া সিংহী আসিয়া তাহাকে দুধ দিল আর সাপেরা মাথার উপর ফণা ছড়াইয়া রৌদ্র বারণ করিল; তাহার পর আবার বুনো ছেলেদের সঙ্গে খেলিবার সময় সে রাষ্ট্রনীতির বুদ্ধির পরিচয় দিল। আর শেষ কালে রাজার পাট-হাতী তাহাকে খুঁজিয়া পিঠে করিয়া নিয়া রাজতক্তে বসাইল। মানুষের দোষ-গুণ যে কেবল তাহার ছোঁয়ার ফলে পাওয়া যায়, এ বিশ্বাসও ছিল। এ বিশ্বাস গোড়ায় জন্মিয়াছিল সত্যকার অভিজ্ঞতার উপমায়। সৎসঙ্গে ভাল কথা শুনিয়া উপকার হয়; আর একটা বিষাক্ত পাতার স্পর্শে গায়ে চুলকানি বা আর কিছু হয়। এই ধরণের উপমায় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল কিন্তু নূতন রকমের। সেই রকমের বিশ্বাসের ফলে গল্প পাই—কিছুমাত্র লেখাপড়া

না করিয়া কেবল গুরুকে ছুঁইয়া পায়ের ধুলা নিয়া ভক্তিভরে কিছু না খাইয়া গুরুর গরু চরাইয়া শিষ্য হঠাৎ অন্ধ হইয়া খানায় পড়িয়া ষড়ঙ্গ সমেত সকল বেদ শিখিয়া ফেলিলেন, বিনা কিছু পড়ায় ও দৈব প্রভাবে।

কবচ-মাদুলী প্রভৃতি ধারণ করিলে সুস্থ থাকা যায়, কারণ লোহা প্রভৃতি ধাতু বা অন্য পদার্থ শরীরে লাগিয়া থাকিলে শরীরের মধ্যে তাহাদের গুণ প্রবেশ করিতে পারে, এই বিশ্বাস ছিল। পাহাড়কে দেখিতে অমর ও দৃঢ়; তাই ওঝার বাছাই করা একখানি পাথরের টুকরা কবচ করিয়া পরিলে নীরোগ শরীরে শত্রুর আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার বিশ্বাস ছিল ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহার সমর্থনে এখনও অনেকের তর্ক এই—দ্রব্যগুণ যে আছেই-আছে, তাহাত সকলেই মানে।

মানুষের দোষ-গুণ প্রভৃতি যে এক-একটা স্বাধীন আলাদা-আলাদা বস্তু, এ বিশ্বাস অনেক তুক্‌তাক্ করিবার কাজে সুস্পষ্ট দেখা যায়। মানুষের গায়ের সঙ্গে লাগিয়া আছে যে মাথার চুল বা তাহার পরণের কাপড়, তাহার মধ্যেও মানুষের প্রাণের অণু লট্‌কাইয়া থাকে মনে করিয়া যাদুকরেরা চুলের ডগা কাটিয়া নিয়া বা কাপড়ের কণা কাটিয়া তাহাতে মারণ-উচাটন-বশীকরণের মন্ত্র ফুঁকিয়া দেয়; যাদুকরের বিশ্বাস—তাহাতেই সেই কাপড়ের বা চুলের মালিকেরা অভিভূত হইবে। এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে।

স্বপ্নে দ্বিতীয় আমিতে বিশ্বাস জন্মিবার আগেও মানুষেরা মেঘে, বাতাসে, জলে ও গাছ প্রভৃতি অন্য পদার্থে একটা ইচ্ছাশক্তি নিজেদের মনের উপমায় কল্পনা করিত। প্রাচীনের নানা গল্পে ইহার পরিচয় থাকিলেও মেঘ সম্বন্ধে একটা ধারণার দৃষ্টান্ত দিব।

আকাশে মেঘ দেখা দেয়, মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ চম্‌কায় আর অনেক

সময়ে মেঘ উঠিলেই গর্জন শোনা যায়; এসবগুলিই যে এক মেঘ জন্মিবার ফলে হয় তাহা মনে করিত না। মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, ইহা বুঝিত; কিন্তু কি কারণে মেঘ হইত, জানিত না। যখন হইত বৃষ্টির বিশেষ দরকার, তখন কি করিয়া মেঘ হয় ও জল পাওয়া যায়, তাহার আকাঙ্ক্ষায় লোক উদ্বিগ্ন হইত। তখন কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ ধরিয়া বৃষ্টি নামাইবার যে চেষ্টা হইত তাহা বলিতেছি। এরূপ চেষ্টার দৃষ্টান্ত এখনও পাওয়া যায়; যাহা লিখিতেছি তাহা কল্পিত কথা নয়। আদিমকালের মানুষেরা ভাবিত—অদৃশ্যে মেঘ কোথাও হয় ত লুকাইয়া আছে, তাহাকে ধোঁয়ার মত টুকরা মেঘ ও বিদ্যুতের চমকানি দেখাইলে ও গুড়্ গুড়্ শব্দ শুনাইলে সে আসিবে; কারণ মেঘের উদয় ঐ সকল কারণের উপর নির্ভর করে মনে করিত। এই বুদ্ধিতে সে একটি মুক্ত জায়গায় জ্বালাইত আগুন যাহার ধোঁয়ার মধ্য দিয়া আগুনের ফুল্‌কি বিদ্যুতের মত চম্‌কাইতে পারিত, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের গা হইতে অনেক নুড়ি গড়াইয়া দিয়া আর না হয় ঢাকের মত কিছু পিটিয়া গর্জনের অভিনয় করিত। যজ্ঞ সৃষ্টির এই আদিম অনুষ্ঠান যখন হইত, তখন যদি দৈবে বৃষ্টি হইত তবে প্রক্রিয়াটিতে বিশ্বাস দৃঢ় হইত। একবার যদি বিশ্বাস জন্মিয়া যায়, তবে বহু সময়েও প্রক্রিয়াটি বিফল হইলে বিশ্বাস টলিত না; মনে করিত—ঠিক যেমন করিয়া যাহা করা উচিত ছিল তাহা করা হয় নাই বলিয়াই ফল হইল না। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে অন্য আর এক রকমের মনের ভাব যোড়া পড়িয়াছিল যাহার জন্য ঐ প্রক্রিয়ার সঙ্গে মন্ত্র পড়াও প্রচলিত হইয়াছিল; সেই মনের ভাবের কথা বলিতেছি।

যাহা যাহা দেখিলে বা ঘটিলে বৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া আসে তাহাত ঘটান গেল; তবুও কি জানি বৃষ্টি যদি ইচ্ছা করিয়া না আসে তবে

তাহাকে তোয়াজ করা চাই। ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যদি ক্রুদ্ধ হয় অথবা অন্য কারণে তাহার মন মানাইতে হয়, তবে হাত জুড়িয়া কাকুতি-মিনতির সুরে এমন কথা কহিতে হয় যাহাতে মন গলে। কথায় যে এ গুণ আছে, কথার জোরেই যে মানুষকে বশ করিতে হয়, ইহা ত সকল আদিম লোকেরই জানা ছিল। কাতর উক্তিতে সাধিবার পর যখন সত্যই মেঘ দেখা দিত তখন অনুরোধ সফল হইল ভাবিত : তাহার পর আবার যখন অনুরোধ সফল হইত না, তখন ভাবিয়া নিত—যে উক্তিতে সফলতা পাওয়া গিয়াছিল ঠিক্ সেই উক্তিটি কি। মনে কর সেই উক্তিটির শেষ পদে ছিল—সচশ্বা নঃ স্বস্তয়ে। কাজেই সফলতার জন্য সেই পদটির উচ্চারণ করিতই করিত। এই রকমে হইল মন্ত্র নামে পদার্থটির সৃষ্টি। এই জন্যই প্রাচীন কালের এক সময়ের গড়া মন্ত্র হুবহু প্রাচীন ভাষায় প্রাচীন উচ্চারণে পড়ার নিয়ম হইয়াছে। এইরূপে হইয়াছে নানা দিক দিয়া বাঁধা শাস্ত্রের সৃষ্টি ও অবোধ্য প্রাচীন ভাষার মন্ত্র রক্ষা করিবার নিয়ম। এসকল অনুষ্ঠানে যে দূর সম্পর্কেও সেই অনাদি ঈশ্বরের কোনও ভাবনা নাই, তাহা সুস্পষ্ট। রৌদ্র আনাইবার, বৃষ্টি নামাইবার বা ঝড় থামাইবার ক্রিয়ায় অথবা ভূতের দেওয়া রোগ তাড়াইবার প্রক্রিয়ায় ভক্তিভরে ও কাতরভাবে চুল ছেঁড়া ছিল, মাথা খোঁড়া ছিল, রক্ত ঢালা ছিল ও আরও কত কিছু ছিল। সেই সকল কাজে গভীর ভক্তি, প্রাণের নিষ্ঠা ও আত্মবলি প্রভৃতি আছে, কিন্তু সে সকল ভক্তির অভিব্যক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির কোনও সংস্রব নাই। ঐগুলি একেবারে খাঁটি রকমের ডাক্তার-ডাকা প্রভৃতি কাজ মাত্র,—ঈশ্বরের অনুভূতিতে মগ্ন হওয়া নয়।

এই কথাটির প্রসঙ্গে ও আংশিক প্রমাণের জন্য দ্রবিড় জাতির মধ্যে প্রচলিত একটি পূজা-পদ্ধতির দৃষ্টান্ত দিব। দৃষ্টান্তটি হইবে নানাকারণে

উপযোগী। একেত মাদ্রাজ অঞ্চলে এই প্রথা এখনও তাজা আছে, অন্যদিকে আবার আমাদের বঙ্গদেশে আর্য্যেরা আবাস রচিবার পূর্বে এই দ্রবিড় জাতিয়েরা সাগরের উপকূল ধরিয়া মেদিনীপুর জেলার কাঁথী ও তমলুক হইতে চাট্‌গা পর্য্যন্ত বহুসংখ্যায় বসবাস করিত আর তাহাদের বংশধরেরা এখন দ্রবিড়ী উৎপত্তি স্বীকার না করিলেও আমাদের সমাজ-শরীর জুড়িয়া আছে।

মাদ্রাজ অঞ্চলে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরগুলি বাঁধা নিয়মে পূজিত হন্; কিন্তু দেশে দৈব-বিপদ বা মহামারী প্রভৃতি উপস্থিত হইলে অতি মুক্তস্থানে অনেকগুলি গ্রামের একটি কেন্দ্রে অনেক আলাই-বালাইএর কর্ত্তা দেবতার পূজা করিবার নিয়ম আছে। বিপদগুলির লক্ষণ ধরিয়া ধরিয়া এক-এক দেবতার এক-এক রকমে রূপ কল্পিত হইয়াছে ও সেই রূপের ঠাকুর আনিয়া শুভক্ষণে বসাইয়া তাহাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়। বিশ্বাস আছে যে এই দেবতাদিগকে পূজায় বা তোয়াজে তুষ্ট করিলে দেবতারা গ্রামগুলির সকল আলাই-বালাই আপনাদের শরীরের মধ্যে গুটাইয়া নেন্। কাজেই এই বিশ্বাসের ফলে পূজা শেষ হইয়া গেলে ঠাকুরগুলিকে মায় আলাই-বালাই টানিয়া নিয়া গ্রামের বাহিরে কোন জঙ্গলে বা খানা ডোবায় ফেলিয়া দিতে হয়। ঠাকুরগুলিকে বহিয়া নেওয়ার সময় চেষ্টা করা হয় যাহাতে ঠাকুরেরা বুঝিতে না পারেন যে তাঁহাদিগকে ফেলিয়া দেওয়ার বা বিসর্জন দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে; ঠাকুরদিগকে বহিয়া নেওয়ার সময়ে ঠাকুরদের মুখ রাখা হয় গ্রামগুলির দিকে, ও এইরূপে পিছু হটাইয়া চালাইবার সময় ঢাক-ঢোল বাজাইয়া ঠাকুরদিগকে ঠকাইয়া বোঝাইতে হয় যে তাঁহাদের পূজাই চলিতেছে। ঠিক এই প্রথা কি ভাবে এখনও বঙ্গদেশে আছে তাহা আমরা সকলেই জানি।

ঠাকুরকে ঠকাইবার কথাটায় পাঠকদের বিস্ময় ধরিতে পারে; কিন্তু তুক্‌-তাক্‌ করিয়া দেবতাকে বশ করিবার পূজার বিধিতে দেবতা ও মানুষের সঙ্গে যেরূপ সম্বন্ধ কল্পিত হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। দৃষ্টান্ত দিতেছি। একজন ব্যাধ একটি জন্তু মারিয়া ঘরে ফিরিবার পথে শিব-চতুর্দশীর রাত্রে শুইয়াছিল একটি বেলগাছের উপরে, সেই রাত্রির ধর্মে শিবঠাকুর ছিলেন তাঁহার প্রিয় বেলগাছের তলায়। গাছের ডালে নিদ্রিত ব্যাধের নড়ন-চড়নে বেলের পাতা ঠাকুরের মাথায় ঝরিয়া পড়িল; শুভদিনে শুভরাত্রির শুভক্ষণে এই "পূজা" পাইয়া ঠাকুর নিদ্রিত ব্যাধকে বর দিয়া ধন্য করিলেন, আর ব্যাধের তীর-ধনুক আর মৃত জন্তুটি সোনা হইয়া গেল। এখানে দেখিতেছি—শুভক্ষণে ঠাকুরের মাথায় বেলের পাতা পড়াই হইল ধর্মের অনুষ্ঠান,—জাগ্রত প্রাণে ভক্তিভরে পূজা না করায় কিছু বাধিলনা অর্থাৎ ঠাকুর প্রাণ দেখিলেন না তিনি কেবল সন্তুষ্ট হইলেন বেলের পাতায়। যাহাকে বলে সাধু ভাবের সম্পর্ক বা moral relation অথবা যেকাজে আছে সন্নীতির প্রতিষ্ঠা, তাহার সঙ্গে তুকৃতাকের পূজার সম্পর্ক নাই। কোনও দুষ্ট ব্যক্তি যদি পূজা করার বাঁধা নিয়মে দেবতাকে তুষ্ট করিতে পারে তবে সেই দুষ্ট ব্যক্তি তাহার অভীষ্ট চুরি-ডাকাতির কাজেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। চোর-ডাকাতের কালীপূজা ও গণেশপূজা এদেশে অতি প্রসিদ্ধ।

অপরের অনিষ্ট করার ইচ্ছায় কোন পাপিষ্ঠ যদি মারণ-উচাটন করিতে চায় তবে সে বিধিমতে ধূমাবতীকে পূজা করিলেই সিদ্ধি পাইতে পারে। এই ধূমাবতী বিধবা হইলেও নাকি শিবপত্নী, আর তিনি 'ধূম্রবর্ণা ধূম্রপান-পরায়ণা' ও 'মদিরাপান-বিহ্বলা'। তাঁহার চরিত্রের সম্বন্ধে তন্ত্রের বইয়ে আছে, তিনি 'দুরারাধ্যা দুরাচার-দুর্জনপ্রীতিদায়িনী'।

ঠাকুর পূজার ইতিহাসে এমন অনেক বর্ণনা আছে যাহাতে বলা হইয়াছে যে এক-একটি দেবতা নিজের ক্ষমতার বলে তাঁহার পূজা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাঁহার নৈতিক সম্বন্ধের কোনও কথা নাই। দেবতা কোনও বণিক সাধুকে তাঁহার উপাসক হইতে বলিলেন; সে বণিক তাহা মানিল না, আর সেই সাধুর বোঝাই নৌকা জলে ডুবিল। সাধু তখন কারে পড়িয়া দেবতার পূজা করিল; অর্থাৎ স্তুতির মন্ত্রে বলিল যে সেই দেবতাই ক্ষমতায় সকলের শ্রেষ্ঠ। স্তুতির ফলে সাধুর নৌকা ভাসিয়া উঠিল। তুক্-তাক পূজার এই হইল সাধারণ পদ্ধতি। মন্ত্রের জোরে দেবতাকে দিয়া যাহা খুসি করান যাইতে পারে। এই ধরণের জুজু-পূজার বিশ্বাস হাড়ে-হাড়ে আছে বলিয়া খ্রিষ্টিয়ানেরা যুদ্ধে তাহাদের খ্রিষ্টিয়ান শত্রু মারিবার জন্য গির্জায় গির্জায় উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এসকল পূজায় আছে মন্ত্রের বল, আর উহার সহিত সন্নীতির সম্পর্ক নাই।

অনেক স্থলে দেখা যায়—দেবতার প্রতি প্রেমের ভাব না জাগাইয়া ভয় ও বিস্ময় জাগাইবার চেষ্টাই প্রধান চেষ্টা। ওড়িষা ও গঞ্জামের কন্দ জাতির লোকেরা যখন অন্য জাতির লোক ধরিয়া নিয়া 'মেরিয়া' কাঠের কাছে বলি দিত তখন সিঁদুর ও কালি-মাখা কাঠের সম্মুখে আগুন জ্বালাইয়া এমন ধোঁয়া করিত যাহাতে সেই ধোঁয়ার মধ্য দিয়া মেরিয়া কাঠ দেখিলে মনে জন্মিত ভয় ও বিস্ময়। সেই ভয় ও বিস্ময় গাঢ় করিবার জন্য বাজনদারেরা বাজাইত কর্কশ শব্দের ঢাক্-ঢোল প্রভৃতি। দর্শকেরা তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে চেঁচাইত ও নাচিত আর সেই কোলাহলের মধ্যে মানুষ বলি দেওয়া হইত। আমাদের সভ্য সমাজেও ঐ পদ্ধতিতেই পাঁঠা ও মহিষ বলি দেওয়া হয়। একালের শিক্ষিতদের কাহারও-কাহারও মুখে শুনিয়াছি—আরতির সময়কার ধোঁয়ার

আড়ালে দেবতাদের মুখ দেখিলে অপূর্ব বিস্ময়ের ভাব জাগিয়া ওঠে আর ঐ ভাবকে নাকি তাঁহারা ধর্মভাব জাগাইবার সহায় মনে করেন।

এই অবস্থাগুলির দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই দেখা যায় যে এই সকল পূজা-আর্চায় আছে কেবল ক্ষমতাশালী উৎপীড়ক দেবতাদিগকে স্তোত্রে ও পূজায় ঠাণ্ডা করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা ও বিত্তলাভের চেষ্টা। ইহাতে অভেদে মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম বাড়াইবার প্রয়াস নাই ও অসীম অনন্তের দিকে উন্মুখ হইয়া মানুষকে প্রেমিক কর্মী করিবার যত্ন নাই। দাঁতে কুটা করিয়া নম্রতা স্বীকার করিয়া রাজার কাছে বা কোন হাকিমের কাছে দোষের জন্য ক্ষমা চাহিলে অথবা সাংসারিক অন্য সুবিধার প্রার্থনা করিলে মনের যেরূপ ব্যগ্রতার প্রয়োজন সেই শ্রেণীর মনের ভাবকে ভক্তি বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে ভক্তি প্রেমের আনন্দজনিত কোন ভাব নয়। নিজের আত্মার অতীত বস্তুকে তোয়াজ করা যদি আধ্যাত্মিকতা হয় তবে কোন কথা নাই। নইলে ধর্মের এরূপ আচরণকে অতি মোটা ও মেটে স্বার্থ-সাধনের প্রয়াস বলিতে হয়।

জুজুর ভয় ছাড়

৩

ধর্মের-বিশ্বাসে আর একরকমের জুজুর সৃষ্টি হইয়াছে যাহা নিজের কল্পনায় ভূত ও অপদেবতা সৃষ্ট না করিয়াই হইয়াছে। যীশুর প্রচারিত ধর্মে যেমন দেখিতে পাই যে অতি উচ্চ অঙ্গের সন্নীতি-সম্মত বাণীর তলায় আদিম কালের ভূত, সয়তান প্রভৃতি আছে ও মানুষকে অনন্ত নরকে পুড়িবার কথা আছে, সেইরূপ বেদের ধর্মের মধ্যেও আদিম-কালের সংস্কারের অনেক ছায়া আছে। দেবতাদের বশ করিবার মন্ত্র দেবতাদের কাছেই লুকাইয়া ছিল আর শুভক্ষণে মন্ত্রদ্রষ্টারা তাহা দেখিয়া বা ধরিয়া ফেলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, একথা বেদের মন্ত্রেই লেখা আছে। বেদের মন্ত্রগুলি যে বিভিন্ন বিপদের অবস্থায় মন্ত্র-গায়কেরা গাইয়া ফল পাইয়াছিলেন, আর ঠিক সেই মন্ত্রই যে এক-সময়ের প্রাচীন পদ্ধতিতে খাঁটি উচ্চারণে পড়িতে হইবে, ইহাও বৈদিক গ্রন্থে পাই। রোগ সারাইবার ও আপদ-বিপদ তাড়াইবার অনেক তুক্-তাক্ অথর্ব বেদে আছে।

তবে বেদের মন্ত্র যেভাবে উচ্চারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণ ভাবেই জীবনের অভাবের কথা দেবতাদিগকে জানান হইয়াছে। শত বৎসরের পরমায়ু দাও, রাজার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দাও, অনেক ধন-রত্ন দাও, প্রভৃতি প্রার্থনা উপাস্য দেবতাদের কাছে উচ্চারিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তির অধিষ্ঠাত্রী বহুদেবতার জন্য ভিন্ন-ভিন্ন বিধানে পূজার রীতি আছে ; তবে ঐ বেদের মধ্যেই দেখিতে পাই যে, সকল

দেবতার অধীশ্বর রূপে একটি দেবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যখন ঐ এক দেবতা স্বীকৃত হইয়াছে তখনও কিন্তু স্বীকৃত হইয়াছে যে পূর্ব-কালের বহু দেবতারা আলাদা আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াই চলিয়াছেন। উপনিষদের এক ঈশ্বরের পূজার দিনেও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতার অস্তিত্ব উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই; তাঁহাকে কেবল ঈশদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থে 'বর' যোগে ঈশ্বর নামে পাই, অথবা ঈশ্বরদের মধ্যে পরমেশ্বর ও দেবতাদের মধ্যে 'পরমদৈবত' নামে পাই।

খ্রিষ্টিয়ানদের ধর্মে খাঁটি ঈশ্বরের বিরোধী যে মহা-পরাক্রান্ত সয়তানকে পাই সে মরে নাই বা উড়িয়া যায় নাই। জৈনদের বইএ পড়ি অজৈনদের দেবতাগুলি সত্য কিন্তু তাহারা অপূজ্য অপদেবতা। ইহুদীরা যখন বাবিলন ও আসিরিয়ায় দেবতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল তখন বিরোধীদের দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাই,—কেবল তাহাদের অপূজ্যতার কথাই বলিয়াছে। দেবতারা অধিকাংশ স্থলেই মরে নাই ও জুজু হইয়া আছে। যদিও সেই-সেই স্থলে নূতন দেবতা আসন পাতিয়াছেন।

বেদে যে ভাবে দেবতাদের কাছে কাম্য সুখের জন্য প্রার্থনা আছে মোটামুটি পুরাণেও পাই তাহাই আর দেশের সাধারণ মানুষেরাও সেই ভাবে দেবতার কাছে বর চাহিয়া আসিতেছে। তবে কতকগুলি দার্শনিকদের মতবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে ও জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, আর সেই ভাবগুলি সহজ রকমের ধর্ম-বিশ্বাসকে অনেক পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। সংসারচক্রে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ঘুরিবার কথা, ঈশ্বর বা আদি ব্রহ্মকে প্রায় অচিন্ত্যনীয় ভাবিবার কথা ব্রহ্মের মধ্যে মানুষের আত্মার লীন হইবার কথা প্রভৃতি কয়েকখানি দর্শনের প্রভাবে ও উপনিষদ নামে গ্রন্থগুলির প্রভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল ও ধর্মকে

অনেক পরিমাণে নূতন আদর্শে খাড়া করা হইয়াছিল। এই প্রথায় কেমন করিয়া জন্মিয়াছিল নূতন রকমের জুজু, তাহার আলোচনার প্রয়োজন।

আমাদের শরীর যেভাবে যে-ধাতুতে গড়া অথবা যেভাবে অতীত-কালের জীব শরীর হইতে উদ্ভূত, তাহাতে যে দুঃখ অর্থাৎ অভাব বোধ না থাকিলে চেতনা না পাইয়া জড় হইতে হয় আর দুঃখ থাকাতেই যে আমাদের উন্নতি হয়, এ জ্ঞান বহু অতীতকালে স্পষ্ট হয় নাই। তাই নানা দেশে নানা কল্পনায় দুঃখের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হইয়াছে। এবিষয়ে এ দেশের প্রাচীন দার্শনিকদের বিচার শুনাইবার পূর্বে দুঃখের খ্রিষ্টিয়ানী ব্যাখ্যার পরিচয় দিব।

মানুষের দুঃখের খ্রিষ্টিয়ানী ব্যাখ্যা—বাইবেলের অংশ-বিশেষের রচয়িতারা বুঝিতে চেষ্টা করিলেন—ঈশ্বর যখন তাঁহার শুভ ইচ্ছায় মানুষ গড়িলেন তখন তাহাকে এত আধি-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট ভুগিতে হইল কেন? সয়তান যদি মানুষকে পাপ পথে নিতে যায়, কষ্ট দেয়, তবে ঈশ্বর সে সয়তানকে দাবাইয়া মানুষকে সুখে রাখেন না কেন? ইহার উত্তর হইল এই—প্রথম সৃষ্ট মানুষ-যোড়া ঈশ্বরের আদেশ না মানিয়া সয়তানী বুদ্ধি শিখিয়াছিল; তাই সকলের রাজা ঈশ্বর (মানুষ রাজারা যেমন প্রজাকে অবাধ্যতার জন্য দণ্ড দেয়) অভিশাপ দিলেন—মানুষকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করিতে হইবে, নারীরা সন্তান-লাভের জন্য গর্ভ ধারণের কষ্ট বহিবে ও সকল মানুষকেই পাপের শ্রেষ্ঠ দণ্ডে মরিতে হইবে। এই অভিশাপ পাইবার সময় আদিকালের মানুষ-যোড়া দেখিয়াও দেখে নাই—পশুরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহার সংগ্রহ ক'রে, গর্ভ ধারণ করে ও মরে; এ পশুরা ত জন্মিয়াছিল মানুষের আগে, আর তাহারা পাপ না করিয়া দণ্ড পাইল কেন? পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করিলেই যে যথার্থ আনন্দ হয় ও মনের উন্নতি হয় তাহা না

বুঝিয়াই যাহা যথার্থ বর তাহাকে লোকে প্রাচীনকালে অভিশাপ ভাবিয়াছিল। মরণ যে অভিশাপ নয়, তাহা আদিমকালে না বুঝিতে পারা অসম্ভব নয়। যীশু আসিয়া তাঁহার রক্ত দিলেন মানুষের পাপের নিষ্ক্রয়ের জন্য; তবুও ত দু'হাজার বছর ধরিয়া কোন খৃষ্টিয়ানই মরণ এড়াইতে পারিল না! ওপারে গিয়া মরণ এড়াইবার যে কথা আছে তাহা প্রত্যক্ষ না হইলেও লোকে মানিয়া নিতেছে—যীশুকে মানিলে যাইবে স্বর্গে আর না মানিলে যাইবে নরকে। এখানে ধর্ম চলিতেছে নরকের জুজুর ভয় দেখাইয়া ও মানুষকে অপ্রত্যক্ষ অপ্রমাণিত কথা মানাইয়া।

ভারতীয় দর্শনের কথা—ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্ট মানুষেরা দুঃখ পায় কেন ও মরে কেন? এই সমস্যা পূরণের জন্য এদেশে কতকগুলি মতবাদের কল্পনা করা হইয়াছিল। মতবাদগুলিকে কল্পিত বলিতেছি এই জন্য যে উহা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণিত করা যায়না, কেবল শাস্ত্রের কথা শুনিয়া মানিয়া চলিতে হয়। শাস্ত্রের বিচার হইল এই—মানুষের আত্মারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমাগত নানা জন্ম পাইতেছে আর এক-জন্মের সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফলে অন্য জন্মে সুখী বা দুঃখী হইতেছে। মানুষেরা যদি এই সুখে-দুঃখে আপনাদিগকে না জড়াইয়া ফেলে ও কেবল নির্গুণ ব্রহ্মকে ধ্যান করে তবে তাহার জন্ম বা 'ভব' আর হইবেনা ও সকল দুঃখ এড়াইয়া ব্রহ্ম হইয়া যাইবে।

এখন কথা এই—গোড়ায় মানুষেরা কেমন করিয়া স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র-ভাবে ভাল বা মন্দ কাজ করিয়া কর্ম-ফল রচিল। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ কথার সমালোচনা করিতে গেলে কেবল মাকড়সার মত বুদ্ধির জাল বুনিয়া জালে জালে কাটাকাটি করিতে হয়। সোজাসুজি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ধরিয়াই বুঝান যায় যে, জন্মান্তরবাদ একটা ভ্রান্ত কল্পনার

সৃষ্টি। 'মরণ-ভোল' প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে। এখানে কেবল অল্প দু-একটি কথা বলিব।

বাইবেলের আদমের উপন্যাসে দেখিয়াছি—চারিদিকের পরিচিত গাছ-পালা পশু-পক্ষীর অবস্থা না দেখিয়া মানুষের জীবনের কল্পিত কারণ খাড়া করা হইয়াছে। এদেশের পণ্ডিতদের বেলায়ও তাহাই ঘটিয়াছে। অনেক বীজওয়ালা একটা ফল কাটিলে দেখিতে পাওয়া যায়—ফলের মধ্যে নানা স্থানের স্থিতির জন্য একটা বীজ হইয়াছে সুপুষ্ট ও ভাল ও অন্য একটি বীজ তেমন হইতে পারে নাই। দেখা যাইবে, ভাল বীজটিতে গাছ ও ফল হইবে ভাল আর অন্য বীজটিতে তাহা হইবে না। এখানে ফলের বা গাছের পূর্ব জন্মের পাপের কথা ওঠে নাই আর উঠিলেও প্রত্যক্ষ ধরা যাইত—কি কারণে একটি গাছ হয় সুস্থ ও অপরটি দুঃস্থ। এখন তাকাই মানুষের দিকে। মায়ের ও বাপের শরীর হইতে সমান সংখ্যায় chromosome বা সন্তান-উৎপাদক সামগ্রি একসঙ্গে মিশিয়া যখন ভ্রূণ সৃষ্টি করে তখন কেহই বলিতে পারেনা যে বাপ ও মা সকল সময়ে একই রকম পুষ্টি—একই রকম মনের অবস্থা প্রভৃতিতে শরীরে chromosome উৎপাদন করে। এ অবস্থায় সন্তানেরা আলাদা আলাদা ও ভিন্ন গুণের শরীর ও মন পাইবেই পাইবে। এজন্য সংসারচক্র বা কর্মবাদের মিথ্যা কল্পনার প্রয়োজন নাই। তাহার পর দেখি যে, নৈতিক হিসাবে জন্মান্তরের যে দোহাই দেওয়া হয় তাহা টেকে কিনা ;—ঈশ্বর রাজা হইয়া দুষ্টদের দণ্ড দিতেছেন যে জন্মান্তর ঘটাইয়া তাহার কোনও অর্থ বা ফল আছে কিনা। এ সম্পর্কে প্রাচীনকালের একটা গল্প বলিতেছি। একজন সাধু মুনি অতিথি হইয়াছিলেন এক ভোগবিলাসী রাজার ; রাজা তাঁহাকে ভাল ভাল খাদ্য দিলেন না বলিয়া মুনি চটিয়া গিয়া রাজাকে বলিলেন যে, রাজা তাঁহার ব্যবহারে পর জন্মে

বিষ্ঠার কীট হইয়া বিষ্ঠা খাইতে বাধ্য হইবেন। দুষ্ট রাজা হাসিয়া বলিলেন "ঠাকুর, এখন আমার আছে মানুষের চেতনা ও মানুষের শরীর ও রুচি আর বিষ্ঠার কীট হইলে হইবে আমার কীটের শরীর, চেতনা ও রুচি; তাহাতে বিষ্ঠাই হইবে এ জীবনের সুখাদ্যের মত। ইহাতে আমার দণ্ডই বা হইল কি, দুঃখই বা হইল কিসের? মুনির মতের পরিবর্তন হইল কিনা জানিনা; তবে দণ্ড পাওয়ার হিসাবে ও পাপ বা কর্মক্ষয়ের হিসাবে পুনর্জন্মের এই মতবাদ একেবারেই অকেজো। এখানে আর একটি কথা বলি। একজন বড় সংস্কৃতওয়ালা পণ্ডিত কুষ্ঠ রোগীকে না ছুঁইবার কারণ দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্বজন্মের কর্ম দোষেই কুষ্ঠ রোগ জন্মে আর কাজেই Father Damion-এর মত কুঠ্ ঘাঁটার প্রয়োজন নাই। পণ্ডিতটি হয়ত মনে করেন যে ছোট রোগগুলি (যাহার নিদান পাওয়া যায়) পূর্বজন্মের পাপে নয় আর যে রোগের কারণ ধরিতে পারেন না তাহা হইল পূর্ব্বজন্মের ফলে। পণ্ডিতটির যখন সর্দি লাগে তখন হয়ত নস্য নিয়াই রোগটি এড়ান ও ঠাণ্ডা-লাগার কথাটি কারণরূপে বলেন। শরীরের নানা রকমের বিকৃতির ফলেই যে নানা রকমের রোগ ও মরণ, তাহা পণ্ডিতদের মাথায় ঢোকেনা।

তাহার পর পণ্ডিতেরা লাগিলেন দুঃখ বা অভাব-বোধ তাড়াইবার অসাধ্য সাধনায়; অভাব-বোধেই যে আমাদের উন্নতি হয় ও চেতনা তাজা থাকে আর উহার অভাবে যে হই নিষ্কর্মা জড়পদার্থ, সেদিকে দৃষ্টি পড়িল না। কামনা ষোল আনা পোরেনা; অনেক কাম্য পদার্থ পাই যাহা টিকিয়া থাকেনা। এই স্ত্রী-পুত্র আছে, এই নাই, ইত্যাদি ভাবিয়া ইঁহারা ঠিক করিলেন যে যাহা কিছু দেখি, পাই বা ভোগ করি সে অতি অনিত্য ছায়াবাজি; মুদ্‌লে আঁখি, সকল ফাঁকি রে। ইঁহারা

ভাবিলেন—আদি-অন্তহীন ঈশ্বর যখন নিত্য, তখন তাঁহার রচনায় এই অনিত্যের জন্ম হইল কেন? এই দুঃখের জন্ম হইল কেন? কাহা হতে জনমিল জগতের যাতনা? ইঁহারা সমস্যা পূরণ করিয়া ঠিক করিলেন—এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ মায়া বা ভোজের বাজি; আমরা ঈশ্বরের ছলনায় (চতুরতার ঠকামি বলিলেও চলে) মিথ্যা মোহে সমাজ গড়িয়া অতি মিথ্যা ধাঁধাকে আঁকড়াইয়া চলিয়াছি ও দুঃখ পাইতেছি। দুঃখের মূলে যে আছে কামনা বা চিত্ত-বৃত্তির বেগ; তাহাকে উড়াইতে পারিলেই সকল বিপদ ঝাড়ে-বংশে মরিতে পারে আর আমাদের আত্মা যদি আকাঙ্ক্ষার ও স্নেহ-মমতার সকল বাঁধন কাটিতে পারে ও তপস্যায় ব্রহ্মের দিকে নজর রাখিতে পারে তবে হইবে মুক্তি বা মোক্ষলাভ বা চিরকালের মত ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মে লীন হওয়া। বুদ্ধির এই অস্বাভাবিক পেঁচে বড় বড় জুজুর সৃষ্টি হইয়াছে।

অভাব-বোধ জন্মে অর্থাৎ খাঁই-খাঁই বাড়ে অথবা উন্নততর অবস্থার জন্য আই-ঢাই বাড়ে—অর্থাৎ দুঃখ বাড়ে শরীরের মৌলিক ধাতুর ধর্মে, অর্থাৎ শরীরের ভিত্তিস্বরূপ জৈবনিক নামে পদার্থের গতিতে। এই জৈবনিকের গতিতেই গাছ-পালা কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষী যাবজ্জীবন স্থিতির দিকে ঝুঁকিয়া আছে; আমাদের চিত্ত-বৃত্তি এই জৈবনিকের ঝোঁক। পণ্ডিতেরা ঠিকই ধরিয়াছেন যে, দুঃখ এড়াইতে হইলে চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ চাই—সকল রকমের চাওয়া বা খাঁই-খাঁই দূর করা চাই। চিত্ত বৃত্তির কিন্তু নিরোধ হয় না ঐ জৈবনিককে পিষিয়া না মারিলে অর্থাৎ আত্মহত্যা না করিলে। পণ্ডিতেরা কিন্তু গায়ের জোরের কল্পনায় বলিবেন—চিত্ত-বৃত্তির চাওয়া ছাড়াও সূক্ষ্ম জ্ঞানের একটা যাহা চাওয়া আছে তাহাই ধরিয়া তাঁহারা ব্রহ্ম পাইবেন বা ব্রহ্মে লীন হইবেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে আমরা জন্মিয়া মানুষের আশ্রয়

ভিন্ন বাড়িতে পারি না, পরের কথা না শিখিয়া ভাষা শিখিতে পারি না, ক্ষুধা ও প্রেমের তাড়নায় দশের সঙ্গে না মিলিয়া কোন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি না,—কোনও জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারি না, আর ছলনার মোহের স্নেহ-প্রেম প্রভৃতি না জন্মিলে ব্রহ্মের প্রতি প্রেম বা আকর্ষণ জন্মিতে পারে না। একালে আমরা মাতৃগর্ভ হইতে জাতমাত্র কাহাকেও পাই না, যে ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হইয়াই জ্ঞানে পুষ্ট সদাড়ি-গোঁফ শুক্রচার্য্যের মত বনে ছুটিয়া তপস্যায় বসিতে পারে। পণ্ডিতেরা চান সেই জ্ঞান ও আনন্দ যাহা জন্মে দুঃখের ঘরে, বেদনার ঘরে ও মানুষের সংসর্গে; কিন্তু সে পদার্থ চাহেন দুঃখ-বেদনা ও সংসর্গ এড়াইয়া। গুলির আড্ডায় গুলি না খাইয়াও চাট্‌খোর হওয়া যায়, কিন্তু এ অসম্ভব ফল কিছুতেই পাওয়া যায় না।

ঈশ্বরের ছলনা বা ঠকামি বুঝিয়া ফেলিয়া কেমন করিয়া সকল মায়া কাটাইয়া ব্রহ্ম ধরা যায় তাহার অনেক পদ্ধতি রচিত হইয়াছে। ভাবের গাছে যোড়া মানুষ-বলদ কিরূপে চোখের ঠুলি ফেলিয়া অভয় পদ দেখিবে, তাহার ব্যবস্থায় কল্পিত হইয়াছিল একরকমের যোগ বা চিত্ত-বৃত্তি নিরোধের পন্থা। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আসন পাতিয়া বসিয়া কেবল নাকের ডগায় দৃষ্টি রাখিয়া কেমন করিয়া স্নায়বিক বিকার ঘটান যায় ও হাত-পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরাইয়া স্বপ্ন বা সুষুপ্তি আনা যায়, তাহার কথা আদিমযুগের মানুষের পরলোকগত আত্মার আবির্ভাব করাইবার চেষ্টার কথায় বলিয়াছি। যোগে ঐ পন্থাটাকেই বাড়ান হইয়াছে।

ব্রহ্ম ছাড়া যদি মায়াময় প্রপঞ্চের কিছু ভাবনা কর তবে যাহার ভাবনা কর তাহা হইয়াই তোমাকে জন্মিতে হইবে। ভরত সারাজীবন তপস্যা করিবার পর একটা অসহায় হরিণ শিশুকে স্নেহে পুষিয়া মরণের

পর হরিণ হইয়া জন্মিলেন। পাদ্রিরাও অনেক পাপিষ্ঠকে মরণকালে যীশুর নাম করাইয়া নরকভোগের দায় ছাড়াইয়া দিয়া থাকেন। মুমূর্ষুর কানে ব্রহ্মনাম ফুঁকিবার ব্যবস্থা অতি প্রচলিত পদ্ধতি। আমাদের সারা জ্ঞান ও ভাবনা যখন মায়াময় প্রপঞ্চে বাড়িয়াছে, তখন সেই প্রপঞ্চের কথা ভুলিয়া কেমন করিয়া ব্রহ্ম ভাবা যায়! পণ্ডিতেরা বলেন উহা সম্ভব হয় যোগের পদ্ধতিতে। আবার পাকা রকমে কেহ যদি যোগ করিতে না পারে তবে সেই প্রপঞ্চের কাঠ-পাথরের একটা মূর্ত্তিকে ব্রহ্মের রূপ ভাবিয়া যদি ব্রহ্ম অর্চনা করে, তাহাতেও নাকি ফল হইতে পারে। এই জন্য অনার্য্যজাতির নানা ঠাকুর যখন আর্য্যের পূজ্য হইয়াছিলেন তখন "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা" হইয়াছিল। বুদ্ধিতে এই রকমের পেঁচ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনেকে মূর্তিপূজা-পরিত্যাগীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে একটা সাকার ঠাকুর খাড়া না করিলে তাঁহাদের ব্রহ্মধ্যান ঘটিতে পারে কিরূপে! এই পচা তর্ক উঠিত না, যদি মানুষ আপনার দুঃখ-সুখের লীলার মধ্যে ঈশ্বরের লীলা বুঝিতে পারিত। কোনও বস্তুতে বা প্রতিমায় ব্রহ্ম কল্পনা করিয়া যে ধ্যান বা উপাসনা আছে তাহা অতিশয় প্রাণহীন। মূর্তি বা প্রতিমার অবয়বের ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অসুর-নিধন প্রভৃতি ক্ষমতার কথা মন্ত্রে পড়া হয়, কিন্তু সেই ধ্যান বা উপাসনা বৈদিক-যুগের দেব-আরাধনার মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই; ঊষা হোক্, বা সন্ধ্যা হোক, বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হোক্ সেগুলি কোনও দেবতাকে suggest করায় না বা মনে পড়ায় না। কারণ তাহা হইলে, হয়ত সেই সুন্দর বস্তু হইয়াই সাধককে আবার জন্মিতে হইত। কোনও সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি না ফেলিয়া দেবতার নামের মালা জপিতে হয়; কারণ অন্যদিকে দৃষ্টি

রাখিলে নাম গণিবার সংখ্যা ভুল হইতে পারে। প্রাণকে মাটির ডেলা করিয়া গড়িবার এতবড় কৌশল আর নাই।

মানি বটে—অনন্তের ভাবনা বা ঈশ্বরের কথা মানুষের স্বতঃই মনে পড়ে বিশ্বের চারিদিকে চাহিয়া। তবে অগ্নিতে; বিশ্বের মাটি-পাথরের ওষধিতে ও বনস্পতিতে অনন্তের যে ইঙ্গিত আসে তাহা অতি ক্ষুদ্র। ঐগুলির দিকে তাকাইয়া কবির ভাষায় বলিতে পারি বটে—These are Thy glorious works; কিন্তু আমাদের দুঃখ-বেদনা প্রভৃতির দিকে তাকাইয়া যদি বলিতে পারি—ইহার মধ্যে ঈশ্বরেরই লীলা চলিয়াছে অর্থাৎ These are His glorious works, তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ভাবে মানুষের প্রাণ যথার্থ উদ্‌বুদ্ধ হইতে পারে। আমরা আকাশ দেখিয়া, সাগর দেখিয়া, পাখীর ডাক শুনিয়া অতি মধুর কবিতার নেশায় মুগ্ধ হই, আর ঐ যে অসীম অনন্ত যাহার কূল পাই না, কিন্তু নিত্যই জীবনের প্রতি কাজে—প্রতি দুঃখে, বেদনায়, সুখে ও আনন্দে যাঁহার লীলা-খেলা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি; তাঁহাকে কি মনে পড়ে না বা পড়িবে না এই অতি প্রত্যক্ষ অনুভূত ভাবগুলির মধ্যে? এই শ্রেষ্ঠ কবিত্বের ভাব বা প্রাণের মধুরতর ভাব সৃষ্টি করিবার জন্য প্রতি মানবের জীবনের অভিজ্ঞতাই কি যথেষ্ট নয়? কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট যে নিরবলম্ব ধ্যান, তাহার প্রয়োজন কোথায়?

দুঃখ-বেদনা প্রভৃতি যে আমাদের যথার্থ উন্নতির মূলে অর্থাৎ মনুষ্যত্ব বাড়াইবার মূলে তাহা ভুলিয়া গিয়া সেগুলিকে অতি মিথ্যা মায়া বলিয়া ছাড়িবার চেষ্টায় কৃত্রিম ব্রহ্মসাধনা বা মোক্ষলাভের ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। সকল শোক-তাপ বহিয়া ও পরাভূত করিয়া যে, জীবন-যুদ্ধে উন্নতিলাভ করিতে হয় তাহা কবি Longfellowর ভাষায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে—আমাদের সকল পাপ ও শোক-তাপ প্রভৃতি

স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ির এক-একটি ধাপ। বিয়োগ-দুঃখে ব্যথিত কবি Wordsworth তাঁহার শোকের কথায় বলিয়াছেন—One deep distress hath humanised my soul। অর্জনের শ্রমে যে আমাদের প্রফুল্লতা ও আনন্দ বাড়ে, প্রাণপণ পরের সেবায় ও দুঃস্থের দুর্গতি দূর করিয়া যে আমাদের প্রাণ বিশ্ব-প্রেমে মধুর হয়, আর সেই সাধনায় যে অসীম লীলাকারীর অফুরন্ত প্রেমের প্রকাশে ও স্পর্শে আমরা ধন্য হইয়া কর্মবলে বাড়ি, ইহা অনায়াসেই প্রত্যক্ষরূপে সকলেই আপনার জীবনে অনুভব করিতে পারেন। মিথ্যাবাদ ছাড়িয়া বেদনার দিকে যথার্থ দৃষ্টি পড়িলে যে-কেহ প্রত্যক্ষ অনুভবে বলিতে পারেন—

দাহয়া দহিয়া বেদনায়
জাগিছ মোহিয়া চেতনায়
(আমার) দুঃখ আমূল—ফুটাইছে ফুল
আকুল করিয়া প্রাণে।

ক্ষুরধার—দুঃখ তাড়াইবার অসম্ভব চেষ্টায় অতি সহজ প্রাকৃতিক পথ ছাড়িয়া পণ্ডিতেরা যে মোক্ষলাভের ধর্ম গড়িয়াছেন সে ধর্মের পথকে ইঁহারা নিজেই বলিয়াছেন ক্ষুরধারের মত সূক্ষ্ম ও ধারাল। এই দুইটি বিশেষণই ঠিক বটে। স্বভাবজাত স্নেহ-প্রেম এড়াইতে গেলে অতি সূক্ষ্ম চোরাপথে চলিতে হয় আর অতি সাবধান হইলেও পা কাটে। যিনি নিরবলম্ব তপস্যায় ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় যাত্রা করেন তাঁহাকে যদি তাঁহার ছেলে আসিয়া স্নেহে 'বাবা' বলিয়া ডাকে বা পত্নী আসিয়া প্রেমের ভাষায় 'ওগো' বলে তবে ক্ষুরধারের পথে চলা অসম্ভব। একথা ঠিক, সাধারণ মানুষেরা পণ্ডিতী মোক্ষের ক্ষুরধার খোঁজে না আর স্বাভাবিক রকমে ঘর-সংসার করিয়াই চলিয়াছে; তবে পণ্ডিতেরা ধর্মের নামে একটা জুজু বা বিভীষিকা খাড়া করেন। ধর্মের মধ্যে যেটুকু আছে

সরস ও জীবনপ্রদ তাহা তাহারা তপস্যার ভয়ে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে ও গুহায় ঢুকিয়া ধর্মকে খোঁজে না। পণ্ডিতদের মোক্ষধর্মের আলোচনায় স্বাভাবিক স্নেহ-প্রেমে গড়া মানব-ধর্মের যে আভাস দিয়াছি তাহাতেই হয়ত বুঝিতে পারা যাইবে যে, ধর্মের পথ ক্ষুরের মত ধারাল ও সূক্ষ্ম হওয়া দূরে থাক, সে পথ অতি প্রশস্ত ও অতি সুখময়। কে না প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে সাধারণভাবে সকল মানুষই বিনা শঙ্কায় ও প্রফুল্ল মনে আপনাদের কাজ করিয়া প্রশস্ত পথে চলিতেছে, আর অসাধু চোরেরাই গা-ঢাকা দিয়া কষ্টে সাপ-বাঘ এড়াইয়া পুলিসের হাত এড়াইয়া অতি পিছল ও কাঁটাভরা সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছে। ধর্মের পথ প্রশস্ত আর পাপের পথই সঙ্কীর্ণ। দার্শনিক ধর্মবাদ কিন্তু ধর্মকে এমনভাবে খাড়া করিয়াছে যাহাতে ঐ পদার্থটার সন্ধান নিতে হয় বুড়া হইলে—এই ভাবই মানুষের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। সহজে খেলা-ধূলা করিয়া সমাজ বাঁধিয়া ও কর্তব্য পালন করিয়া যে চরমধর্ম পালন করা যায় একথা শিশুরা ও যুবারা জানে না ও শিখিতে পায় না।

দুঃখ এড়াইবার জন্য, কর্মক্ষয় করিবার জন্য ও অদ্ভুত রকমে মোক্ষ পাইবার জন্য যে জন্মান্তরবাদ ও মোক্ষবাদ খাড়া করা হইয়াছে তাহা অতি অপ্রাকৃতিক ও বিশেষরূপে সমাজদ্রোহী ও সমাজ ক্ষয়-কর। পৃথিবীর জ্ঞানে অনভিজ্ঞ ও জীবনের তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বড়-বড় মহামহোপাধ্যায়েরা বুক ফুলাইয়া উঁচু গলায় বলিতেছেন যে যাঁহারা সমাজে দুঃস্থ ও তাঁহাদের বিবেচনায় নীচকূলে জন্মিয়াছে, এ জন্মের এ জীবনে তাহাদের উন্নতি ও উদ্ধার নাই; তাহারা যদি তপস্যা করিয়া চলে তবে বহু জন্ম-জন্মান্তরে কর্মক্ষয় করিয়া আদৃত শ্রেণীর মানুষ হইতে পারিবে। এই দুঃস্থেরা যে এ-জীবনে পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে সমাজের অঙ্গ হইয়া

মানবজাতির মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে, তাহা এই কুণো পণ্ডিতেরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না। অতি স্পষ্টভাবায় জীবনে লব্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণে মানুষমাত্রকেই বুঝাইতে হইবে যে মোক্ষ বা Salvationএর ধর্ম অতি হীন অসার ও ত্যজ্য; আমরা মোক্ষলাভের মুক্তি চাই না, ঈশ্বরদত্ত মানব-প্রকৃতিতে গড়া সমাজকে পায়ে ঠেলিয়া ও স্নেহ-মমতা ছিঁড়িয়া একটা কল্পিত নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হইতে চাই না,— আমরা এই অসার মুক্তি ছাড়িয়া চাই বন্ধন।

দুঃখ ও স্নেহ-প্রেমাদির কার্য্যকারিতা ভুলিয়া যাঁহারা কৈবল্য মুক্তি (aloneness) খুঁজিয়াছিলেন, তাঁহারা যেভাবে স্বর্গের পথের অনেক শিঁড়ি ভাঙ্গিয়া অতি উপরতালার উপরের একটি নির্জন garret বা চিলার ছাতের কুঠ্‌রিতে ঢুকিতে চাহিয়াছিলেন, আমরা সেই কৈবল্যকে উপেক্ষা করি। আর একদিকে উপেক্ষা করি সেই অনন্ত ব্রহ্মের ফাঁকা নামে কল্পিত নিষ্ক্রিয় নির্বিকার পদার্থটিকে, যাহা রুদ্ধ আছে হিরণ্ময় কোষে বা থ'লের মধ্যে বা সোনার কৌটার মধ্যে। যে অপরিহার্য্য অনাদি কালের নিয়মে স্নেহ প্রেম ও সেবা বাড়িতেছে ও সাধুতা বাড়িয়া সমাজের স্থিতি হইতেছে, সেই নিয়মের সঙ্গে অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের প্রাণের বন্ধন আঁটিয়া বিশ্বজনের প্রাণে প্রাণে মিলন ঘটাইতে চাই,—অর্থাৎ মোক্ষ ধর্মের মুক্তি দলন করিয়া মানুষে মানুষে বন্ধন চাই।

এযুগে যাঁহারা বিশ্বব্যাপী মানবের প্রাণের প্রাকৃত ধর্মের আস্বাদ পাইয়াছেন তাঁহারা ভূতের উপাসকদের ধর্মকে, বাঁধা মন্ত্রে তুক্‌-তাক্‌ করার ধর্মকে ও মায়াজাল কাটাইয়া মুক্তিলাভের ধর্মকে যথার্থ স্বরূপে চিনিতে পারেন নাই বলিয়া সকল ধর্ম একসঙ্গে টানিয়া একটা ধর্ম-সমন্বয় ঘটাইতে চান। মোক্ষ নামের ধাঁধায় অনেকে এখন মনে করেন

যে, সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেই যখন চাহিতেছে ঈশ্বরের কাছে মুক্তি, তখন যে-কেহ যে পথে চলিলে ক্ষতি হয় না, কারণ ঈশ্বর সকলেরই প্রাণের নিগূঢ় অর্থ ধরিয়া, ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করিয়া একই স্থানে টানিয়া নিবেন। যাহা প্রমাণ নয় কেবল একটা উপমা মাত্র, তাহারই দোহাই দিয়া ইঁহারা বলেন—সকল নদীই যখন এক সাগরে পড়িতেছে তখন যে যাহার মতের ধর্মপদ্ধতি খাড়া করিলে ক্ষতি নাই। এ উপমা মানা যাইতে পারিত, যদি স্বীকার করা যাইতে পারিত এই মিথ্যা কথাকে যে, পরমেশ্বর একটি মানুষদের ক্ষমতাশালী রাজার মত রাজা হইয়া বসিয়া আছেন আর তাঁহাকে নানা তোয়াজে চাটুবাদের স্তুতির মন্ত্র শুনাইয়া ও দাঁতে কুটা নিয়া ধন্না দিয়া মাথা কুটিয়া বশ করিতে হইতেছে। এরূপ অবস্থা স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই বলা চলে যে, মানুষেরা ভুল ধারণাতে হোক আর খাঁটি ধারণাতে হোক যখন অন্তর্য্যামী ঈশ্বরকেই খুসি করিবার ইচ্ছায় নানা রকমের পূজা-আর্চা করিতেছে তখন সেই অন্তর্য্যামী সকলের অন্তরের নিগূঢ় স্তুতি পাইয়া সমানে তৃপ্ত হইবেন। কিন্তু যদি বলা যায়—ঈশ্বর স্তুতিলোলুপ ক্ষুদ্র রাজা নন্ আর তাঁহাকে স্তুতিতে বশ করিয়া স্বর্গে চড়াই আমাদের ধর্ম নয়, তবে উল্লিখিত উপমাটির প্রয়োগের স্থান থাকে না। আমাদের ধর্ম যদি ভূত-পিশাচকে তৃপ্ত করিবার জন্য নয়, তুক্-তাকের মন্ত্রে দেবতাকে ঘাড় ধরিয়া আনিয়া পূজা খাওয়ান নয়, আর ঈশ্বর-দত্ত স্নেহ-প্রেমাদি ছিঁড়িয়া তপস্যার বলে জড়ত্ব লাভ করা নয়, তবে যে বিশ্বজনীয় মানব-ধর্মের আভাস দিয়াছি, তাহার সঙ্গে অন্য কোনও ধর্ম বাঁধিয়া সমন্বয় করা অসম্ভব। কোন সন্ধিতেই সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে যোড়া দেওয়া চলে না। যাহা পরস্পর-বিবাদী, অর্থাৎ incompatible, তাহাদিগকে মিলাইয়া রাসায়নিক বা chemical যোগ বাঁধা চলে না।

জুজুর ভয় ছাড়

৪

বলিয়াছি যে মোক্ষলাভের নাম জড়ত্ব লাভ। তবে হয়ত মোক্ষবাদী পণ্ডিতেরা বলিবেন যে যখন তাঁহাদের আত্মা অভাবের বোধ কাটাইবে অর্থাৎ উন্নতির তৃষ্ণা কাটাইবে তখন সূক্ষ্ম আত্মায় অনন্ত কাল ধরিয়া লাগিতে থাকিবে একটা কাতুকুতু বা শুষ্‌শুড়ি আর ক্রমাগত অশ্রান্ত আত্মা সেই শুষ্‌শুড়ির আনন্দ পাইবে। জুজুর ধর্মের যে বিবরণ দিয়াছি তাহা পড়িয়া কেহ-কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—প্রাচীন বিশ্বাসের সমালোচনায় নূতন ধর্মের যে আভাস দেওয়া হইয়াছে সে ধর্মে কি ঈশ্বরের উপাসনা নাই ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার নাই? ইহার উত্তর দিতেছি। প্রথমে বলিব ঈশ বা ঈশ্বর বলিতে প্রত্যক্ষরূপে আমরা কি বুঝি বা বুঝিতে পারি, আর তাহার পরে বলিব ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের কি সম্বন্ধ আছে ও মানুষের চেতনায় কিরূপ সম্বন্ধের ভাব জড়াইয়া না রাখিলে চলেনা।

গোড়ায় বলিয়াছি, অতি আদিম কালের মানুষের কঙ্কাল, গুহায় রক্ষিত চিত্র ও মৃত্যুর পরের সমাধি পরীক্ষা করিয়া ধরা যায় যে মানুষ-রূপে বিকশিত হইবামাত্রে মনের উপরে বা চেতনায় একটি অসীম ভাবের ছাপ লাগিয়া মানুষের মনে গাম্ভীর্য্যের ভাব ও বিস্ময় জাগাইয়াছিল। আমরা একদিকে ভাবিয়া থই পাই না—কূল পাই না সেই অনাদি ও অশেষের নিত্য ক্রিয়াশীল প্রভাবের ধারার বা বিধানের ধারার যাহাতে অশেষ বিশ্ব ফুটিয়াছে বা এখনও নূতন নূতন বিশ্ব ফুটিয়া

উঠিতেছে, কিন্তু অন্যদিকে সুস্পষ্ট ধরিতে পারি ও বুঝিতে পারি যে সেই ধারার যে নিয়মে বা বিধানে জড় নামে পরিচিত বিশ্ব শাসিত ও চালিত হইতেছে সেই নিয়মেই শাসিত হইতেছে মানুষের জীবন ও জীবলীলা। আমাদের ক্রমবিকাশে, সচেতন লীলার উদ্ভবে, প্রেমের টানে, মানুষে-মানুষে মিলন প্রভৃতিতে সেই লীলারই অপরিহার্য্য গতি দেখিতে পাই যাহা আত্মবোধশূন্য চেতন প্রাথমিক জীবে ও ধাপে-ধাপে উন্নততর জীবে লক্ষ্য করি। উহার কোথাও ঠকামি, ছলনা বা মায়ার সৃষ্টি নাই, আর কোনও নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যেই চিত্তবৃত্তির গতি নিরোধ করিবার দুঃস্বপ্ন জাগে নাই। আমাদের উন্নতির হেতু—যে অভাব-বোধ বা দুঃখ যাহার 'অভাবে' আমাদের চেতনা পায় জড়ত্ব, তাহাও আছে সর্বজীবে, আর দেখিতে পাই নিরন্তর ঐ অনাদি অশেষ ধারার লীলা চলিয়াছে আমাদের বেদনায়, প্রীতিতে ও কর্মে।

তবে এই অশেষ ধারার স্থিতির বোধ, ক্রিয়ার বোধ কি আমাদের প্রাণে সুস্পষ্ট নয়? মানুষে যে অপর মানুষকে চেনে; গাছপালা চেনে বা ধূলার কনাটি চেনে, সে কি ঐ সারা পদার্থগুলিকে চেতনায় পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া? কাহাকেও কি কেহ পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া চিনিতে পারে? পূর্ণরূপে চিনিবার কথা তুলিলে সকল পদার্থকেই বলিতে হইবে বাক্য-মনের অগোচর। ঐ যে চরম উদ্ভবের নিত্য-ক্রিয়াশীল ধারা বা বিধান আমাদের প্রাণের প্রতি স্পন্দনে জাগিতেছে ও অনুভূত হইতেছে, তাহার অনাদিত্ব ও অশেষত্ব ধরিতে পারা অসম্ভব হইলেও সে আমাদের প্রাণের অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ, প্রতিবেদনায় জাগ্রত ও চেতনায় সুস্পষ্ট; কাজেই ঐ বিধান বা বিধাতা সম্পূর্ণরূপে বাক্য ও মনের অগোচর নন। বরং বলিব, আমাদের বাক্য তাঁহাতে পূর্ণ—আমাদের মন তাঁহাতে পূর্ণ ও চেতনা তাঁহাতে উদ্ভাসিত।

মানুষের একটা পণ্ডিতী রোগ আছে যাহার ফলে যাহা সহজবোধ্য ও সুস্পষ্ট তাহাকে লঘু ও অগভীর মনে করে। যেখানে গভীর জল নির্মল ও স্বচ্ছ সেখানে প্রায় তলা দেখা যায় ভাবিয়া তাহাকে অগভীর ভাবে; আর অগভীর জল যদি কাদায় ঘোলা থাকে তবে তাহাকে ভাবে গভীর। তাই এই প্রত্যক্ষ সত্য অনেকের বিবেচনায় হয় লঘু ও অগভীর; আর যদি অপ্রত্যক্ষ বাজে কথাকে খানিকটা দর্শনের কচকচিতে ঘাঁটিয়া ঘোলা করা যায় তবে সেই বাজে কথাকে বিস্ময়কর সত্য মনে করে। অনন্তের সহজ জ্ঞান যেভাবে ভূতের সাধনায় ও তুক্‌তাক্ মন্ত্রের চাপে ঢাকা পড়িয়াছে আর তাহার ফলে লোকে ভাবে যে একটা পুতুল খাড়া না করিলে অনন্তের ধারণা আমাদের মনে আসে না, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিভাবে প্রাণের যথার্থ গতিকে ভুল ঠাওরাইয়া আমাদের বেদনা ও চেতনার অতীত রাজ্যে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে উপস্থিত করিয়া ও জন্মজন্মান্তরবাদের কাদা ঢালিয়া পণ্ডিতেরা জল ঘোলা করিয়াছেন ও ভূতের ওঝারা, মন্ত্রজপের পুরোহিতেরা ও মোক্ষধর্মের সাধকেরা ধর্মের নামে জুজু সৃষ্টি করিয়া মানবের উন্নতির পথে বাধার জঞ্জাল রচিয়াছেন।

ঈশ্বর বলিতে কি বুঝি, তাহার আভাস দিলাম। এখন এই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথা বলিব। যাঁহা হইতে আমাদের উদ্ভব তাঁহার সঙ্গে সারা বিশ্বের ও আমাদের যে সম্পর্ক আছে তাহাত চিরস্থির রহিয়াছেই; আমরা ত সারা বিশ্বপুঞ্জের সঙ্গে তাঁহাতেই স্থিত আছি— জীবিত আছি ও বিচরণ করিতেছি। যাহা আছে তাহাত বাঁধাই আছে; তবে এখন কথা এই যে আমরা কি প্রয়োজনে তাঁহার সঙ্গে একটা আলাদা রকমের সম্পর্ক রচিতে যাই? বলিয়াছি সে কথা যে ঐ অনন্তের ছাপ রহিয়াছে আমাদের চেতনায়; আর যদি নানা দর্শনের

আবরণ দিয়া আমাদের চোখ না ঢাকি, তবে ঐ অনন্তের দিকে বিস্ময়ে চাহিবই চাহিব। একথাও বলিয়াছি যে, পাহাড় হইতে সাগর পর্য্যন্ত বহু দৃশ্যে, কবিত্বের মধুর রসে মজিয়া মনকে প্রফুল্ল ও সরস করি ও তাহার ফলে প্রসন্ন মনে কর্মঠ হইতে পারি। এই যে আছে চেতনার গায়ে অমোঘ ছাপ দিয়া আঁটা অনন্তের ভাবনা যাহা চেতনার অঙ্গ হইতে মুছিয়া ফেলা অসম্ভব, একবার তাহার মনোহারিতার কথা ভাব। রুস্ দেশে চেতনার এই ভাবনাকে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে বটে, তবুও রুসের দোহাই না দিয়া প্রাণের অপরিহার্য্য টানে উহার কথা ভাবিয়া দেখ। এমন লোক থাকিতে পারে যাহার মনে কোনও সৌন্দর্য্য কবিতা ফুটাইতে পারে না আর এমন লোকও আছে যাহাদের মনে ঐ অতুল্য মনোহর নানা কুসংস্কারের আচরণের ফলে কোনও ভাব জাগাইতে পারে না। আমি মনে করি, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোকেই প্রাণের স্বাভাবিক রুচির প্রাকৃত বিকাশে ঐ মনোহরের ভাবনায় সেই শ্রেষ্ঠ কবিত্বের স্থিতি পাইতে পারে যাহার ফলে জীবন অতি মধুর, সরস, ও প্রফুল্ল ও কর্মক্ষম না হইয়াই পারে না। সহজে হাসিয়া খেলিয়া জীবনের সাধারণ কর্ত্তব্য পালন করিয়া ও প্রাণশক্তির নিগূঢ় নিয়মে অপরকে ভালবাসিয়া ও সেবা করিয়া মানুষে যে নিশ্চয়ই চেতন প্রাণের অনুভূতিতে ঐ অনন্তের ভাবনায় ধন্য হইতে পারে, তাহা যে বুঝান যায় না এমন নয়, তবে সকল মনোবৃত্তির সম্বন্ধ ও গতির কথা অল্পে বলিয়া ফেলা সুসাধ্য নয়। যে-কেহ প্রত্যক্ষ পরীক্ষায়, জীবনের কর্ত্তব্য-পালন করিতে করিতে ;—অর্থাৎ কোনও কৃচ্ছ্র-সাধন না করিয়া এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এ ভাবনা নরকের ভয়ে নয়, স্তুতি করার জন্য নয়, ইহা হয় ও হইবে প্রাণের প্রাকৃতিক বিকাশে। সকল কুসংস্কারের জঞ্জাল পুড়াইয়া একবার জুজুর ভয় ছাড়িয়া এই পথ চলিয়া দেখ।

এ সম্পর্কে আর একটি কথা আছে, সকল শ্রেণীর "জীবন্তের" (living organismএর) জীবনের গতির প্রকাশ ও বিকাশ হয় যে জৈবনিক নামক পদার্থের ধাতুগত ধর্মে সেই ধর্মই এই যে সে মরিতে চায় না, আর যে অবস্থা জীবনপ্রদ তাহার প্রতি তাহার গভীর আকর্ষণ জন্মে। এই অন্তর্গূঢ় আকর্ষণেই মানুষে-মানুষে স্নেহ-প্রেম প্রভৃতির প্রকাশ পায় ও জীবের বিকাশ যত উন্নততর হয় ততই এই স্নেহ-প্রেম বিশ্বব্যাপকতা খোঁজে; অর্থাৎ যত অধিক প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ হয় ততই তাহার বিকাশ পূর্ণতর হইয়া ওঠে। একটি লতা যে ডগা বাড়াইয়া আলোক খুঁজিয়া বাড়িয়া ওঠে সে লতাটিও লতার দঙ্গল বাড়াইয়া আপনার বিকাশকে অধিকতর করিতে চায়। অপ্রাকৃতিক অবস্থায় 'কা তব কান্তা' বলিয়া বৈরাগ্যের নিশ্বাস ফেলিলেই এই স্নেহ-প্রেম মরে না; অর্থাৎ জৈবনিককে বধ না করিলে বা আত্মহত্যা না করিলে স্নেহ-প্রেমাদির বিকাশকে নষ্ট করা যায় না। আমাদের কর্তব্য-নিষ্ঠার মূলে আছে এই ধাতুগত আকর্ষণ; তাই স্নেহ-প্রেম প্রভৃতির উত্তেজনায় মানুষে মরণ পণ করিয়া (মরণ ভুলিয়া) কর্তব্যের পথে চলে। প্রাকৃতিকভাবে মস্তিষ্ক যদি অবিকৃত থাকে (উত্তেজিত অবস্থায় যদি ভ্রান্ত না হয়) তবে মানুষের কর্তব্য পালিত হয় অতি প্রশান্ত প্রফুল্ল মনে। যেমন জল ছিটাইয়া গাছপালাকে স্নিগ্ধ রাখিতে হয়, তেমনই যাহাকে বলি কবিত্বের মধুর ভাব, তাহার সেচনে স্নিগ্ধতা পাইলে স্নেহ-প্রেমাদির বৃদ্ধি হয় ও অচপলরূপে কর্তব্যনিষ্ঠা গাঢ় হয়। অনন্তের ভাবনায় যে অতুল্য মধুর রসের বা উচ্চতম কবিত্ব-ভাবের বিকাশ হয়, তাহাতে প্রেমাদির বর্দ্ধন হয় প্রভূত পরিমাণে। এই স্বাভাবিক অবস্থাকে কি আস্তিক কি নাস্তিক কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। তবে এস্থলে 'যেহেতু ও অতএব' জুড়িয়া বলা চলে না যে যেহেতু কর্তব্যনিষ্ঠা

বাড়ে অনন্তের ভাবের রসে স্নান করিলে, অতএব প্রয়োজনের খাতিরে টানিয়া-বুনিয়া কেবল কল্পনায় নিজের মনে অনন্তের ভাব জাগাও। প্রাকৃতিকভাবে এই অনন্তের ভাব মনে ধীরে ধীরে জাগিলেই শরীর মন রসে স্নিগ্ধ হইয়া প্রেমের প্রদর্শিত পথে গভীর কর্তব্যনিষ্ঠা জাগিতে পারে। পরের প্রতি প্রেম ও পরসেবা যত বাড়িবে ততই মনে এই উচ্চতম কবিত্ব বা অনন্তের প্রতি প্রেম বাড়িয়া উঠিবে। যাহারা অতি মিথ্যা ও অবৈজ্ঞানিক জন্মান্তরবাদের চাপে নিজেদের জন্মের অস্বাভাবিক উৎপত্তির কল্পনা করে ও সেই ভ্রান্ত বুদ্ধিতে জাতিভেদ বজায় রাখিয়া মানুষের প্রতি প্রেম-বিস্তারের পথ বন্ধ করে, তাহাদের মনে প্রেমের যথার্থ বিকাশ হইতে পারে না ও তাহারা নিত্য সত্য অনন্তের মধুর রসে জীবনকে স্নিগ্ধ করিতে পারে না ; মানুষকে ভুলিয়া বৃথা জপে, তপে ও ধ্যানে কখনও প্রাণে অনন্তের প্রকাশকে উজ্জ্বল করিতে পারে না।

অল্প নির্দেশ করা গেল উপাসনা সঙ্কেত ; এখন দিতেছি প্রার্থনার ইঙ্গিত। মানুষের সারাজীবনের গতি যে কেবল চাই-চাই, তাহা নির্ভুল। শিশু ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুধ চায়, জল চায়, হাঁটিতে চায়, ছুটিতে চায় ; আমরা পরের সঙ্গে কথা কহিতে চাই, জ্ঞানের কৌতুহলে কত কিছু জানিতে চাই, প্রেমে ও প্রয়োজনে মানুষকে চাই। মানুষের সারাজীবনে এমন একটা ক্ষুদ্র কনা নাই বা অবস্থা নাই যাহা চাই-চাই নয়। সারাজীবন কেবল প্রার্থনার সমষ্টি অথবা এক আঁটি প্রার্থনা। এই যে প্রার্থনা করিয়া প্রার্থিতের জন্য নিরন্তর চেষ্টা ও কর্ম চলিয়াছে, তাহাতে লাভের আনন্দ আছে, অপ্রাপ্তির বিষাদ আছে আর সেই আনন্দ-বিষাদের মধ্যে নিরন্তর জ্বলিতেছে "আশার সলিতা—রাবণের চিতা।" ভবিষ্যৎ মানুষের কাছে অন্ধকার, তবুও সেই ভবিষ্যতের প্রতি নিগূঢ় আস্থায় আমরা প্রার্থনারাশি বহিয়া সম্মুখপানে ছুটিতেছি,—

বেদনা ও দৈন্য বহিয়াও ছুটিতেছি। চাই-চাই আছে, অভাব আছে, অর্থাৎ দুঃখ আছে অপরিহার্য্যরূপে; তাই চেষ্টা বা কর্ম চলিয়াছে অফুরন্তভাবে উন্নতির পর উন্নতি সাধনে। যাঁহারা দুঃখ উড়াইতে চান তাঁহারা আপনাদের ভ্রান্তি ভাল করিয়া দেখুন; চোখ বুজিয়া দীপ্ত সূর্য্যের অস্তিত্ব মুছিয়া দেওয়া যায় না,—দুঃখের স্থিতি কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

এই যে আমরা আশা পুষিয়া প্রার্থনা করিয়া ভবিষ্যতের দিকে ছুটিতেছি তাহাতে যে আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা জাগিতেছে ও ক্ষণে ক্ষণে নিরাশায় মূর্চ্ছিত হইতেছি তাহার বিনোদ হয় কিসে? যাহা থাক্ কুল-কপালে বলিয়া একটা খামখেয়ালি fate বা কপালের উপর নির্ভর করিয়া কি, ভবিষ্যতের দিকে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিতে পারি? খাম-খেয়ালী fate বা কপাল ত এই অনাদি সৃষ্টির বিধানের মধ্যে কোথাও কেহ দেখে নাই ও দেখা অসম্ভব। Fate বা কপাল একটা ডাহা মিথ্যা কল্পনা। বিশ্ব-বিধানের অসীম ধারার যতটুকু স্রোতের গতি আমাদের বুদ্ধির আয়ত্ত, তাহার মধ্যে কোথাও খামখেয়ালী ভাব নাই, অনির্দিষ্টতা নাই, আছে কেবল সুসম্বন্ধ নিয়মের ধারা। কপাল বা fate অতি বড় মিথ্যা; তাহার উপর নির্ভর করিয়া কেহ প্রার্থনা জানাইয়া চলিতে পারেনা। আমরা যে কোনও মুহূর্তে যাহাই চাই তাহাই যে পাইব, একথা কেহ ভাবিতে পারেনা; সুসম্বন্ধ অনাদি নিয়মে বা বিধানে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে। নিরন্তর প্রত্যক্ষভাবে বহিতেছে যে বিধানের প্রবাহ, যাহা আমাদের প্রতি স্পন্দনে অনুভূত, তাহা কল্পিত কপাল নয়; উহা চিরস্থায়ী নির্ভুল সত্য। ঐ বিধানের ফলে বা ইচ্ছায় আমাদের প্রার্থনা সফল বা নিষ্ফল হইতেছে জানিয়া সেই অতি সত্য বিধানের দিকে নিরন্তর তাকাইয়া যদি আমরা জীবনের সকল প্রার্থনা উদ্ভাসিত করিয়া

চলিতে পারি অর্থাৎ অনন্ত অশেষের বিধান জয়যুক্ত হোক্ বলিয়া আমাদের সকল প্রার্থনাকে সরস করিতে পারি, তবেই যাহা খাঁটি সত্য তাহাই বুঝিয়া ও ধরিয়া চলিতে পারি। পূর্বেই বলিয়াছি যে ঐ অনন্তের ভাবনা আমাদিগকে স্নিগ্ধ ও সরস করে অতুল্য মধুরতার রসে ; কাজেই আমাদের যে প্রার্থনার ধারা স্বতঃই ছুটিতেছে ও ছুটিবে, তাহা ঐ অনাদি অশেষের পানে তাকাইয়া ছুটিলে লাভে ও অলাভে যে কোন অবস্থায় জাগিবে উৎসাহ ও আনন্দ।

এই নিরন্তর প্রবাহিত প্রার্থনার মধ্যে যে, অনুতাপ ও অনুতাপ-জাত প্রার্থনা আছে তাহার অর্থ ইহা নয় যে আমরা কাঁদিয়া বা মাথা খুঁড়িয়া একটা নিষ্ঠুর বিধানের মন মানাইয়া প্রার্থনা পূর্ণ করাইতে চাই। উহার অর্থ এইরূপ। আমরা যখন কৃতকর্মকে দোষযুক্ত বুঝিতে পারি, তখনই মনে 'জাগে কেন করিলাম'-এর অনুশোচনা, অর্থাৎ যখন উঠিয়াছি কুকাজকে পরিহার করিয়া উন্নতির ধাপে, তখনই অনুতাপ দেখা দেয়। আমরা অনুতাপের ফলে কিছু যে পাই তাহা নয় ; কুপথ যে ছাড়িতে পারিয়াছি তাহা সূচিত হয় ঐ অনুতাপে। আবার প্রার্থনার জাগরণের সম্বন্ধেও ঐরূপ একটা বুঝিয়া নেওয়ার আছে। যখন বিধাতার moral order অর্থাৎ বিশ্বে স্থাপিত সুনীতির পদ্ধতির মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে আমাদের মনে উন্নততর অবস্থা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তখন সেই আকাঙ্ক্ষা যদি প্রবলবেগে প্রবাহিত প্রার্থনারূপে ফুটিয়া ওঠে, তবেই সূচিত হয় যে আমি উন্নতিলাভের উপযোগী হইয়াছি ও উন্নতি পাওয়া সম্ভব হইতেছে। কাজেই বলিতে পারি যে—যে ব্যক্তি সুনীতি প্রতিষ্ঠার পানে তাকাইয়া নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছে না, তাহার মন কর্তব্যনিষ্ঠার দিকে ভাল করিয়া ঝোঁকে নাই। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গানের প্রথম ছত্রের একটি শব্দ অল্প বদ্‌লাইয়া এই প্রার্থনা উচ্চারণ করিতেছি—

এসেছি সখাহে নিয়ে "সারাজীবনের" গান।
আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে
তোমারে করিব সব দান ;
হৃদয়ের যত আশা—যত সুখ ভালবাসা
তোমাতে লভুক অবসান।

উপসংহার—যাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা এই—(১) মন্দিরে বা গাছ-পাহাড়ের ধারে বা অন্যত্র অস্থায়ীভাবে যেসকল ঠাকুর দেবতার মূর্তি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখা হয় ও পূজা করা হয় তাহারা গোড়ায় ছিল মরা মানুষের ভূত আর এখনও তাহারা তাহাদের পুরাকালের প্রকৃতি ছাড়ে নাই। (২) মানুষের ভূত ছাড়া অনেক প্রাকৃতিক শক্তির কল্পিত আত্মাকেও ভূতেদের সঙ্গে সমানে পূজার আসন দেওয়া হইয়াছে, আর সকল শ্রেণীর ঠাকুর দেবতাকেই যাদুবিদ্যার তুক্-তাক্ মন্ত্রে বশ করিয়া পূজা করা হয়। (৩) দেখান হইয়াছে যে এই দুই শ্রেণীর ঠাকুর-দেবতার পূজাতেই প্রাণের বিকাশে বাধা ঘটে,—মনে জন্মে জড়তা আর জুজুর ভয়ে মানুষের প্রফুল্লতা নষ্ট হয়। (৪) দেখাইয়াছি—অপরিহার্য্য দুঃখ-বেদনা প্রভৃতিকে জীবনের উন্নতির উপায় বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া ঐগুলিকে ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া মোক্ষ বা salvation খুঁজিবার চেষ্টায় অনেকে ধর্মকে খাড়া করিয়াছে সমাজ ক্ষয়কর পদার্থ, আর ধর্ম জিনিসটাকেই লোকের কাছে মহা আতঙ্কের জুজু করিয়া দাঁড় করাইয়াছে। আবার ঐ মতবাদের অনুসরণে মৃত মানুষের আত্মার ভূত প্রভৃতি হইতে জাত ঠাকুর-দেবতাদিতে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া ধর্মকে অতি জটিল ও অকেজো করিয়া দিয়াছে। (৫) দেখাইয়াছি যে, উপরের লিখিত মতবাদের সমর্থনে মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের চক্র

কল্পনা করিয়া পণ্ডিতেরা এমন কৃত্রিম জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে প্রাকৃতিক নিয়মে সমাজের উন্নতির পথে গুরুতর বাধা ঘটিয়াছে। (৬) শেষে দেখাইয়াছি যে, প্রাকৃতিক নিয়মে সহজ পথে প্রেমের ধর্মে বাড়িলে মানুষে কিরূপে জীবনের চির আনন্দদায়ী ধর্ম পাইতে পারে ও সমাজের উন্নতির পথ অবাধ হয়। মোক্ষের ধর্ম ছাড়িয়া মিলনের ধর্ম পাইলে মানুষ কিরূপে ধন্য হয় তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

কুসংস্কারের জালে আপনাদিগকে জড়াইবার ফলে অনেকে ভাবিতে পারেন যে, সাধারণ নিরক্ষর চাষা শ্রমজীবী প্রভৃতি লোকেরা আমাদের প্রদর্শিত সহজ ধর্মপথ অবলম্বন করিয়া কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে পারেনা। সাধারণ মানুষকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা পণ্ডিতীর আভিজাত্যের গর্বে ভাবি—কল্পিত কিছু খাড়া করিয়া দিতে না পারিলে সাধারণ মানুষের মনে সত্যের বোধ জন্মিতে পারে না। বিস্তৃতভাবে সাধারণ মানুষের মনের প্রকৃতি বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তে দেখাইতে চাই যে, সাধারণ মানুষকে শিক্ষায় অভিমানীরা যেমন পশু মনে করেন তাহারা তাহা নয়, ও তাহাদের মনে সরল সত্য ধারণের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। নিরক্ষর কৃষক প্রভৃতিরা যে, মানুষের প্রাণে অনুভূত বড় ভাব ধরিতে পারে না, ইহার সমর্থনে পণ্ডিতেরা বলেন যে তাঁহাদের মত সাধারণ লোকেরা গভীর মনোযোগ দিতে পারেনা। একথা সত্য নয়। চাষারা তাহাদের ফসল বাড়াইবার কাজে এত প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি দেয় যাহা একজন ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিত দিতে পারেন না। যাহার যেদিকে স্বার্থের খাতিরে দৃষ্টি পড়ে, সে সেইদিকেই দৃষ্টি দিয়া গভীর মনোযোগে কাজ করিতে পারে। চাষা, শ্রমজীবি প্রভৃতি, পণ্ডিতের বিদ্যার দিকে মনোযোগী হইতে পারেনা বলিয়া তাহাদের মানসিক অক্ষমতা প্রমাণিত হয় না। সকলেরই

প্রাণে নিজেদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে ; সেদিকে তাহাদের মনোযোগ দিবার আগ্রহ বাড়িতে পারে তাহাদের স্বার্থের বুদ্ধিতে, আর সেই বুদ্ধি জাগাইয়া দেওয়া কঠিন কথা নয়।

যীশু প্রায় দু'হাজার বছর আগে মানুষের জীবনের যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছিলেন তাহা গুরুত্বে অন্য কোন দেশের ধর্মবাদ অপেক্ষা লঘু নয়। তিনি সেই সকল সত্য প্রচারের জন্য জ্ঞানী পণ্ডিতদিগকে চেলা করেন নাই। অতি নিরক্ষর জেলে-মালাদের কাছে গিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা মাছ ধরিতে শিখিয়াছ ; এস, আমি তোমাদিগকে মানুষ ধরিতে শিখাইব"। যীশুর সেই শিষ্যেরা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিল ও লোকসাধারণের কাছে প্রচার করিয়া সফলতা পাইয়াছিল। আমরা যদি সাধারণ মানুষদের কাছে যাই ও তাহাদিগকে ভালবাসিয়া দেখাই যে তাহাদের প্রাণের মধ্যে যে সহজ ধর্ম আছে তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ সাধনায় বাড়াইতে পারে, তবে অতর্কিতে তাহারা সকল জুজুর জঞ্জাল পোড়াইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। সত্যের সঙ্গে মিথ্যা জুড়িয়া দিলে সত্য হইবে মিথ্যায় পরিণত, আর মানুষ হইয়া যাইবে ভ্রান্ত। ভ্রান্তি ছাড়, আর জুজু তাড়াও ও প্রফুল্ল সরল জীবনে সত্যকে লাভ করিয়া ধন্য হও।

জীবনের দুইটি প্রধান শত্রু

হিতের জন্য যাহা চাই, যাহা জীবনের প্রফুল্ল-বিকাশের জন্য চাই, তাহা পাওয়ার পক্ষে অনেক বাধা-বিঘ্ন আছে; উহাদের মধ্যে দুইটি বড় বিঘ্ন বা শত্রুর বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। একটি শত্রু, ভয়ে জড়সড় হইয়া রুদ্রদেবতাকে পূজা করা, আর অপর শত্রু—মধুর নেশায় ভয় ভুলিয়া ললিত কোমলের আরাধনা করা। মরণের ভয়ে ভীত মানুষ আকাশের বজ্র, পাতালের ভূকম্প, ও ঝঞ্ঝা, জল-প্লাবন প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া জীবনের প্রফুল্লতা হারায় ও সংহারের রুদ্রদেবতা কল্পনা করিয়া ক্রুদ্ধ রুদ্রকে থামাইবার জন্য স্তুতির মন্ত্র পড়ে। ভয়ের চাপে পূজা করিলে যাহা হইবার তাহাই হয়; মানুষ তাহার তেজ ও প্রফুল্লতা হারাইয়া দেবতার কাছে দাস্যে ও গোলামি বুদ্ধিতে মনুষ্যত্ব হারায়। একটি ইংরেজি শব্দ জুড়িয়া বলিতে পারি, রুদ্রের পূজায় মানুষ হয় brutalised, আবার অন্যদিকে নিছক্ ললিত-কোমলের উপাসনার মধুর নেশায় উপাসকেরা আরাধ্যকে করেন চপল-বিলাসের নেতা ও আপনাদিগকে করিতে বসেন ভোগে নিষ্কর্মা। এখানেও ইংরেজি শব্দ জুড়িয়া বলি, দেবতা হ'ন্ vulgarised আর উপাসকেরা হইতে বসেন demoralised. সমাজের হিতের জন্য এই দুইটি অবস্থারই আলোচনা চাই।

মরণ যে একটা বিপদ নয়, আর মরণকে বিপদ ভাবিয়া ধৈর্য্য হারাইলে যে ঐ মরণকে এড়ান যায় না, ও মরণ ভুলিয়া প্রফুল্ল মনে

কাজ করা যে সহজ, সে সকল কথা "মরণ ভোল" প্রবন্ধে লিখিয়াছি। রোগে, নানা জন্তুর আক্রমণে ও নানা কারণে মৃত্যু ঘটে; তবে বিশেষ করিয়া এ অবস্থার ধ্যান কেন যে, রুদ্র রহিয়াছেন উদ্যত বজ্র হইয়া? বিধাতা যদি পিষিয়া মারিবার জন্যই মানুষকে গড়িয়াছেন, তবে তোমার স্তব-স্তুতিতে তাঁহার গড়া প্রকৃতির ক্রিয়ায় বজ্রপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি রহিত হইবেনা। পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, দুঃখ, বিপদ ও বাধা আসে আমাদের চেতনাকে অধিকতর উদ্দীপ্ত করিয়া মনুষ্যত্ব দেওয়ার জন্য। জীবন রক্ষার আগ্রহে দুঃখ-বিপদ প্রভৃতিতে চম্‌কাইতেই হয়, কিন্তু সে চমকে জড় হওয়া মনুষ্যত্ব নয়। তেজস্বীর বুদ্ধি জাগিয়া ওঠে ইহারই অনুসন্ধানে যে কি-কি উপায়ে প্রাকৃতিক বিপদের অবস্থা থাকিলেও তাহাকে শাসন করিয়া মানুষের স্থিতির ও মনুষ্যত্বের গৌরব বাড়াইতে পারা যায়। রুদ্রকে পূজা না করিয়া, স্তব-স্তুতি না শোনাইয়া পিষিয়া মারিতে হইবে, অর্থাৎ মৃত্যু-ভয়ের বিহ্বলতা ও হাহাকার বধ করিয়া প্রফুল্ল, তেজস্বী ও কর্মক্ষম হইতে হইবে। Fear of God হইতে ধর্মের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে ও হইতেছে নানাদেশে; সেই জন্য কর্মদীক্ষিত নূতন যুগের রুসেরা ধর্মের নামেই রুষিয়া উঠিয়া দাসত্ব-বুদ্ধির শিকড় উপ্‌ড়াইবার জন্য সকল :শ্রেণীর ধর্ম-বিধানকেই সংহার করিতে বসিয়াছে।

এ সম্পর্কে জাপানীদের নির্ভীকতার ও পুরুষকারের দৃষ্টান্ত দিতেছি। ঘন-ঘন জলপ্লাবনে বহু লোকালয় ভাসিয়া যাইতেছে, ভূকম্প প্রভৃতিতে অনেক স্থান ধসিয়া যাইতেছে, কিন্তু এ অবস্থায় তাহারা রুদ্রের পূজা করিতেছে না। বরং তাহারা আপনাদের তেজস্বিতায় বলিতেছে যে তাহারা কোন বিপদ্‌কে কেয়ার্ করে না, বা গ্রাহ্য করে না, আর বুদ্ধি ও চেষ্টার বলে আবার গড়িয়া তুলিবে যাহা যাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই

সেদিন যখন চীনদেশের উত্তর ভাগ দখল করা নিয়া যুদ্ধ বাধিল ও রণতরী নিয়া সৈন্যেরা যাত্রা করিতে বসিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ভীষণ প্রাকৃতিক উৎপাতে দেশের অনেক স্থান ভাসিয়া ও ধসিয়া গেল। তখন তাহারা আমাদের মত 'দুর্নিমিত্ত' কল্পনা করিয়া হতভম্ব হয় নাই বা যুদ্ধ যাত্রা বন্ধ করে নাই। হাঁচির চেয়ে অনেক বেশি জোরে ঝঞ্ঝা বহিয়াছিল ও টিক্‌-টিকির চেয়ে অনেক অধিক জোরে অনেক বিপদ পিছনে টিক্‌টিক্‌ করিতেছিল, কিন্তু দেশের লোকে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া যুদ্ধ করিতে গেল, আর ন্যায় হোক্‌ বা অন্যায় হোক্‌, জয়লাভ করিয়া সঙ্কল্প রক্ষা করিল। ইহাদের দেশের অশ্লেষা-মঘা মানুষের কেশ স্পর্শ করিতে পারে না। যাহারা আত্মশক্তিতে দৈব বা রুদ্রকে হত্যা করিতে না পারে, সেই ভীরু দাসেরা জীবনে জয়যুক্ত হইতে পারে না।

যাঁহারা বলেন—রুদ্রের ভাব মনে না রাখিলে যাহা বিস্ময়কর হইয়া মনোহর অর্থাৎ sublime তাহা মনে না জাগিতে পারে, তাঁহারা ভ্রান্ত। ভয়ের চাপে, যে বিস্ময়ের মত ভাব জন্মে, তাহা জড়তায় মিশ্রিত বিহ্বলতা; জীবনের প্রফুল্লতা ও সরসতা না থাকিলে বিস্ময়ের বস্তু মনোহর হয়না অর্থাৎ sublime ভাব ফোটে না। আদৎ কথা এই—যাহাদের মনে অলক্ষ্যে জাগিয়া আছে মরণের দুঃস্বপ্ন ও হাহুতাশ, তাহারাই পাকে-চক্রে রুদ্রের আসন বজায় রাখিতে চায় ও অপূজ্যকে পূজা করিতে চায়।

এবারে বলিব ললিত-কোমল চুপ্‌ সয়তানের কথা, যে, vampire বাদুড়ের মত, পাখার স্নিগ্ধ বাতাসে জীবকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার রক্ত শুষিয়া মারে। ভীরু মানুষ রুদ্রের ভয়ে আঁৎকাইয়া যে 'অশৈব' পন্থা খুঁজিয়াছে,—'আনন্দ' পাইবার লোভে ললিত-কোমলের সেবায় ভক্তির

নেশা জমাইয়াছে, সেই আনন্দের প্রকৃতির প্রথম শাস্ত্রীয় নির্দেশ পাই বৃহদারণ্যকের ৬ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের ১২ পরিচ্ছেদে ; নির্দেশ আছে —সর্বেষাম্ আনন্দানাম্ উপস্থ একায়নমেবম্। যে কঠোর কর্কশ, জীবনে অপরিহার্য্য সত্য, তাহাকে নেশায় মাতিয়া ভুলিতে হইলে শারীরিক তৃপ্তির রসটুকুকে 'জিরেন কাটের' রস না করিয়া মত্ততার তাড়ি বানাইয়া নিতে হয়, আর নিছক্ ললিত-কোমলের সেবায় নিয়ত ললিত-লবঙ্গ-লতার কোকিল-কূজিত কুঞ্জে বাসা বাঁধিতে হয়। ইহাদের ভজিবার দেবতা কেলির লীলায় হয় vulgar ; তাহার আহ্বানে ভেরী বাজেনা, —বাজে কেবল কুঞ্জে কুঞ্জে মধুর বাঁশী। ভক্তের দেবতার সহিত সম্পর্কে সেই শ্রেণীর ভাবের উচ্ছ্বাস নাই, যাহা বিস্ময়ের গাম্ভীর্য্যে মনোহর বা sublime হইতে পারে। হাল্কা দেবতাকে অতি পল্কা ভাষায় অভিমানের নেকামিতে ডাকাই হইল ভক্তি-প্রকাশ বা আকাঙ্ক্ষার নিবেদন ; ভক্তের আত্মা বলিতেছে—আমি মরিব, মরিব, সখি !—যাহার উত্তরে সখীরা বলিবে—আহা, ষাট্, মরিবে কেন !

ভাবের অনুরূপে ইহাদের ভাষা মধুর হয় বটে, তবে যাহা নিরবচ্ছিন্ন 'মধুর-কোমল-কান্ত', তাহা জীবনের খাঁটি ভাষা নয়। শব্দগুলি যখন হয় একেবারে হাড়-বাছা বা কাঁটা-বাছা ও মাংস-পেশীর দৃঢ়তা শূন্য, তখন সে শব্দে প্রাণের যথার্থ ধ্বনি ফুটিতে পারে না। জেলি ফিশের মত থল্-থলে ভাষায় রচা সাহিত্যের ভোগ, অন্য গোটাকতক চিবাইয়া খাইবার ব্যঞ্জনের সঙ্গে চলিতে পারে, কিন্তু যাহা কেবল দাঁত এড়াইয়া (eluding the teeth) গলায় ঢুকিতে চায়, তাহা নিয়ত প্রিয় করা চলেনা। এটা মনস্তত্ত্বের অতি সোজা কথা যে, কঠোরতা ভুলিয়া মনকে নরমের মধ্যে ডুবাইতে হইলে কেবল প্রাকৃতিক স্নেহ-প্রেম, দয়া-দাক্ষিণ্যেই চলে

না ; কেন-না, তাহাতে দুঃখ-বিনোদনের চেষ্টার পরিশ্রম লাগে। কঠোর কর্মে বাধা দূর করিয়া অপরকে সুখী করিবার উদ্যোগে উৎসাহিত হইতে হয়। কর্কশকে এড়াইয়া নিজে কেবল মধুর রসে ডুবিতে গেলে, যে নেশা চাই বা ভক্তির মত্ততা চাই, তাহার রসটুকু ইন্দ্রিয়-লিপ্সা-লিশেষের স্পর্শে অথবা ইঙ্গিতে বেশি পাওয়া যায়। এই জন্য যৌন-লীলার ইঙ্গিত, উপমা ও রূপক কোমলতার সেবার সম্পূর্ণ উপযোগী। যাঁহারা বলেন —কুঞ্জ, বংশী, নৃত্য ও ভোগ কেবল রূপকে আধ্যাত্মিকতা বিকাশের জন্য, তাঁহারা কি স্বীকার করিবেন না যে যাহাকে নিদানপক্ষে কল্পনায় ঘাঁটিয়া আধ্যাত্মিকতার মাখন তুলিতে হয়, তাহা না ঘাঁটিলেই ভাল হইত? রূপক যে আরও দশ দিক্ হইতে সংগ্রহ করা যায়, তাহা অস্বীকার করিবার সাধ্য কাহারও নাই। অনুষ্ঠিত প্রথায় উজ্জ্বল নীল-মণি গড়িতে গেলে, কি গড়িতে গিয়া কি হইবে, তাহার যথেষ্ট আভাস দিয়াছি।

ছাড় রুদ্র-ভীতি, যাহাতে জন্মে দাসত্বের বুদ্ধি ও পশুত্ব ; ছাড় এই অসম্ভব চেষ্টা যে, জীবনের দুঃখ ও কঠোরতা এড়াইয়া পাইবে কেবল নিয়ত কোমলতার ভোগ। অতি শিশু বালকও অবিশ্রান্ত শক্তির বিকাশ করিয়া দাঁড়াইতে, চলিতে ও দৌড়াইতে শেখে। মানুষের শ্রেষ্ঠ সুখ যে সে নিয়ত পরিশ্রম করিয়া অর্জন করিবে, ও বাধা পায়ে দলিয়া শক্তিতে বর্দ্ধিত হইবে, আর অবিশ্রান্ত পরসেবায় রত থাকিয়া জীবনের আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া নিবে। এই খাঁটি সত্যের কথা প্রবন্ধগুলিতে আলোচনা করিয়াছি। জীবনের শক্তি, রুদ্রকে বিনাশ করিয়া বাড়াইতে হয়, আর জীবনের প্রফুল্লতা ও সরসতা বাড়ে সংযমে, কর্মে ও বিশ্ব-প্রীতিতে। দুঃখের ভয়ে ও রুদ্রের ভয়ে ভীতদের জন্য বলিতেছি—

দৈন্য যদি আসে আসুক্, লজ্জা কিবা তাহে ?
মাথা উঁচু রাখিস্।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য্য ধরে' থাকিস্।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস্ ;
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙ্গে
ঊর্দ্ধে দু'হাত বাড়াস্।

ধর্ম্মবুদ্ধি

১

আমরা ধর্মবুদ্ধি পাইলাম কোথায়

ইহা অসাধুতা উহা সাধুতা, এটা পাপ সেটা পুণ্য, একাজ অনুচিত সে কাজ উচিত—এ বুদ্ধি ও বিচার মানুষের মনে কোথা হইতে আসিল? মানুষে দেখে, এ বুদ্ধি ও বিচার শিশুদের মধ্যে গোড়ায় দেখা যায় না, আর শিশুরা বাপ-মায়ের বা অন্য অভিভাবকদের কাছে উহা শিখিয়া বাড়িয়া ওঠে; তাই অনেকের মনে এটা বিশেষ রকমের সমস্যা বা খট্‌কা যে, যখন প্রথম মানুষের সৃষ্টি হয়—যখন নূতন সৃষ্ট মানুষকে শিখাইবার মত মানুষ ছিল না, তখন শিশুর মত বুদ্ধির মানুষকে উচিত ও অনুচিতে প্রভেদ বুঝিবার বুদ্ধি দিয়াছিল কে?

জীবন-বিজ্ঞান (Biology) ধরিয়া যতদিন এ সমস্যার আলোচনা হয় নাই, ততদিন সকল দেশের লোকেই নানা কল্পনায় এই হেঁয়ালির সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যতদিন মানুষের জ্ঞানে এই সত্য প্রকাশ পায় নাই যে, "প্রায় মানুষের" জীবের বংশে মানুষের উৎপত্তি, আর "প্রায় মানুষদের" উৎপত্তি অন্য প্রাচীন জীব হইতে, ও সেই অন্য প্রাচীন জীব ও তাহাদের বংশকারক পূর্ব্ববর্তী জীবেরা ধীরে ধীরে গোড়াকার আঠার মত সন্নিবিষ্ট জৈবনিক নামক পদার্থ হইতে বাড়িয়া উঠিয়াছে, ততদিন কিছুতেই মনে করিতে পারে নাই যে, আদি মানুষ পাকা বুদ্ধি না নিয়াও যৌবন-পুষ্ট শরীর না পাইয়া কিরূপে পৃথিবীতে

উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। কি যে মানুষের ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল, কি যে তাহার কর্তব্য বা পরিহার্য্য, তাহা যদি মানুষের স্রষ্টা নিজে মানুষের সাথে সাথে ফিরিয়া না বুঝাইয়া থাকেন, তবে যে কোন উপায়ে আদি মানুষের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইত, তাহা প্রাচীনকালে কেহ ভাবিতে পারে নাই। বিনা বীজে যখন গাছ হয় না, আর গাছ না থাকিলেও যখন বীজ হয় না, তখন প্রাচীনের অলিখিত ও লিখিত তর্কশাস্ত্রে, বীজ আগে না গাছ আগে নিয়া বিচার চলিয়াছিল; আর সকল হেঁয়ালির সমাধানে মানুষে ধরিয়া নিয়াছিল যে, বিশ্বের সকল পদার্থ-ই এখন যেমন দেখিতে পাই, তেমনই আস্ত আস্ত ভাবে স্রষ্টা তাহাদিগকে গড়িয়াছিলেন, আর মানুষকে সর্বশেষে নিজের মানস হইতে পূর্ণ যৌবন দিয়া উৎপাদন করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালের এই যে বিশ্বাস—আদিম মানুষ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে স্রষ্টাকে আস্ত মানুষের মত প্রত্যক্ষ দেখিত, আর পদে-পদে স্রষ্টার নিষেধ বাণী শুনিয়া বিপদ এড়াইয়া ও নির্দেশ পালিয়া সুখে বাঁচিত, তাহারই ফলে সৃষ্টির সর্বাদি যুগটি সুখময় সত্যযুগ কল্পিত হইয়াছে, আর সত্যযুগে পালিত বলিয়া বিবেচিত বিধি নিষেধগুলি শাস্ত্রে বদ্ধ হইয়াছে মনে হওয়ায় পৃথিবীর সকল জাতিতেই অভ্রান্ত শাস্ত্র জন্মিয়াছে। একালে তুমি যদি স্পষ্ট বুঝিতে পার যে অমুক ব্যবহারে দোষ নাই অথবা অমুক খাদ্য খাইলে স্বাস্থ্যের হানি হয় না, তবুও অনেক প্রাচীন বিধি-নিষেধ তোমার মাথার উপর টিক্ টিক্ করিবে ও তোমাকে ইচ্ছামত কাজ করিতে দিবে না। তুমি যদি না শাস্ত্র বাণীর যুক্তিযুক্ততার প্রমাণ চাও, তবে হয় শুনিতে পাইবে—দিব্য জ্ঞানের প্রমাণ ধরা বুদ্ধির অতীত, আর না হয় কেহ তোমাকে টানিয়া-বুনিয়া একটা জোড়াতালির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শোনাইবে। যাঁহারা ব্যাখ্যা-

শোনাইয়া থাকেন, তাঁহারা চালাকি করেন না; নিশ্চয়ই প্রাচীনের সকল বিধি-নিষেধ অভ্রান্ত—এই দৃঢ় বুদ্ধিতে মানুষকে সৎপথে রাখিবার উপায় করেন। এখানে একথাটি মনে রাখিতে হইবে যে বহুযুগের অভিজ্ঞতায় মানুষ যাহা কল্যাণকর জানিয়াছে, কোন ব্যাখ্যা দিতে না পারিলেই তাহা অকল্যাণকর হয় না। তবে দুর্বোধ্য বা অবোধ্য বিধি-নিষেধ ধরিয়া না চলিয়া, মানুষের পক্ষে যে সুগম পথ ধরিয়া চলিবার উপায় আছে,—কেন যে সমাজে প্রচলিত অনেক রীতি-নীতি বল্শেভিকি গোঁয়ারতামিতে উড়ান যায় না, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আঠার মত ঘন সান্নিবিষ্ট যে জৈবনিক পদার্থ জীবমাত্রেরই শরীরের ভিত্তি, তাহা যখন নিম্নতম জীবরূপে জলে বিচরণ করিতেছিল (আর এখনও করে), সে জীবে আত্মজ্ঞান ছিল না ও নাই,—নিজের জাগ্রত ইচ্ছায় কিছু করিবার মত তাহার একটা মন ছিল না ও নাই। অতি সহজ প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় দেখা যায় যে, ঐ জীবের শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সে নড়ে-চড়ে, ও যাহা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে তাহার মধ্যে যাহা তাহার পুষ্টির উপযোগী খাদ্য, তাহা জীবের শরীরটি শুষিয়া নেয়, আর যাহা তাহার পক্ষে বিষ, তাহার স্পর্শে সঙ্কুচিত হইয়া বিষকে পরিহার করে। এই নিম্নতম জীবে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ নাই; এক একটি জীব যখন খাদ্যের জোরে পুষ্ট হয়, তখন দুইভাগে তাহার শরীরটি ভাঙ্গিয়া আলাদা আলাদা হয়, ও দুইটিই আবার বাড়িয়া উঠিয়া ঐরূপে বংশবৃদ্ধি করে। এখানে দেখা গেল যে, এই শ্রেণীর জীবের খাওয়ার কাজ হয় বিনা-বুদ্ধির রাসায়নিক আকর্ষণে, ও বংশবৃদ্ধি হয় শরীরে জাত বিনা-বুদ্ধির স্বাভাবিক ক্রিয়ায়।

কিরূপে ধীরে ধীরে ঐ আদি জীবের বংশে উন্নততর জীব ক্রমে ক্রমে জন্মিয়াছে, তাহার অল্পমাত্র পরিচয় দেওয়াও এখানে অসম্ভব।

এই ক্রমবিকাশ বুঝাইবার মত বই বঙ্গভাষায় আছে কিনা জানিনা। যে জীবের মধ্যে দেখা যায় যে একই শরীর ভাগ হইয়া দুইটি জীব হয়, তাহাদের ক্রমবিকাশে জাত উন্নততর জীবের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ দেখা যায়, কিন্তু সে জীবেও আত্মবোধ বা ইচ্ছাশক্তি নাই। এই উন্নততর জীবেরাও খাইয়া থাকে শরীরের রাসয়নিক আকর্ষণে উপযোগী পদার্থের প্রতি টানে পড়িয়া, আর সেইরূপ রাসায়নিক আকর্ষণেই কিছু না বুঝিয়া স্ত্রী-পুরুষে যোড়া বাঁধে ও বংশ রক্ষা করে। অজ্ঞানে জীবেরা তাহাই খাইতে পাইত যাহা তাহাদের খাদ্য ও তাহাই করিত, যাহা তাহাদের নিজের রক্ষার ও বংশ রক্ষার সহায়। কাজেই বহু উন্নত জীবে যে-সময়ে চৈতন্য ফুটিল, আত্মবোধ জাগিল, ও প্রবৃত্তির টানকে বুদ্ধির সঙ্গে জড়াইয়া নিজের "ইচ্ছা" রূপে পাইল, তখন সে জীবদের কি খাদ্য, তাহা বুদ্ধির বলে ঠিক করিতে হয় নাই; পূর্ববর্তীদের মধ্যে যাহা খাদ্য ছিল, তাহার অনেক পদার্থ ও স্বাভাবিকভাবে খাদ্য হইয়াছিলই, তাহা ছাড়া নূতন শরীরের নূতন রাসায়নিক আকর্ষণেও নূতন খাদ্য পাইয়াছিল। একজন বড় মার্কিণ সাহিত্যিক বেশ মজা করিয়া তাঁহার একখানি বইয়ে লিখিয়াছেন যে, যদি একটি শিশু বালক ও শিশু বালিকাকে একটি নির্জন দ্বীপের দুইদিকে দূরে দূরে ছাড়িয়া দিয়া বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইত, তবে দেখা যাইত যে যৌবনের সীমায় আসিবামাত্র তাহারা দুইজন দুইজনকে খুঁজিয়া পাইয়াছে ও হাতে হাত ধরিয়া বেড়াইতেছে ও প্রেম-সম্ভাষণ করিতেছে।

মানুষেরা যেসকল পূর্ববর্তী জীবদের বংশের মধ্য দিয়া বহিয়া আসিয়া মানুষ হইয়াছে, সেই পূর্ব-পূর্ব জীবদের সংস্কারে পাওয়া ও অভিজ্ঞতায় পাওয়া খাদ্য পদার্থ, গোড়ায় মানুষদের খাদ্য হইয়াছিল। কাজেই মানুষের খাদ্য কি ও যৌন সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝাইবার জন্য

পরমেশ্বরকে আস্ত মানুষের মত রূপ নিয়া গুরু সাজিয়া আসিতে হয় নাই। বিধাতার সৃষ্টিপদ্ধতি এমন একটা সুশৃঙ্খল বাঁধা নিয়মে চলিয়াছে যে, জীববিশেষের কালোপযোগী অভাব দেখিয়া তাঁহাকে নূতন বুদ্ধি ফাঁদিয়া নূতন কাজ করিতে হয় নাই। যাঁহারা স্রষ্টার সৃষ্টির গৌরব বাড়াইবার অভিসন্ধিতে স্রষ্টাকে বারে বারে বিচলিত হইয়া কাজ করিবার উপদেশ দেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বিধাতার গৌরবের হানি করিয়া তাঁহাকে বোকা সাজান। জৈবনিকের প্রাকৃতিক ধর্মে ও টানে যে, সকল কাজ চলিয়াছিল ও চলিতেছে, তাহা বুঝিলে ধর্মের হানি হয় না। সৃষ্টি করিতে করিতে পদে পদে পরমেশ্বর সৃষ্টিতে দোষ দেখিতে পাইতেছেন,—মানুষের অবাধ্যতা দেখিয়া চমকাইতেছেন,—পৃথিবীর উপরে দুষ্কৃতির ভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছেন, আর সেগুলি শোধরাইবার জন্য অবতার হইতেছেন, এসকল কথা কল্পনায় গড়িলে পরমেশ্বরকে করা হয় অতি ছোট জীব ও আহাম্মক। ক্রমবিকাশের তথ্যই ঈশ্বরের যথার্থ গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

জীবমাত্রেরই জীবনের উপাদান ও ভিত্তি জৈবনিক নামে সুসম্বদ্ধ পদার্থ; উহারই স্বাভাবিক প্রকৃতিতে ও ধর্মে আমাদের সকল শ্রেণীর জীব-লীলা ও ভাগ্য সম্পূর্ণ নিয়মিত ও শাসিত হইতেছে। আমাদের প্রবৃত্তি বলিতে যাহা কিছু আছে, চেতনা বলিতে যাহা কিছু বুঝি, ইচ্ছা-শক্তিরূপে যাহা অনুভব করি, সে সকলই জৈবনিকের লীলা। বর্বর হোক্ বা সভ্য হোক্, সকল মানুষের সামাজিক ক্রিয়ার ও পাপ-পুণ্যের ইতিহাস খুঁজিতে হইলে জৈবনিকের অপরিহার্য্য প্রকৃতির আলোচনা করিতে হয়। কিরূপে নানা শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে ও মানুষের মনে ধর্মবুদ্ধি জাগিয়াছে, তাহা জৈবনিকের প্রাকৃতিক টানের আলোচনা ছাড়া অন্য উপায়ে ধরা অসম্ভব। কি

কাজ করা উচিত, তাহা বুঝিবার একমাত্র শাস্ত্র—জীবন-বিজ্ঞানের (Biology) তথ্য যাহা বৈজ্ঞানিকদের তপস্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে।

উৎপত্তির ইতিহাস ও জীবের মৌলিক প্রকৃতি—নামে প্রবন্ধ দুইটিতে পূর্বে দেখাইয়াছি যে আমাদের শরীর-মনের একমাত্র ভিত্তি-স্বরূপ জৈবনিকের প্রধান প্রকৃতি ও ধর্ম এই, সে মরণ এড়াইয়া বাঁচিতে চায় ও প্রসারিত হইতে চায়। এই যে স্বতন্ত্রভাবে আপনার স্থিতি রক্ষা করিবার প্রাকৃতিক টান বা প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা, উহাই আমাদের সকল লীলার মূলে। এইজন্য প্রত্যেক ইচ্ছাবিশিষ্ট প্রাণীর ইচ্ছা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। ইচ্ছা ও বিচারবিহীন বনের লতা, আপনার আশ্রয়ের পাত্র গাছটিকে চাপিয়া মারিয়া আপনার বৃদ্ধি ও প্রসার চায়; বিচার-বিহীন মানুষের শিশু চেঁচাইয়া ও কাঁদিয়া যখন নিজের বৃদ্ধি চায়, তখন মায়ের বা অন্যের ক্লেশ বা অসুবিধা লক্ষ্য করে না,—যদিও মা ও অন্যেরা না থাকিলে তাহার বৃদ্ধি অসম্ভব। স্বার্থ রক্ষা করিবার যে প্রবৃত্তি, উহা অতি মৌলিক ও উহার বেগ সকল প্রবৃত্তির বেগ অপেক্ষা অধিক প্রবল। স্বার্থনাশ করিবার নামে যে একটা কথার ধুয়া আছে, উহা যে কিরূপ অসার ধর্মদ্রোহী ধুয়া, আর যথার্থ পরার্থপরতা যে স্বার্থ-সেবারই নামান্তর মাত্র, তাহা ধীরে ধীরে পরে দেখিতে পাইব।

শিশু স্বার্থপর, কিন্তু শিশুর প্রতি তাহার মায়ের স্নেহ আত্মহারা; এই আত্মহারা স্নেহ অথবা পরসেবার জন্য নিগূঢ় অনুরাগ যখন মৌলিক স্বার্থপরতার অনুরূপ নয়, তখন ইহার প্রকৃতি গভীরভাবে বুঝিবার প্রয়োজন। মায়ের এই স্নেহের টান যে অতি নীচের স্তরের জীবের মধ্যেও দেখা যায়,—যে জীবে আত্ম-চৈতন্য অথবা ইচ্ছাশক্তি নাই সে জীবেও যে দেখা যায়, তাহাই প্রথমে লক্ষ্য করিতে হইবে। পশু তাহার

শিশুকে দুধ খাওয়ায়, শিশুর গা চাটিয়া দেয় ও তাহাকে অন্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে, কিন্তু নিজের ক্ষুধার সময়ে তাহার খাইবার জিনিষটি শিশু খাইতে আসিলে সে তাহার শিশুকে তাড়াইয়া দেয়। সন্তান-প্রসবের সময়ে স্তনে দুধের সঞ্চার হয়, আর সেই দুধ শিশুকে দিয়া চোষাইয়া না নিলে মায়ের শরীরের উদ্বেগ ও অশান্তি জন্মে। ইচ্ছাশক্তিবিহীন পশুরা কলের মত শরীরের এই উদ্বেগ মিটাইয়া শিশুকে দুধ খাওয়ায়; অর্থাৎ শিশু যখন রাসায়নিক আকর্ষণে মায়ের দুধ চোষে, পশু মা—তখন দুধ চোষাইয়া সুখী হয়।

স্নেহের ব্যবহারের অন্য কাজগুলির মূলে প্রাণীদের শরীরের এক-প্রকার রসের ক্ষরণ আছে বলিয়া কিয়ৎ পরিমাণে ধরিতে পারা গিয়াছে। পরীক্ষা হইয়াছে উচ্চ শ্রেণীর পশুর শরীরে ও অল্প পরিমাণে মানুষের শরীরে। সন্তান-প্রসব আসন্ন হইবার সময় হইতে জননেন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কিত কোষ হইতে একরকম নূতন রসের ক্ষরণ হইতে থাকে। শিশু সঞ্চারের সময়ে ও পূর্বে ঐ কোষ হইতে যে শ্রেণীর রস বিশেষভাবে ক্ষরিত হয়, তাহা গর্ভ-পুষ্টির পর কোন-কোন জীবের শরীরে একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ও অন্য জীব শরীরে প্রায় বন্ধ হইয়া যায়, আর উহার পরিবর্তে নূতন একশ্রেণীর রসের ক্ষরণ হয়; খুব সম্ভব, সন্তান-প্রসবের পর হইতে এই নূতন রসের ক্ষরণ অধিক হয়, ও শরীর গর্ভ ধারণ করিবার উপযোগী না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ নূতন রসের ক্ষরণ চলিতে থাকে। কোন পশুতে বা মানুষে যদি দেখা যায় যে তাহার সন্তান পালন করিবার ও সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হইবার পক্ষে বাধা ঘটিয়াছে, আর তখন যদি অন্যশরীর হইতে উক্ত বর্ণিত রস সেই পশুতে বা মানুষে অনুপ্রবেশ করাইয়া দেখা যায় যে, পশু-বা মানুষ-মায়ের রাক্ষসী ব্যবহার ঘুচিয়া সন্তান-স্নেহ ফিরিয়া আসিতেছে, তাহা

হইলেই এই বর্ণিত রসের স্নেহ-বর্দ্ধনের ক্ষমতা সুপরীক্ষিত হয়। ঠিক এই পথ ধরিয়াই অনুসন্ধান চলিয়াছে, কিন্তু এখনও অস্বাভাবিক স্নেহ-বিমুখ জন্তুদের অধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই পরীক্ষা বেশি অগ্রসর হয় নাই। তবে শরীরের কোন রসের সঞ্চারের ফলেই যে স্নেহপ্রবণতা জন্মে, তাহা অনেক পরোক্ষ প্রমাণে ধরা পড়ে। প্রথমে ত দেখা যায় যে আত্মবোধ প্রভৃতি যাহাদের নাই সে সকল জীবেও সন্তানকে কিছুদিন কাছে টানিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি থাকে ও নূতন সন্তান ধারণের সময় হইলে সেই আকর্ষণ চলিয়া যায়। তাহার পর দেখা গিয়াছে যে, ভ্রূণের ফুলের গায়ে এক রকম রস জন্মে, তাহা যদি কোন যৌবনপথে অগ্রসর কুমারীর শরীরে অনুপ্রবেশ (inject) করা যায়, তবে স্তনে দুধ জন্মে, দুধ চোষাইবার প্রবৃত্তিও জন্মে ও একটু-খানি বিশেষভাবে কুমারীর মন কচি শিশুর প্রতি বেশি স্নেহপ্রবণ হয়। এখানেও স্তনে দুধ-সঞ্চার হইবার সময়ে জননেন্দ্রিয়ের সহিত বিশেষ-ভাবে সম্পর্কিত অন্তর্মুখী যন্ত্রে (endocrine gland-এ) অল্প পরিমাণে রস-ক্ষরণের পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পরীক্ষা এখনও সুস্পষ্ট না হইলেও নীচের স্তরের বহু জীবের দৃষ্টান্তে অসঙ্কোচে বলা চলে—স্নেহের টান, শরীরের এক প্রকার ব্যগ্রভাব ও উদ্বেগ দূর করিবার ও আপনাকে শান্তিতে রাখিবার টান। স্নেহের রসের এই ব্যাখ্যায় কবিতার রস তেমন অধিক নাই, তবে কবিতার রসের নির্ঝর যখন অন্তর্মুখী glandএর রসের ধারায়, তখন এ রসের ইতিহাস উপেক্ষিত না হওয়া উচিত।

স্নেহের আকর্ষণ সম্বন্ধে এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিয়াই মানুষের অন্যদিকের সামাজিক আকর্ষণের কথা বলিব ; সেই প্রসঙ্গেই প্রেম ও স্নেহ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে।

মানুষের শিশুরা অন্যান্য জীব-জন্তুর শিশুদের মত অতি অল্প সময়েই স্বাধীন হইয়া চলিতে-ফিরিতে পারে না,—অনেক বৎসর ধরিয়া অভিভাবকদের রক্ষণে ও পালনে বাড়িতে হয়। সকল জন্তুর পক্ষেই আপন শ্রেণীর জন্তুদের সঙ্গে অল্পবিস্তর দল বাঁধিয়া বাস করার প্রয়োজন আছে; এই প্রয়োজন মানুষের পক্ষে অতি অধিক। সংস্কৃত ভাষায় মানুষের মিলিত দলের নাম, সমাজ আর অন্য জন্তুদের দলের নাম 'সমজ'; পশুদের আকারহীন সমজ মানুষের সমাজের তুলনায় সত্যই পূর্ণ আকারবিহীন, অর্থাৎ সুশৃঙ্খলায় বদ্ধ নয়।

শৈশব হইতেই মানুষের শিশু এই জ্ঞানে ও শিক্ষায় বাড়িয়া ওঠে, যে প্রতি পদে পরের সঙ্গ ও সাহায্য ছাড়া তাহার পক্ষে বৃদ্ধিলাভ ও সুখ-সুবিধা ভোগ অসম্ভব। নানা দৃষ্টান্ত দিয়া এই সোজা কথাটা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই যে, ষোল আনা নিজের স্বার্থ বজায় রাখিয়া বাড়িতে হইলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজন, যে সে পরকে বাঁচাইয়া চলে, অর্থাৎ পরের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলে। এখানে পরের স্বার্থ বজায় রাখিবার প্রবৃত্তি, সম্পূর্ণরূপে নিজের স্বার্থ-রক্ষার বুদ্ধিতে জন্মে; এখানে সুবিকশিত ও বিস্তৃত স্বার্থের নামই পরার্থপরতা। বহু যুগের অবিরত অভ্যাসে এই শ্রেণীর পরার্থপরতা যখন সংস্কারবদ্ধ হইয়াছে, তখন এই পরার্থপরতাকে স্বার্থ হইতে আলাদা বলিয়া মনে হইবে। এই দিক ধরিয়া অল্প একটু ভাবিলেই বোঝা যাইবে যে, মানুষের সমাজ যতই সংখ্যায় ও প্রসারে বাড়িতে পায় ততই সমাজের লোকেদের পক্ষে পরকে সহিবার ও পরের উপকার করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া ওঠার সম্ভব হয়। অন্য দিকে যে-সমাজ যত ছোট ও কোণঠেসা থাকিবে, নিজেদের সমাজের মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক স্বার্থ থাকিবে, যতই নিজেদের দলের সকলের

সঙ্গে সমানে মেলামেশার বাধা থাকিবে, ততই পর-বাদ সহিবার ক্ষমতা ও পরের উপকার করিবার প্রবৃত্তি কম জাগিবে। এ অবস্থায় ঠিক ধরিতে পারা যায় যে, পরকে সহিবার ও উপকার করিবার প্রবৃত্তি কেতাবি উপদেশের মন্ত্র আওড়াইয়া অভ্যস্ত হয় না,—ঐ প্রবৃত্তি জাগে, বাড়ে ও সংজ্ঞাবদ্ধ হয় শুধু নানা মানুষের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া স্বার্থরক্ষা করিবার চেষ্টায়। সমাজবৃদ্ধির এই নিয়ম লক্ষ্য করিয়াই একদিন ফরাসী পণ্ডিত কোম্‌ৎ লিখিয়াছিলেন—Man grows more and more religious as his society goes on expanding. মানুষ যাহা ঠেকিয়া শেখে ও নিজের স্বার্থের টানে যাহা করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহাই তাহার সংজ্ঞাবদ্ধ হয় ও অভ্যস্ত পুণ্য কর্ম হইয়া চরিত্রে ফুটিয়া পড়ে।

সাধু প্রবৃত্তি সংজ্ঞাবদ্ধ হইয়া মৌলিক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মত ফুটিবার কয়েকটি ছোট দৃষ্টান্ত দিতেছি। ওড়িষা ও মধ্য-প্রদেশের বনে ও পাহাড়ে এমন অনেক জাতি আছে, যাহারা একদিকে সংখ্যায় অল্প ও অন্য দিকে নিকটস্থ জাতির লোকদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য। এই সকল জাতির লোকদের মধ্যে ও সে অঞ্চলের অনেক হিন্দুজাতির লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন সংক্রামক রোগ দেখা দিল আর দু-চারজন লোক মরিল, অমনই সমাজের অন্য লোকেরা একেবারে এক বন ছাড়িয়া অন্য বনে পলাইয়া গেল, আর যতদিন মৃত শবগুলি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া না গেল ও বৃষ্টিতে স্থানটি ধুইয়া না গেল, ততদিন পলাতকেরা সে বনে বা গ্রামে ফিরিল না। যে সকল স্থানে লোকেরা কাছাকাছি ঘর বাঁধিয়া বাস করে, সেখানে একের ঘরে আগুন লাগিলে আর দশজন আসিয়া খুব যত্ন করিয়া আগুন নিবায়; নিজেদের ঘর বাঁচাইবার জন্য যে দশে

মিলিয়া এ কাজ করে, তাহা স্পষ্টভাবে লোকদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

নিশ্চয়ই একদিন সকল সমাজেরই এই দশা ছিল। সমাজ সঙ্কীর্ণ না থাকিয়া যেখানে আঁটাসাঁটা রকমে উহার প্রসার বাড়িয়াছে, সেখানে কি পদ্ধতিতে পরের উপকার করিবার প্রবৃত্তি স্থায়ী হইয়াছে, তাহা অল্প আয়াসেই বুঝিতে পারা যায়। সংক্রামক রোগগ্রস্ত লোককে যদি যত্নে আলাদা না রাখা যায়, যদি রোগীর রোগকে বিনাশ না করা যায়, তবে রোগটি সকলকে অথবা অনেক লোককে যে সংহার করিতে পারে, তাহা অনেক লোকে নিশ্চিত বুঝিয়াছিল। সেই জন্য গোড়ায় পরকে যত্ন করিয়া বাঁচাইয়াছিল ও রোগের মূল নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। একদিনের এই স্বার্থপ্রণোদিত বুদ্ধির কাজ বহুদিন ধরিয়া সংজ্ঞাবদ্ধ হইবার পর মানুষেরা নিজের কাজে স্বার্থের কোন গন্ধ বা সাড়া না পাইয়াই সর্বসাধারণের জন্য হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করিয়া থাকে। এখন দুর্ভিক্ষ-মহামারী প্রভৃতির দিনে আমরা স্বার্থত্যাগের কথা বলি, ও অনেককে সাধারণ বিপদের সংবাদ পাইবামাত্র হিতৈষণার জোরে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখি; ইহা যে স্বার্থে প্রবর্তিত ও অনুষ্ঠিত কর্মের ফলে সংজ্ঞাবদ্ধ সাধুতা, তাহা ধরিতে পারি না। গোড়ায় অ-আ, ক—খ চিনিয়া বই পড়িতে শিখি, কিন্তু পড়ার অভ্যাস পাকা হইলে মনে হয় না যে আমরা বর্ণমালা চিনিয়া ও জুড়িয়া বই পড়িতেছি।

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ উন্নত না হইলে ও সকল প্রদেশগুলি একতায় গাঁথা না পড়িলে যে, কোন প্রদেশ-বিশেষ উন্নত বা স্বাধীন হইতে পারে না, অর্থাৎ আমার একার অবাধ উন্নতির জন্য যে সারা ভারতের উন্নতির প্রয়োজন, ও আমাকে যে প্রাদেশিক না করিয়া ভারতবাসী করিবার প্রয়োজন, আমাদের মনে অল্পবিস্তর সে বোধ না

জন্মিলে, অর্থাৎ দেশের কাজে যে প্রতিলোকের গভীর স্বার্থ আছে, তাহা খানিকটা অনুভব করিতে না পারিলে দেশের উন্নতির জন্য ব্যগ্রতা জন্মিতে পারে না। বড়-বড় কথার মন্ত্র গাঁথিয়া যাঁহারা কংগ্রেস করেন, তাঁহারাই যখন এ-সম্প্রদায় বা সে-সম্প্রদায়ের স্বার্থের কোলাহল তোলেন, আমাদের বিহার বা আমাদের ওড়িষা বলিয়া অপরের সঙ্গে ঝগড়া করেন, তখন স্পষ্ট বুঝি যে আমাদের বিস্‌মোল্লায় গলদ আছে। ধোঁয়াটে কবিতায় ভাবের ক্ষণিক উত্তেজনা খাটাইয়া "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র জপাইয়া কাহারও মনে দেশের কাজের জন্য খাঁটি অনুরাগ জন্মান অসম্ভব। মানুষ যদি খুব ঠাণ্ডা মাথায় আপনার স্বার্থ বুঝিয়া নিতে না পারে, তবে কোন কাজের দিকেই মনের স্থায়ী বেগ বাড়ে না। কবিতার বস্তু—নিরপেক্ষ কল্পনায়, অথবা দশের কোলাহলের দঙ্গলের উত্তেজনায়, অথবা পরের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধির ছট্‌পটানিতে মানুষ কখনও স্থিরবুদ্ধিতে স্থায়ী স্বার্থ বুঝিতে পারে না, আর স্বার্থের টান না জন্মিলে কখনও পাকা কাজ হইতে পারে না। স্বার্থের বুদ্ধিই যে খাঁটি কাজের বুদ্ধি, আর উহা যে গোলমালে হরিবোল দিয়া বাড়ে না, তাহা পরে পরে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইবে।

স্বার্থত্যাগ নামে যে একটা মধুর বাণী চলিত আছে, উহার মত অতি বড় মিথ্যা কথা অল্পই পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি আপনার মুক্তির স্বার্থের বিচারে বুঝিয়াছে যে এই সংসারটা বিষের ভাঁড়, আর গায়ে ছাই মাখিয়া মন্ত্রবিশেষ জপ করিলেই খাঁটি স্বার্থ হাঁসিল হইবে, তখন তাহার সংসার ছাড়ার কাজে কোন ত্যাগ নাই; তোমার চোখে যাহা ছাই-ভস্ম, তাহাই ঐ লোকের বিচারে ছেঁড়া কাপড় ছাড়িয়া ভাল নূতন কাপড় পরা। বাঁচিয়া যেখানে একজন মানুষের কাছে নিরন্তর জ্বালা ও ছট্‌পটানি ভোগ, সেখানে সে তৃপ্তি খুঁজিয়াই মরণে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

যে অবস্থায় থাকা তোমার বিচারে সুখের, সে অবস্থা যাহার কাছে অসুখকর,—অথবা যে ব্যক্তি বিজনে আরাম লাভ অপেক্ষা দশজনের কাছে নাম পাইয়া যশস্বী হইবার জন্য অধিক লোলুপ, সে যখন তোমার বিচারের সুখের ভোগ ছাড়ে, তখন তাহার কাছে 'ত্যাগ' নাই,—'গ্রহণ'ই আছে। Victor Hugo রচিত Toilers of the Sea গ্রন্থে একজন কাপ্তেনের চরিত্র আছে, যে কাপ্তেন আপনার দুষ্কৃতির দুর্নাম ডুবাইয়া মরণের পর যশস্বী হইবার লোভে ছল করিয়া জাহাজ ডুবাইয়া মরিয়াছিল। মানুষ তৃপ্তি পাইতেছে স্বার্থের সাধনায়, স্বার্থত্যাগ করিয়া নয়। স্বার্থের টান মানুষের জীবন-ধাতুর মৌলিক টান ; প্রত্যক্ষ হোক্, অপ্রত্যক্ষ হোক্—ঐ টানেই আমাদের সামাজিক স্থিতি চলিয়াছে।

ধর্মবুদ্ধি

২

কর্তব্যের পথ

শরীর পুড়িয়া ছাই হয়—না হয়, মাটিতে মিশিয়া মাটি হয় ; এই ছাই-ভস্ম ও মাটির গড়া শরীরের প্রাকৃতিক টানে বা রাসায়নিক ক্রিয়ায় আমাদের কর্তব্য-বুদ্ধি জাগে ও কর্তব্যনিষ্ঠা বাড়ে—ইহা মানিতে গেলে অনেকের ঘৃণা জন্মে ও লজ্জা হয়। চেতনার অধিকারী মানুষ, পাথর-মাটি প্রভৃতি জড় পদার্থ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নিজের কাজের জিনিস গড়ে ও পায়ে দলাইয়া চলে। তাই চেতন মানুষ ভাবিতে শিখিয়াছে—জড় অতি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য। সে তাহার কুলীনত্ব বজায় রাখিতে চায় এই চিন্তায় যে তাহার চৈতন্যে জড়ের দেওয়া কিছু নাই ; সে ভাবে যে সে অজড়, চৈতন্যরূপী, আর চৈতন্যের কর্তাগিরিতেই সে জড় শরীরকে নিজের কাজে চালাইতেছে ; আবার অন্যদিকে সে যদি কিছু করে, তবে হইবে তাহার পক্ষে জড়ের সেবা করা, পাপ কর্ম করা অথবা পাজি সয়তানের চালনায় কাজ করা। কোথা হইতে আসিল এই সয়তান, কে রচিল এই জড়—তাহা সে বোঝেনা ও বুঝিতে চায় না। জড়ের রহস্য তাহার কাছে যদি অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত, তবে সে কি সাহসে ও মূঢ়তায় নিজের চৈতন্যের ও ঈশ্বরের গৌরবের পাহারাওয়ালা সাজিয়া ঈশ্বরের সৃষ্ট এই জড়নামে পরিচিত পদার্থকে তুচ্ছ ও ঘৃণ্য মনে করে! মানুষ যেন ফুঁ দিয়া ধূলা উড়াইতে গিয়া নিজের চোখে ধূলা পূরিয়া অন্ধ হইতেছে।

নিজেদের আত্মার কাল্পনিক কুলীনত্বের অভিমানে অনেকে মানিতে চায় না যে, স্রষ্টা আমাদের শরীরের আঁতে-আঁতে এমন সব পদার্থ গুঁজিয়া দিয়াছেন, যাহাদের বিকাশে ও প্রভাবে জীবনের আদর্শের দিকে মানুষ বাড়িয়া উঠিতে পারে। অন্ধকারের লতা যেমন ফাঁক পাইলেই আলোকের দিকে ঝুঁকিয়া জীবন বাড়ায়, মানুষও সেইরূপ প্রাকৃতিক টানে যাহা জীবনে প্রার্থনীয়, যাহা জীবনের ধর্মে প্রার্থনীয়, সেইদিকে বাড়িয়া ওঠে বা বাড়িয়া উঠিতে পারে।

কে কবে মরিব, জানি না, আর মরিতে যে হইবেই, তাহা আমরা নিশ্চিতই জানি ; তবুও যতখানি পারি শরীরকে সুস্থ রাখিয়া চলি আর জীবলীলা যত অল্পদিনের হইলেও নিরন্তর জ্ঞানে ও পুণ্যে বাড়িয়া উঠিবার জন্য ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া অশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছি। ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের আছে এই গভীর বিশ্বাস। জীবনের প্রকৃতির ফলে সাজিয়া-গুজিয়া যখন তর্ক করিতে বসি, তখন হয়ত বলিতে ছাড়ি না যে এই অস্থায়ী জীবনের উপর বিশ্বাস নাই আর বাঁচিয়া থাকিলে বিশেষ কিছু ফল হইবে, তাহা নয় ; একথাও বলি—ঐ যে অজানা ভবিষ্যৎ যাহার গর্ভে আছে মরণ, সে আমাদের জীবদ্দশায় হয়ত বা দুঃখের যাঁতায় পিষিতে পারে। কিন্তু যখন মনে তর্ক ওঠে না, আর চলি আমাদের জীবনের প্রাকৃতিক টানে, তখন আমরা যেন নিজেদিগকে অজর-অমর ভাবিয়া অর্থ ও বিদ্যা উপার্জন করিয়া চলি ; আর অজানা ভবিষ্যতের উপব যে গভীর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিতেছি, পদে-পদে তাহার পরিচয় দিয়া থাকি। অনেকবার যে দৃষ্টান্তটি দিয়াছি, তাহার আবার উল্লেখ করি। যে বুড়া সর্বদা মনে করে—তাহার দিন ফুরাইয়াছে, সে দুর্বল হস্তে যখন নারিকেলের গাছ পোঁতে, তখন বহু বৎসরের পরে নিজে তাহার ফলভোগের প্রত্যাশা না করিয়াও ভবিষ্যতে বাড়িবার জন্য

গাছ লাগায়। এই যে ভবিষ্যতের প্রতি গভীর আস্থা, ইহা আমাদের আয়তনের উপাদানের ফলে ঘটে। রাসায়নিকের কাছে সে উপাদান ত Colloidal Substance মাত্র; সেই পদার্থের মধ্যে ঐ যে আছে জীবন-গতির গভীর টান ও নিগূঢ়ভাবে ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা, আমরা সে গুণ বা ধর্ম প্রত্যক্ষ করি—তাহার অন্য মানে জানি না। ঈশ্বর অর্থে, খোদা অর্থে ও সেই খোদার সৃষ্টি অর্থে যাহাই বোঝ না কেন, একথা নিশ্চিত—উপাদানের ঐ ধর্ম রহিয়াছে সৃষ্টির অনাদি গতিতে, অর্থাৎ খোদার কুদ্‌রতে।

সত্য বটে আমরা চেতন জীব, আমরা আপন-পর বুঝি,—বুদ্ধির বিচারে ভাল-মন্দ বুঝিয়া কাজ করিতে পারি। তবে দেখিতে পাইতেছি, একদিকে আমাদের প্রকৃতিতে আছে অবিচারে-জন্মা ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা ও অনুরাগ, যাহা জীবন রক্ষার টানের মত প্রবল; আবার এই জীবনের আর একদিকেআছে অপরের প্রতি আকর্ষণ। এই আকর্ষণ আর আকর্ষণের মূল শিকড়ও যে, শরীরের উপাদানের মধ্যে গোঁজা আছে, তাহাও বুঝিয়া নিতে হইবে। বহুবার বলিয়াছি, তবুও আবার বলিব, আমাদের আত্ম-স্বার্থ হাঁসিল হয়না—যদি পরকে না বাঁচাই, পরের স্বার্থ রক্ষা না করি। আমরা জন্মি মায়ের কোলে, বাড়িয়া উঠি দশজনের সঙ্গে মিলিয়া, আর যতই পৃথিবীর অধিক লোকের সঙ্গে মিলি, ততই জ্ঞানে ও ক্ষমতায় বড় হই। বিচার-শক্তিহীন চেতন শিশু রাসায়নিক টানে আকৃষ্ট হইবার মত পরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া নিজের জীবন বাড়াইয়া বাঁচে। শিশু utility না গণিয়া অথবা অল্পের তুলনায় অধিকের সুখ রক্ষার দিকে না ঝুঁকিয়া, বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক টানে পরের দিকে ঝুঁকিয়া পরের প্রতি অনুরাগ বাড়ায়। যখন বুদ্ধি খাটাই তখন ভাল-মন্দের বিচার করিয়া কাজ করি বটে, কিন্তু আমাদের খাঁটি

প্রকৃতির মধ্যে আছে সেই আকর্ষণ ও অনুরাগের মূল শিকড় যাহার প্রভাবে কি-ভাল ও কি-মন্দ তাহা অতর্কিতে বিচার করিবার ঝোঁক জন্মে, আর এই ঝোঁক মূল প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইলে কর্মে উৎসাহ জন্মে, অর্থাৎ কর্মের জন্য প্রেরণা পাই। এই বিচারে বলিতে পারি যে যাহাকে বলি Conscience বা বিবেক, তাহার মূল শিকড়টি বুদ্ধির বিচারে গড়া নয়। শারীরিক অবস্থার এই প্রকৃতিটুকুতে নিহিত আছে সৃষ্টির যে অচ্ছেদ্য নিয়ম, অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিমা বা খোদার কুদ্‌রতি, তাহা এ দৃষ্টান্তে স্পষ্ট হইলেও ইতর জীব-শরীরের কথা অতি অল্পে বলিব।

যেসকল জীব চেতন হইলেও আপন-পরের সংজ্ঞা পায় নাই, তাহাদের দৃষ্টান্ত দিতেছি। যাহাদের শরীর খানিকটা আঠার ডেলার মত এক ছাঁচে ঢালা, আর যাহাদের নানা ইন্দ্রিয় জন্মে নাই, নিজেদের জাতির অপরের সঙ্গে মিলিবার তাহাদের কোন প্রয়োজন নাই ; কেন-না, তাহাদের বিবাহ নাই আর বংশ-বৃদ্ধি হয় কেবল এক-একটি জীবের নিজের শরীর বিভক্ত হইয়া। ইহাদের প্রত্যেক জীব রাসায়নিক আকর্ষণে খাদ্য শরীরস্থ করে ও বাড়ে। যখন শরীরের টানে বা প্রবৃত্তিতে এই জীবেরা চলিতে ফিরিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের চেতনায় এই সংজ্ঞা জন্মে না যে তাহারা ঐ চলা-ফেরার কাজ করিতে চাহিতেছে ; কাজেই কাজ করিতে 'ইচ্ছা' হইতেছে, এই ভাব জন্মেনা। তবে চলিতে-চলিতে যদি এমন স্থানে যায়, যেখানে জীবন-নাশের অবস্থা আছে, তখন প্রাকৃতিক টানে তাহারা কোঁচ্‌কাইয়া পড়ে ও জীবন-রক্ষার অনুকূল দিকে তাহাদের গতি হয়। অর্থাৎ নিরন্তর বাঁচিয়া থাকিবার টান বা প্রবৃত্তি উহাদের শরীরের মূলে নিগূঢ়ভাবে রহিয়াছে।

এই অতি আদিম জীবেরাও সামাজিক প্রয়োজন না থাকিলেও দলে দলে একস্থানে থাকিয়া বাড়ে। যেখানকার সমুদ্রের জল এই জীবদের বাড়িবার অনুকূলে, তুমি যদি সেখানে একটি জীবকে দল-ছাড়া করিয়া রাখ, তবে দেখিবে—দু-তিন পুরুষ ধরিয়া বাড়িবার পরেই সমুদ্রের জলের অবস্থা অনুকূল থাকিলেও বংশ বাড়াইয়া বহুদিন বাঁচিতে পারে না। ইতর প্রাণীদের সকলের পক্ষেই যে, বাঁচিবার ও বাড়িবার এই নিয়ম আছে, তাহা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। সকল শ্রেণীর প্রাণীদের ইতিহাস সাক্ষী দিতেছে যে সকলেই (ইচ্ছার সংজ্ঞা না থাকিলেও) মরণ এড়াইয়া বাঁচিবার অনুকূল পথে চলিতেছে। দ্বিতীয়ত দেখিতে পাই যে, আপনাদের দলের প্রাণীদের সঙ্গে যত এক হইয়া বাড়িতে পারে, ততই ইহাদের জীবন-বৃদ্ধি ও সুখের অবস্থা প্রশস্ত হয়। বিনা বিচারেই, বুদ্ধির বিনা সাহায্যেই পরকে টানিয়া আপন করিবার ঝোঁক বা প্রবৃত্তি সারা জীবসৃষ্টির মধ্যে শরীরের উপাদানে অচ্ছেদ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারা যায় যে কি কারণে আত্ম-সংজ্ঞাবিশিষ্ট ও বিচারশক্তি-প্রাপ্ত উন্নত মানুষেরা অনুভব করে যে তাহারা যে কাজ করিতে ইচ্ছা করে, অথবা বিচার করিয়া স্থির করে যে—কাজটি করা উচিত, তাহার পিছনে বা উপরে একটা অবোধ্য ভাব টিকৃটিক্ করিয়া কাজে বাধা দিতে চাহিতেছে। অর্থাৎ বুদ্ধির বিচারের উপরেও একটি অবোধ্য প্রাকৃতিক ভাব আছে, যে ভাবটি মনের মধ্যে বিধি-নিষেধের প্রচার করিতেছে। এই বুদ্ধি নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক আকর্ষণজাত ভাবকে আমরা Conscience বা বিবেক নাম দিয়াছি। এই যাহাকে বলি বিবেক, তাহা বুদ্ধির বিচারে পরিষ্কার হয় ও বাড়ে বটে, তবে উহার মূল অবোধ্য প্রাকৃতিক টানের মধ্যেই রহিয়াছে।

এই যে আছে প্রাণ বাঁচাইয়া চলিবার গভীর অনুরাগ, অজানা ভবিষ্যতের উপর নিগূঢ় আস্থা রাখিয়া জীবন-পথে চলা, পরকে আপন করিয়া বাড়িয়া উঠিবার ঝোঁক, আর অহিত পরিহার করিয়া হিতকে অবলম্বন করিবার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ কর্তব্য পালন করিবার জন্য প্রাণের মধুর আকর্ষণ, উহার ভিত্তি বা অচ্ছেদ্য মূল রহিয়াছে আমাদের আয়তনের প্রকৃতির মধ্যে। বলিতে পারি, আমাদের জীবন যে উপাদানে ও ছাঁচে গড়া, আমাদের কর্তব্যবুদ্ধি সেই উপাদান ও ছাঁচের মধ্যে ঢালাই করা। এত নিগূঢ় বলিয়াই মানুষেরা সাধারণ অবস্থায় বুঝিতে পারে না—কোথা হইতে পাইল তাহারা তাহাদের এই কর্তব্য-বুদ্ধি।

আমরা বিকসিত হইয়াছি বা জন্মিয়াছি, সেই সকল গুণ বা ধর্মের বীজ বহিয়া, যাহার বৃদ্ধির জন্য আমরা লালায়িত ও সচেষ্ট। যাহা আমাদের ধাতে বা ধাতুতে নাই, তাহা আমরা একটা হঠাৎ অবতার বা দৈবে-জন্মা গুরুর কাছে পাইয়া আমাদের ধাতে নূতন ধাতু মিশাইব, অথবা বুদ্ধি-বিবেচনা করিয়া নূতন ধাতুর আমদানি করিব ও সেই আমদানির ফলে পরসেবা করিতে বসিব—এরূপ অবস্থা যদি সৃষ্টির ব্যবস্থায় না হইয়া থাকে, অর্থাৎ আমাদের প্রাপ্য গণ্ডা পাইবার সুবিধা যদি আমাদের মৌলিক ধাতুতেই থাকে, তবে বিধির বিধান দোষের হয়না—বরং গৌরবময় হয়। আমাদের জীবনের বিকাশে প্রতিপদে যদি নূতন আমদানির অপেক্ষা থাকিত, তবে স্রষ্টাকে বোকা ও আহাম্মক সাজাইতে হইত। বিধাতা বা স্রষ্টা যেন আমাদের আয়তন গড়িবার বা আমাদিগকে গড়িবার সময়ে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—আমাদের বাড়িবার জন্য কি-কি চাই; তাই যেন ভুল শোধ্রাইবার জন্য সময়ে সময়ে 'ঐ যা!' বলিয়া, হয় নিজে মানুষের কাছে আসিয়া, নয়—একটা হঠাৎ অবতার পাঠাইয়া

চলার পথ ঠিক করিয়া দিতেছেন। একথা মানিলে বিধাতাকে করা হয় তাহা আহাম্মক। লোকসাধারণে ভাবিয়া পায়না—ভাবিয়া পাওয়াও বড় কঠিন, কেমন করিয়া তাহাদের মনে হিত ও অহিতের বুদ্ধি জন্মে ও সুপথে চলিবার প্রবৃত্তি জাগে; তাই তাহারা কল্পনায় স্থির করিয়াছিল যে, আদিম মানুষকে বা আদমকে সুপথে চালাইবার জন্য ঈশ্বরকে স্বর্গ ছাড়িয়া মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে হইয়াছিল। আবার অন্যদিকে মানুষেরা দেখিত যে, সমাজে বহুলোকের মধ্যে অল্প দুই-চারিজন হয় বুদ্ধিমান, আর বুদ্ধিমানেরাই হয় সমাজের চালক। সেই অনুভবে অবোধেরা কল্পনা করিয়াছিল যে, প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের সমাজ চলে নাই ও সমাজকে চালাইবার জন্য এক-একজন অতি প্রাকৃত মানুষ বা অবতার লোকহিতে দেখা দিতেন। সাধারণ অবোধদের বিশ্বাস—যুগে যুগে পরমেশ্বর নিজের ভুল শোধরাইবার আগ্রহে অবতার পাঠান্, আর সেই অবতার না কি বলেন—ধর্মের রক্ষার জন্য ও পাপ, দুষ্কৃতি প্রভৃতি বিনাশের জন্য তিনি যুগে-যুগে দেখা দিবেন। 'সম্ভবামি যুগে যুগে' নাকি তাঁহার মুখের বাণী।

এই কু-কল্পনার ফলে এই পৃথিবীতে পাপের ভার অপেক্ষা হঠাৎ-জন্মা গুরুভার অতিমাত্রায় বাড়িয়াছে। যখনই এই ভুল ধারণা জন্মিবে যে, ধর্মের তত্ত্ব অজানা গুহায় নিহিত, আর যখনই কর্তব্যপথে চলার নামে দৈবে-গড়া মহাপুরুষ বা মহাজন খুঁজিবে, তখনই বুদ্ধি হইয়া আসিবে আড়ষ্ট, আর নিজের অনুভবে নিজের অনুষ্ঠান ভাল বলিয়া না বুঝিয়া কেবল পরের মুখেই ঝাল খাইতে থাকিবে। অমুকে বলে বা অমুক বইয়ে আছে যে, ইহা পুণ্য কর্ম, কিন্তু সেটি যে তোমার প্রত্যক্ষ অনুভবের কিরূপ অভাব ঘুচাইবার উপযোগী তাহা না জানিয়া যদি অবর্ণিত পুণ্য লাভের জন্য কাজ কর, তবে সে পুন্নি হইবে অতি অবোধ্য

'নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ', আর তোমার কর্ম হইবে বুদ্ধিহীনের নিরর্থক কর্ম। ভুল দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইলেই দেখিতে পাইবে অর্থাৎ অনুভব করিবে—অতি বহু পরিমাণে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত হইলেও বিশ্বে ও প্রাণে ঈশ্বরের প্রকাশ উজ্জ্বল, আর আমাদের আঁতে-আঁতে গুঁজিয়া দেওয়া কর্তব্যের প্রেরণা অতি স্পষ্ট।

উত্তরাধিকার বা Heredity

১

জন্ম, কর্ম ও পরিবেষ

[জাতিভেদের ইতিহাস আলোচনার আগে Heredityর ফল অর্থাৎ দোষ-গুণের বংশ-সংক্রমণের বিষয় আলোচনা করিতেছি, কারণ এই মতের সূত্র ধরিয়া অনেকে জাতিভেদ সমর্থন করেন]

লোকে বলে—যাহার যাহা কপালে থাকে, তাহাই ঘটে; বিধিলিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। মহাভারতে আছে "বিধাত্রা বিহিতং মার্গং ন কশ্চিদধিবর্ত্ততে।" জীবনে যাহা ঘটে, তাহাই অজানা ভাগ্যের ফলে বা 'অদৃষ্ট'-এর ফলে ঘটিল বলিলে কিছুই বুঝিতে পারা গেল না,—কিছুই বুঝাইতে পারা গেল না। যাহা 'অ-দৃষ্ট,' অর্থাৎ যাহা দেখি নাই বা যাহা দেখা যায় না, অর্থাৎ যাহা জানি না, তাহার ফলে কিছু বলিল বলাও যা, কেন কিছু ঘটিল, তাহা জানিনা, বলাও তাই।

বিধাতা ও বিধিলিপি সম্বন্ধে যাঁহারা আমার মত অজ্ঞ তাঁহাদের বিচারের জন্য আমাদের ভাগ্য ও ভাগ্যফলের কথার বিশ্লেষণ করিব। মানুষের ভাগ্যের কথা যে বড় দুর্বোধ্য, তাহাই বিশেষ করিয়া বলিবার জন্য একটা অত্যুক্তি প্রচলিত আছে; প্রবাদ-বচনে উক্ত আছে—পুরুষের ভাগ্যের কথা মনুষ্য দূরে থাক্, দেবতারাও জানেন না। দুর্বোধ্য হইলেও ভাগ্য-চক্রেব আবর্তন-রীতি একটু বুঝিবার চেষ্টা করিব।

রাম সবল শরীর নিয়া দরিদ্র কৃষকের গৃহে জন্মিল, আজন্ম কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত রহিল, আর কৃষক-পল্লীতে কৃষকদের সঙ্গে জীবনের

অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিল। অন্যদিকে হরি দুর্বল শরীর নিয়া ধনীর গৃহে জন্মিল, ও উপার্জনের ভাবনা-পরিশূন্য হইয়া সুখভোগ-প্রিয় সঙ্গীদের সহবাসে বাড়িয়া উঠিল। রাম ও হরির ভাগ্যে যাহাই থাক্, যাহাই ঘটুক্, তিনটি অবস্থা যে উভয়ের ভাগ্যকেই শাসন করিতেছে, তাহা দেখিতেছি। জন্মের সময় যে যেমন শরীর নিয়া জন্মিল, সেটা তাহার জন্মফল ; জন্মের পরে যে যেমন প্রাকৃতিক সুবিধায় যে কার্য্য করিল ও তাহার ফলে যেমনভাবে তাহার জীবন গড়িয়া উঠিল, সেটা তাহার কর্মফল ; আর যে পরিবার বা সমাজের বাহ্যিক অবলম্বনে ও প্রভাবে তাহার মতি-গতি নিয়মিত হইল, সেটা তাহার পরিবেষ-ফল। ইউরোপীয় সমাজ-বিজ্ঞান ও জীবন-বিজ্ঞানের ভাষায় ঐ তিনটির নাম যথাক্রমে famille, travail ও lieu। সহজরকমে ইংরেজিতে ঐ তিনটিকে যথাক্রমে heredity, function ও environment বলিয়া থাকে। উহার কোন্‌টিতে মানুষের ভাগ্য কতখানি নিয়মিত হয়, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন।

সর্বকালে ও সকল দেশেই জন্মফলের প্রভাব স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। বরং যে যুগে ও যে সমাজে সূক্ষ্ম দর্শনের যত অভাব, সেই সেই স্থলেই জন্মফলের প্রভাব অতি মাত্রায় বেশি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সন্তানেরা দেখিতে যে অনেকটা পিতা-মাতার মত হয়, তাহা বর্বরেরাও লক্ষ্য করিয়া থাকে। পুত্র, পিতার অঙ্গ-ভঙ্গির অনুকরণ করিতে শেখে, পিতার কথা কহিতে শেখে, ও মাতা আদর করিয়া প্রীত হইয়া সেই ধরণ ধারণ-গুলি বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করে। পুত্র এখানে জন্মফলে যাহা লাভ করে নাই, যাহা সে কর্ম ও পরিবেষের ফলে লাভ করিয়াছে, তাহাও সাধারণ লোকে জন্মফল বলিয়া বিশ্বাস করে। জীবন বিজ্ঞানের (Biology) তথ্য হইতে দেখিতে পাইব যে, সন্তানেরা

হুবহু পিতা-মাতার দ্বিতীয় সংস্করণ নয়। কিন্তু মোটা দৃষ্টিতে পুত্রকে একেবারে পিতার অবিকল দ্বিতীয় অবতার বলিয়া মনে হয়।

নিজের আত্মাই পুত্ররূপে জন্মলাভ করে, এই হইল প্রাচীন শাস্ত্রের কথা। চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়াই যে এই মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, শাস্ত্র হইতেই তাহা দেখাইতেছি। অতি প্রাচীন 'আপস্তম্ব' ধর্মসূত্রের দ্বিতীয় প্রশ্নের নবম পটলের চতুর্বিংশ খণ্ডের প্রথম দুই শ্লোকেই আছে—পিতা সন্তানের জন্মে নিজেই আবার জন্মগ্রহণ করেন, ও সেই জন্মেই এই মরণশীল জগতে তিনি বংশপরম্পরায় অমৃতত্ব লাভ করেন। ঋষি আপস্তম্ব দ্বিতীয় শ্লোকে এই উক্তির প্রমাণস্বরূপে লিখিয়াছেন—মানুষে সহজ চোখেই এ কথা প্রত্যক্ষ করিতে পারে যে, শরীর স্বতন্ত্র হইলেও আকৃতি ও প্রকৃতিতে পুত্র পিতার অনুরূপ। অতএব পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ইংরেজিতে সাধারণ কথায় পুত্রকে a chip of the old block বলা হয়। টুক্‌রা হইলেও টুক্‌রাটুকুর নূতনত্ব ও স্বাতন্ত্র্য খুব সূক্ষ্মদর্শনেই উপলব্ধ হইতে পারে। সে কথা পরে দেখাইতেছি।

জন্মফলের প্রভাব কত অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া সাধারণ মানুষের যে বিশ্বাস তাহা প্রচলিত অনেক উপকথা ও প্রবচন হইতে ধরিতে পারা যায়। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে জন্মমাত্রেই রাজার ছেলে বনের মধ্যে পরিত্যক্ত হইল ; কিন্তু সেখানে পশুপক্ষীরা তাহার প্রজা ও সেবক হইয়া দাঁড়াইল। বনের পশু আসিয়া দুধ খাওয়াইয়া তাহাকে মানুষ করিল, পাখীরা ফল যোগাইল, সাপ আসিয়া ফণাবিস্তার করিয়া ঘুমের সময়ে তাহার মুখের উপরে রৌদ্রপাত নিবারণ করিল, ও পরে বড় হইয়া বিনা শিক্ষায় কেবল জন্মের গুণে সে শিশু, বনচারী মনুষ্যদের নায়ক ও :প্রভু হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষের এমন প্রান্ত নাই,

যেখানে কোন হঠাৎ-অবতার রাজবংশ সম্বন্ধে এই গল্প প্রচলিত দেখা যায় না। বিধাতার কলমে Cainএর কপালে নরহত্যার পাপ অঙ্কিত ছিল; কাজেই সে ভ্রাতৃবধ করিয়া নরকে গেল। ঈশ্বরের বার্তাবহ Ezekiel, ইস্রায়েল-বাসীদিগকে গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন যে, বাপ তেঁতুল খাইলে সন্তানের দাঁত টকিয়া যায়। (The fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge.)

বংশ-সংক্রমণে মানুষ পূর্বপুরুষের কি রকমের দোষ-গুণের উত্তরাধিকারী হয়, একথা নিয়া জীবন-বিজ্ঞানে অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে। অনেক শিক্ষিত লোকের সহিত কথা কহিয়া বুঝিয়াছি যে, অনেকেরই এই অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান নাই; অথচ তাঁহারা Galton, Darwin প্রভৃতি নামের দোহাই দিয়া অসম্ভব রকমের জন্মফলের কথা বলিয়া থাকেন। অসবর্ণ বিবাহের কথায় অনেক শিক্ষিত লোকের মুখে heredity নামক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অসাবধানে উক্ত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালের অসম্ভব রকমের জন্মফলের প্রভাববিষয়ক বিশ্বাস যেসকল মনে প্রভুত্ব করিতেছিল, সেখানে বিজ্ঞানের heredity-বাদ একটা ধুয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু উহার যথার্থ মর্ম কি, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয় নাই।

একটা সুপুষ্ট ও সুপক্ক বেগুনের সকলগুলি বীজই সমান ফলপ্রদ হইবে বলিয়া মানুষের মোটা বিচারে অনুমিত হইতে পারে। একসঙ্গে অনেকগুলি বীজ বাড়িয়া উঠিবার সময় কতকগুলি যে সুবিকসিত হইবার সুবিধা পায় ও কতকগুলি যে অন্য বীজের চাপে অন্য কারণে উপযুক্ত পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, তাহা আমরা ভুলিয়া

যাই। যখন বীজগুলি একই মাটিতে পুঁতিয়া সমান যত্নে লালন-পালন করিবার সময় অনেক সুপুষ্ট বীজ আমাদের অজ্ঞাতসারে একটু কোনঠেসা হইয়া পড়ে, না হয় আপাত-দৃষ্টিতে একস্থানে পড়িয়াও ভিন্ন রকম মাটির গুণ প্রাপ্ত হয়, তখনকার পার্থক্য আমরা ঠিক ধরিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু যাহা হোক্, বেগুনের চারার বেলায় মোটামুটি প্রাকৃতিক কারণের কথা ভাবিয়া থাকি। বৃক্ষ-লতায় আত্মবাদের বাড়াবাড়ি নাই বলিয়া বেগুনের চারাগুলির পূর্বজন্মের সুকৃতি-দুষ্কৃতির কথা ওঠে না; কিন্তু আমরা নাকি আত্মাদরে তরু-লতা, পশু-পক্ষী প্রভৃতির শারীরিক প্রকৃতি হইতে মানুষের শারীরিক প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করি, তাই মানুষের জন্ম-পার্থক্যে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মূল বীজের যে অবস্থার ফলে কোন শিশু বা সবল, কোন শিশু বা বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে—বর্বরের মনে সহসা সে প্রাকৃতিক অবস্থার কথা উদিত হয় না। দুর্বল বা দোষগ্রস্ত বীজ যদি অঙ্কুরিত হইবার সুবিধা পায়, তবে ত দুর্বল বা বিকলেন্দ্রিয় সন্তান জন্মিবেই। সকলেই বিকলেন্দ্রিয় হইতে পারে না, সকলেই সুপুষ্ট হইতে পারে না। ভিন্ন-ভিন্ন সন্তানকে ভিন্ন-ভিন্ন শারীরিক অবস্থা নিয়া উৎপন্ন হইতেই হইবে, তবুও বর্বরের মন মানে না; সে পূর্বজন্মের দোহাই দিয়া পার্থক্য বুঝিতে চায়। মানুষের শরীরের প্রকৃতিই এমন যে তাহাতে অবস্থা-বিশেষের দূষিত বীজ উৎপাদিত হইবেই হইবে। সেই দূষিত বীজ যদি অঙ্কুরিত হইতে পারিল, তবে ত একটা দোষগ্রস্ত শরীরের জন্ম হইবেই। পূর্বজন্মবাদীর কুযুক্তিতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, অমুক রাম বা হরি সেই দূষিত শরীর নিয়া জন্মিল কেন? তাহার স্থলে শ্যাম বা যদু সে শরীর পাইল না কেন? একজনকে যখন সে শরীর পাইতেই হইবে, আর তাহার একটা স্বতন্ত্র

নাম হইবেই হইবে, তখন আবার সে ব্যক্তি যদি যদু হইত, তবে সে হরি হইল না কেন, এ প্রশ্ন উঠিতে পারিত। একজন্মের একজনের আত্মা অন্য জন্মের অন্য শরীরে আদৌ প্রবেশ করিতে পারে কি-না; সে তর্কের বিচার করিতে গেলে ভূতবাদীর ইতিহাস নিয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যাহা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে সম্ভবপর বলিয়া অতি অল্প পরিমাণেও অনুভব করা যায়, তাহার ব্যাখ্যার জন্য একটা অজানা ধাঁধা বা প্রহেলিকার সৃষ্টি করা কেন? প্রহেলিকাটিও দুর্বোধ্য আর ব্যাখ্যাটিও ততোধিক। অনেকেরই মনে রাখা উচিত—সহজ দৃষ্টি ছাড়িলেই একটা গুরু রকমের দার্শনিক হইয়া ওঠা যায় না।

যেসকল ঘটনা বৃক্ষ-লতায় ও পশু-পক্ষীতে সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি, ও প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হই না, সেই সকল ঘটনা যখন মানুষের বেলায় ঘটে, তখন আমরা তাহার অতি-প্রাকৃত ব্যাখ্যা দিবার জন্য উদ্‌যোগী হই। বৃক্ষ-লতার মৃত্যু হয়, পশু-পক্ষীর মৃত্যু হয়, ইহা ত সর্বদাই দেখিতেছি; তবুও মানুষ মরে কেন বলিয়া কত অদ্ভুত তত্ত্বেরই অবতারণা করিয়া থাকি। খ্রিষ্টিয়ানের শাস্ত্রে লেখা আছে যে, আদম্‌ এবং আদম্‌-পত্নী পাপ করিয়াছিলেন বলিয়া এ সংসারে গর্ভধারণের ক্লেশ জন্মিল, মৃত্যু আসিয়া এ সংসারে বিচরণ করিল। উদ্ভিদ বা অন্য জন্তুরা পাপ করিতে পারে বলিয়া খ্রিষ্টিয়ানেরা বিশ্বাস করেন না; মানুষের জন্মের পূর্বে—কাজে কাজেই পাপের জন্মের পূর্বে যে উহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাও শাস্ত্রেই স্বীকৃত আছে। তবে পশু-পক্ষী জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করে কেন? উদ্ভিদ ও পশু-পক্ষীদের মৃত্যু হয় কেন? এসকল কথা ভাবিবার অবসর হয় নাই; তাই মানুষের বেলায় দেবতার লীলাখেলা পাপ হইয়া

উঠিয়াছে, ও মানুষের কল্পিত দুর্ভাগ্যের জন্য অতি প্রাকৃত ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুর শাস্ত্রেও ঐ কথা। মানুষ যদি দেবতার বর পায়,—কিংবা যদি নিষ্পাপ হইয়া বাস করিতে পারে, কিংবা নিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া যোগ অভ্যাস করিতে পারে, তাহা হইলে হয় সশরীরে অমর হইবে, না হয় ইচ্ছা-মৃত্যু ঘটাইতে পারিবে, না হয় দীর্ঘ হইতে দীর্ঘ জীবনলাভ করিতে পারিবে। কথা এই—মানুষের সঙ্গে যে অন্য জীব-জন্তুর মিল আছে, এ কথা যেন মানুষেরা বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না;

যে জৈবনিক (germ-plasm) হইতে আমাদের শরীর ও জীবন, অল্প পরিমাণে তাহার প্রকৃতি বুঝিয়া না নিলে আমাদের জন্ম ও জন্মফলের কথা বুঝিতে পারিব না। যাঁহারা এ তত্ত্বের জন্য নিরবছিন্ন কল্পনার আশ্রয় নিয়া 'গভীর গবেষণা' করিয়াছেন, তাঁহাদের হাতে গুরুপথ্য দর্শনশাস্ত্র ও Metaphysics সৃষ্টি হইয়াছে। একবার সেই অপার্থিব ও অমূল্য শাস্ত্রের শিক্ষার কথা ভুলিয়া প্রাকৃতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মন্দ হয় না।

যখন একটা অতি নিম্নস্তরের জীব-শরীরের প্রতি লক্ষ্য করি, তখন দেখিতে পাই যে একটি দেহপিণ্ড জীবরূপে রহিয়াছে। সে অঙ্গে, প্রত্যঙ্গ বা limbs নাই, চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়াদি নাই; হৃদয়-পাকস্থলী প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি নাই; হাড় নাই, শিরা নাই, স্নায়ু নাই; কেবল আছে খানিকটা আঠার মত পদার্থের একত্রসম্বদ্ধ পিণ্ড। সে আহার করে সর্বাঙ্গে, সে সমস্ত কার্য্য করে সর্বাঙ্গে। সে-জীবগোষ্ঠীতে পুরুষ-স্ত্রীর ভেদ নাই; সে যেন স্বয়ম্ভু ও অক্ষয়। সে যখন পুষ্টিলাভ করে, তখন আপনি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র জীব বা পিণ্ডে পরিণত হয়। ঐ বিভক্ত পিণ্ডদুইটি আবার পুষ্টিলাভ করিয়া

আত্মশরীর-বিভাগে বহুতর জীব-পিণ্ডে পরিণত হয়। মনে কর, কোন মাছ বা পাখী উহাদিগকে উদরস্থ করিয়া হজম করিয়া ফেলিল না; তাহা হইলে উহাদের শরীরের কোন অংশকে অর্থাৎ কোন জীবকে মরিয়া যাইতে দেখিবে না। দেখিবে যে, ক্রমাগত জীব-পিণ্ড বিভক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, উহাদিগকে দেখিলে স্বয়ম্ভু ও অক্ষয় বলিয়া মনে হয়। এই নিম্ন জীবে বা দেহ-পিণ্ডে যাহা অক্ষয় বলিয়া লক্ষ্য করি, উহাই সকল জীবের শরীর ও জীবনের উপাদান।

যেসকল উচ্চ শ্রেণীর জীবে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ জন্মিয়াছে, ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ হইয়াছে ও দেহ-আয়তনে বিবিধ যন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, সেখানেও প্রায় যেন নিম্ন স্তরের জীবের মত, শরীর উপাদানের জৈবনিক দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে। যে জৈবনিক আমাদের শরীরের একমাত্র উপাদান, উহা যেন প্রথমত দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। একটি ভাগ আমাদের দেহ-আয়তন ও শারীর যন্ত্রাদির সৃষ্টি করিয়া সেই সৃষ্টিতে পর্য্যবসিত হইতেছে, আর অপর ভাগ যেন ঐ দেহের মধ্যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া অন্য জীব উৎপাদন করিবার ক্ষমতা নিয়া বাস করিতেছে। বলিয়া রাখি যে, এই অবস্থাটি স্ত্রী-শরীরে এবং পুরুষ-শরীরে সম্পূর্ণ একই। কথাটি বলিবার প্রয়োজন এই—সাধারণত লোকের বিশ্বাস এই যে, জীব-উৎপাদন বিষয়ে পুরুষ-শরীরে কার্য্যকারিতা অধিক। অজ্ঞ যুগের শাস্ত্রে ও উপাখ্যানে পড়িয়া থাকি যে, একমাত্র পুরুষের প্রভাবে কখনও মৃৎপাত্রে বা দ্রোণমধ্যে, কখনও বা সম্পর্কশূন্য মৎস্যাদি জাতির গর্ভে অনেক মনুষ্য শিশুর জন্ম হইয়াছিল।

যে শরীরাণু (chromosoma) হইতে একটি মানব শিশুর জন্ম,

উহা সমান অংশে পিতৃশরীর ও মাতৃশরীর হইতে লব্ধ হইয়া থাকে। একটি মনুষ্য-শরীর ২৪টি শরীরাণু বা chromosomesএর সমষ্টি। মানব-শিশু জন্মকালে উহার মোটামুটি ১২টি পিতৃ-শরীর হইতে ও ১২টি মাতৃ-শরীর হইতে লাভ করে। পিতামাতা আপন আপন পুষ্টিলাভের সময়ে যেভাবে ঐ শরীরাণুগুলি বর্দ্ধন করে, অথবা ঐ শরীরাণুতে যে-সকল দোষ-গুণ অঙ্কিত করে, তাহা শিশু-শরীরে অঙ্কিত হইবেই হইবে। পিতামাতার কোন্ শ্রেণীর দোষ-গুণ তাহাদের নিজের শরীরাণুকে দোষ-গুণের অনুরূপে পরিবর্তন করিতে পারে, অর্থাৎ পিতামাতার কোন্ দোষ-গুণের ছাপ শিশু-শরীরে অঙ্কিত হইবেই হইবে, সে বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পরে বিবৃত করিতেছি। কিন্তু আমরা এইটুকু হইতেই বুঝিতে পারি যে, শিশুর সমগ্র শরীর যখন পিতৃমাতৃ-দত্ত শরীরাণুর সমষ্টিমাত্র, ও পিতৃমাতৃ-শরীরের অণুগুলি যখন তাহাদেরই নিজের বিশেষ অবস্থার পুষ্টিফল, তখন শিশুশরীরে পিতামাতা ছাড়া অন্য কোন অসম্পর্কিত মৃত ব্যক্তির আত্মা আসিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে না।

আত্মা বলিলে একটা সূক্ষ্ম কথা বুঝায়। মানুষের সকল কর্মই যখন তাহার শারীর ক্রিয়ার ফল, তখন আত্মা অর্থে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা প্রতি শরীরে নূতন সত্তারূপে শরীরাণুর সম্মিলন বিকাশের সময়ে বিকসিত বা উৎপন্ন হয়। অন্য আত্মাকে যদি নব শরীর গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রথমত তাহাকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া, পিতা ও মাতা উভয়ের শরীরের শরীরাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইত। এরূপ করিতে হইলে আবার পিতৃমাতৃ-শরীরের শরীরাণু-গুলির কোনপ্রকার পুষ্টি হইবার পূর্বে উহাকে শরীরাণু সাজিয়া দাঁড়াইতে হয়। এ প্রথায় অগ্রসর হইলেও আবার আত্মাটিকে ঐ

পিতামাতার শরীর আশ্রয় না করিলে নাতি হইয়া জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এখন যদি যুক্তিপথে আর একটু অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মৃত পুরুষের আত্মাকে যদি নব জন্মলাভ করিতে হয়, তবে তাহাতে কাঁকড়ার পদ্ধতিতে পিছাইয়া গিয়া আদিম জৈবনিক না সাজিলে আর চলে না।

ঠিক জন্ম-সঞ্চারের মুহূর্তে যখন ২৪টি শরীরাণু মিলিত হইয়া জীবকোষ বাঁধিয়া বাড়িতে বসে, সে সময় হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় পর্য্যন্ত একই জৈবনিক-লীলা ঐ শরীরে অভিনীত হয়। সমগ্র অণুর সঙ্গে যেমন একটি শরীর, তেমনই সমগ্র শরীরের একটা সূক্ষ্ম গুণ-ফল রূপে একটি স্বতন্ত্র আত্মার বিকাশ বা উৎপত্তি ধরিয়া লইলে বরং চলিতে পারে।

আত্মার বিষয়ে যাহা হোক, শরীর সম্বন্ধে ঠিক বলিতে পারা যায় যে, শিশুর শরীর ঠিক পিতার শরীরও নয়, মাতার শরীরও নয়। পিতা ও মাতা প্রত্যেকের শরীরই ২৪টি শরীরাণুর সমষ্টি; কিন্তু সন্তানোৎপাদনের সময়ে কেবল বংশপ্রবর্তকরূপে ১২টি-১২টি করিয়া শরীরাণু আসিয়া মিলিত হইয়া নূতন শরীর গড়িয়া তোলে। তাহার পর আবার আর একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিতে হইবে। পিতা ও মাতা তাঁহাদের আপন-আপন পিতামাতার অংশে উৎপন্ন হইবার পর সংসারের চারি পাশের অবস্থায় ও শিক্ষায় যখন পরিবর্দ্ধিত হইতেছিলেন, তখন আপন-আপন কর্ম ও পরিবেষের ফলে শারীরিক জৈবনিকের বংশপ্রবর্তক অংশটুকুকে পরিবর্তন করিতেছিলেন। উহাতে ফল এই হইল—সন্তানেরা অনেক অংশে যে পিতামাতার অনুরূপও হইবে, তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইল। প্রতি-বারের সন্তান উৎপাদনের সময়ে, ঐ বংশপ্রবর্তক জৈবনিকে ভিন্নতা

সাধিত হইতে থাকিবেই। কাজেই সন্তান, পিতা ও মাতার (কেবলমাত্র পিতার নহে) আত্মজ হইলেও একটি ভিন্ন স্বতন্ত্র জীব। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত J. A. Thomson লিখিয়াছেন—"On the one hand, the child is like its parents, 'a chip of the old block', a literal *reproduction*; on the other hand, the child is something original, a new pattern, a fresh start—leading the race." কর্ম্ম ও পরিবেষের ফলে এই শিশু আবার আরও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া ভিন্ন মানুষ হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র জন্মফলে একটি শিশু পিতামাতার দোষ-গুণের কতদূর পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারী হয়, তাহা বলিতেছি।

পুরীতে সমুদ্রতীরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ক্রমাগত একদিক হইতে বাতাস বয় বলিয়া সমুদ্রতীরের গাছগুলি একদিকে ঝুঁকিয়া বাড়িয়া ওঠে, ও চিরকাল বাঁকা হইয়াই থাকে। ঐ গাছগুলি বাঁকা, ও বাঁকা হইয়া বাড়িয়াছে বলিয়া উহাদের বীজ হইতে যে নূতন গাছ জন্মিবে, তাহাও বাঁকা হইবে, ইহা সত্য নয়। পিতৃমাতৃ-শরীরের যে-কোন পরিবর্তনই যে, সন্তান-শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে, তাহা ঠিক নয়। যাঁহারা ক্রমবিকাশ-বাদের কোন-কোন তত্ত্ব গাল-গল্পের মত শুনিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, আমরা যদি কোন অঙ্গের চালনা বন্ধ করি, অথবা শরীরে যাহা প্রাকৃতিকভাবে জন্মিয়াছে, তাহাকে অব্যবহার্য্য করিয়া তুলি, তাহা হইলে বংশ-পরম্পরায় অব্যবহৃত অংশ একেবারে খসিয়া পড়িবে বা লোপ পাইবে। যাঁহারা গল্পে শুনিয়াছেন—ডারউইন বলিয়াছেন যে, বানর হইতে মানুষের উৎপত্তি (হায় ডারউইন!), তাঁহারা এখনও বলিয়া থাকেন—মানুষের ব্যবহারে লাগিল না বলিয়া ধীরে ধীরে লাঙ্গুলটি খসিয়া

পড়িয়াছে। হাতুড়ের হাতে ক্ষয়-বৃদ্ধির তত্ত্বটার কি দুর্গতিই হইয়াছে। আমরা পুরুষানুক্রমে হাতের নখ কাটিয়া আসিতেছি। এখনও কিন্তু তাহার ক্ষয় হইল না। তারকেশ্বরের অকৃপা না হইলে ভট্টাচার্য্যবংশে চিরকাল দাড়ি-গোঁফ যথা সময়ে গজাইয়া উঠিতে ছাড়ে না। যদি কোন একটি বংশের লোকদিগকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জোর করিয়া খোঁড়া করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের সুদূর বংশধরেরা আপনাআপনি জন্মমাত্রে খোঁড়া হইয়া জন্মিবে না। চীনদেশের স্ত্রীলোকেরা বহুকাল হইতে যত্ন করিয়া পা ছোট করিয়া আসিতেছে; তবুও নবজাত সন্তান সুবিকসিত পা নিয়া জন্মগ্রহণ করে।

যেসকল রোগ আমাদের সমগ্র শারীরিক অবস্থা হইতে উৎপাদিত হয় না, যাহা আমাদের হাড়ে গজায় না, অর্থাৎ মূল জৈবনিকের অবস্থার ফলে যন্ত্রজ বা organic নয়, সে রোগ সন্তানে বর্তে না। এমন অনেক রোগ আছে, যেগুলি কোন আকস্মিক কারণে কিম্বা বাহিঃস্থ কোন সূক্ষ্ম অণুর (microbes) প্রভাবে উৎপন্ন হয়, সে রোগ কেবলমাত্র জন্মফলে সন্তানশরীরে সংক্রামিত হইতে পারে না। ধরুন, কোন পিতা বা মাতার Phthisis নামক কাশরোগ জন্মিয়াছে; যদি জন্মমুহূর্তের পর সন্তানটিকে বাহ্যিকভাবে ঐ রোগ-সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করা যায়, তবে সন্তান পিতামাতার ঐ রোগের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। শিশু যাহা জন্মের পর পিতামাতার সংশ্রবে সঞ্চয় করে, তাহাকে জন্মফল বলা যাইতে পারে না। উহা কর্ম্মফলও নয়, কেবল পরিবেষ ফলমাত্র। জৈবনিকের যে অংশ বংশবর্দ্ধক শক্তিরূপে স্বতন্ত্র রহিয়াছে, উহাতে যে-সকল অবস্থার ফল অঙ্কিত হইতে পারে, তাহাই সন্তানে বর্তিতে পারে।

বংশপ্রবর্দ্ধক জৈবনিকের এমন একটা মৌলিক প্রকৃতি আছে, যাহার

ফলে সে একটা বিশেষ গতি বা লক্ষ্য নিয়া পুষ্টিলাভ করে বা বাড়িয়া ওঠে। শরীরের অবস্থা যদি সেই বৃদ্ধির অনুকূল হয়, তবে কোন গোলই নাই। কিন্তু যদি শরীরের অনুকূল অবস্থা লাভ করিয়া কোন বিশেষ দিকে উহার গতি বর্দ্ধিত হয়, আর সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গতি পরে বাড়িয়া উঠিবার সুবিধা না পায়, তাহা হইলে নদীর প্রবাহে কূল ভাঙ্গিয়া যাইবার মত শরীরে একটা বিকৃতি বা ব্যাধি দেখা দিতে পারে। ঐরূপ বিকৃত বা ব্যাধিযুক্ত পিতা যদি উন্নততর শরীর জন্ম দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্না নারীকে তাঁহার শিশুর মাতা করেন, তাহা হইলে শিশু-শরীরে পিতার ব্যাধি না জন্মিয়া একটা নূতন গুণের জন্ম হইবে। কারণ যেশক্তি পিতৃশরীরে একটি গুণরূপে বিকসিত হইবার জন্য ছটফট্ করিয়া ব্যাধি উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহা অনায়াসে সন্তান-শরীরে পুষ্টিলাভ করিবার পথ পাইল। এ বিষয়ের একটি মন্তব্য শ্রীযুক্ত J. A. Thomson প্রণীত "Heredity" গ্রন্থের ২৫২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। এই মন্তব্যটি হইতে ইংরেজি-অভিজ্ঞ পাঠকেরা কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

"Leaving microbic and acquired diseases out of account, we may safely say that various processes of hypertrophy aud atrophy which are associated with disease in a well finished organism like man are, as it were, *recrudescences of important stcps in past evolution.* The persistence of germinal activity in a patch of cells may give rise to a tumour, but is it not, as it were, an echo of the power that lower animals have of regenerating lost parts? So it may be that some of the cerebral

variations which we call for convenience 'nervous diseases' are *attempts at progress.*"

সন্তানের শরীরে পিতৃমাতৃরোগের আবির্ভাব যে, রোগের উত্তরাধিকারিত্ব সূচনা করে না, এ বিষয়ের বিশেষ কথা এখানে লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। যেখানে মৌলিক জৈবনিকের প্রভাবে সন্তানের শরীরে রোগ উৎপন্ন করিবার একটি অনুকূল অবস্থামাত্র থাকে, অর্থাৎ predisposition মাত্র থাকে, সেখানেও ঠিক রোগের উত্তরাধিকার বলা চলে না। রোগ সম্বন্ধে সাধারণত এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, সন্তান ঠিক জন্মফলমাত্রে পিতার কোন রোগেরই উত্তরাধিকারী হয় না। কেবল কোন-কোন রোগে রোগ জন্মিবার অনুকূল অবস্থা নিয়া সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একদিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলে এই অনুকূল ভাব বা predisposition সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যাইতে পারে। অন্যদিকে আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, পিতামাতার একজনের শরীর হইতে রোগের অনুকূল অবস্থা পাইয়া ও অন্যজনের নিকট হইতে সন্তানটি রোগ প্রতিষেধের অবস্থা (immunity) লাভ করে। পূর্বে সমুদ্রতীরের বাঁকা গাছের কথা তুলিয়া কয়েকটি কথা বলিয়াছি। সংক্ষেপে কথাটি এই—মানুষের শরীরে যেসকল পরিবর্তন বাহ্যিক কারণে ঘটিয়া থাকে,—যে পরিবর্তনের মূলে কেবল জন্মের পরবর্তী সময়ের কর্মফলের ও পরিবেষফলের প্রভাব, সেসকল পরিবর্তন বা acquired characters সন্তানশরীরে সংক্রামিত হয় না।

ধরুন, একটি দম্পতির শরীর খুব সুস্থ, দেহ-আয়তন সুপুষ্ট, স্নায়ুচক্র প্রভৃতি সুবিকসিত, আচার-ব্যবহার খুব সংযত, ও নানা বিদ্যায় মন অলঙ্কৃত। উঁহাদের যে সন্তান হইবে, সে প্রথমত জন্মকালে পিতা-মাতার অনুরূপ শরীরটি পাইবে। ঐ শরীর যদি সম্পূর্ণরূপে পিতামাতার

শরীরের মত সুস্থ ও সর্বকর্মক্ষম হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যাইবে না যে, ঐ সন্তান ঠিক পিতামাতার সুশিক্ষালব্ধ গুণ লাভ করিবে। অন্যবিধ বা কুবিকসিত দম্পতির পুত্রের সহিত প্রথম দম্পতির পুত্রের তুলনা করিয়া কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। মনে করুন যে, শরীরখানির হিসাবে প্রথম দম্পতির সন্তান যেন একটা বড় 'জালা' হইয়া জন্মগ্রহণ করিল; ও দ্বিতীয় দম্পতির সন্তানটি একটি ছোট 'ভাঁড়' হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। 'জালা' হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই যে, প্রথম সন্তানটি সর্বগুণে পরিপূর্ণ হইবে, তাহা নয়। কর্ম ও পরিবেষের ফলে ঐ বৃহৎ জালায় কেবল কাদা ভরা যাইতে পারে আর ছোট 'ভাঁড়'টিতে অতি অল্পপরিমাণে ধরিলেও সুপেয় সরবৎ পূর্ণ করা যাইতে পারে। একটি শরীরে অনেক সদ্‌গুণ বিকসিত হইবার অনুকূল অবস্থা থাকিলে যে, সদ্‌গুণই বিকসিত হইবে, একথা বলা চলে না। খাদ্য, গৃহ, সমাজ, শিক্ষা ও বাড়িবার পথের অন্য রকমের সুবিধা-অসুবিধা মানুষকে নিয়মিত করে।

কুটিল রাজনৈতিকের পুত্র অনায়াসে সরল সাধু ব্যক্তি হইয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজে ঐ কুটিলতা নিন্দনীয় নয় বলিয়া সন্তানকে জন্মমাত্রে 'একঘরে' হইতে হয় না, বরং সম্মানের সহিত সে দশজনের সঙ্গে বাড়িয়া উঠিয়া জন্ম ও পরিবেষফলের অনুরূপে আপনার নূতন ভাগ্য গড়িয়া তোলে। একজন দরিদ্র চোরের সহিত রাজনৈতিকের যত নৈতিক মিলনই থাক্ না কেন, যে চোরের গৃহে বর্দ্ধিত হয়, সাধারণত তাহার কপাল ভিন্ন রকমের হয়। চোরের বংশে জন্মিয়াছে বলিয়া কেহ চোর হইবেই, এমন কথা বিধাতাপুরুষ কাহারও কপালে জন্মের পূর্বে লিখিয়া দেন না। তবে চোরের ছেলে সাধুসমাজে তেমন স্থান পায় না বলিয়া, রাজনৈতিকের পুত্রের মত ভাগ্য-পরিবর্তনের সুবিধা পায় না।

উত্তরাধিকার বা Heredity

২

কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাশালা

সম্বলপুর অঞ্চলের গণ্ডাজাতির লোকেরা (Gond বা গোঁড় জাতি হইতে ইহারা স্বতন্ত্র) অনেক চুরির মোকদ্দমায় ধরা পড়ে; ও সাধারণত অপরাধী জাতি (criminal tribe) বলিয়া ইহারা প্রসিদ্ধ। ইহারা বহুকাল ধরিয়া বংশপরম্পরায় এই অখ্যাতির বোঝা বহিয়া আসিতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে আমি যখন সম্বলপুর প্রদেশের কয়েকটি জাতির তত্ত্ব অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করি, তখন গণ্ডা জাতির প্রাচীন ইতিহাসের মূলে উহাদের একালের অখ্যাতির বীজের কিছু সন্ধান পাইয়াছিলাম।

অতি প্রাচীনকালে যখন গোঁড়-শবর প্রভৃতি জাতির লোকেরা মধ্যভারতের পার্বত্য প্রদেশে, সম্বলপুরের বনে-পাহাড়ে ও উৎকলের পশ্চিম সীমান্তে আপনাদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, তখন এক-একটি আরণ্য জাতি অন্য প্রতিবেশী আরণ্য জাতির শত্রু ছিল; আর বনসীমার পরপারে আর্য্যজাতীয়েরা প্রত্যেক অরণ্যচারী জাতির মহাশত্রুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন। বঙ্গপ্রদেশে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যবংশীয় রাজারা পার্বত্য সীমান্ত প্রদেশে কোন-কোন মিশ্রজাতীয় ক্ষমতাশালী আর্য্যভক্তকে ঘাটোয়াল করিয়া অনার্য্যের উপদ্রব নিবারণ করিতেন, অরণ্যচারী জাতিরাও প্রায় সেইরূপ উপায়েই আপনাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজ্য অন্য জাতির আক্রমণ

হইতে রক্ষা করিত। যাহারা গোঁড়দের রাজ্যসীমান্তে একদিন সে রাজ্যের প্রহরীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারাই একালের হতভাগ্য গণ্ডাজাতি। ঠিক ওড়িষা প্রদেশের কন্ধ জাতির রাজ্যসীমার 'পান'-জাতীয়েরাও একালে গণ্ডাদের মত (একই কারণে) দুর্নাম ও অখ্যাতির বোঝা বহিয়া থাকে।

অনার্য্য রাজ্যের সীমান্তের প্রহরীদের কার্য্য ছিল—সজাগ হইয়া পাহারা দেওয়া, প্রতিবেশী শত্রুর গতিবিধির খবর রাখা আর আত্মসীমার বাহিরের লোকদের সম্পত্তি লুঠপাট করিয়া আপনাদের প্রভুজাতির ক্ষমতা ও "দবদবাই" বজায় রাখা। প্রতিবেশীদের সম্পত্তি অপহরণ করা যাহাদের কর্তব্যের মধ্যে ছিল, তাহাদের মধ্যে যে চুরি-ডাকাতি একটা সুখ্যাতি ও গৌরবের কাজ বলিয়া গণিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা নাই। গোঁড়-শবর প্রভৃতি জাতির রাজ্য গিয়াছে,—এখন তাহারা নির্বিরোধে চাষ আবাদ করিয়া খায়। গণ্ডা-দের জাতির ইতিহাসে কখনও চাষ করিয়া খাওয়া লেখে নাই; পূর্বকালে উহারা গ্রাম পাহারা দিত, চুরিচামারি করিত, আর অবকাশ-সময়ে আপনাদের পরিধেয় কাপড় আপনারা বুনিয়া নিত। হিন্দুরা যখন এ প্রদেশে রাজা হইয়াছিলেন, তখনও প্রাচীন প্রথার মর্য্যাদা রাখিয়া গণ্ডাদিগকে গ্রামে-গ্রামে প্রহরী বা চৌকিদার নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। হয়ত বা চৌর্য্যকৌশলজ্ঞ গণ্ডা গ্রামে থাকিতে সে গ্রামে চুরি হইতে পারিবে না বলিয়া রাজারা প্রাচীন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, এখন সম্বলপুর জেলার প্রায় অধিকাংশ গ্রামে গণ্ডারাই চৌকিদার। এখনও উহারা কাপড় বুনিয়া খায়, ও অধিকাংশ চুরিতেই অপরাধী বলিয়া ধরা পড়ে। গণ্ডারা এখন মোটা কাপড় বুনিয়া পয়সা পায়; চৌকিদারির জন্য প্রাপ্ত জমি চাষ করিয়া

উহাদের অনেকে অন্নসংস্থান করিবার সুবিধা পাইয়াছে, তবুও উহারা সুবিধা পাইলে চুরি করিতে ছাড়ে না।

এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকেই বলিতে পারেন যে, হয়ত বা প্রত্যেক গণ্ডাশিশু জন্মমাত্রে চুরি করিবার প্রবৃত্তি নিয়া বাড়িয়া ওঠে; অর্থাৎ গণ্ডাদের মধ্যে চৌর্য্য-প্রবৃত্তিটি কেবলমাত্র জন্মফলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে কারণে গণ্ডা ও পান-জাতির লোকেরা চোর হইয়াছে, তাহার ইতিহাস দিয়াছি। চুরি-করা যখন একসময়ে উহাদের কর্তব্যের মধ্যে ছিল, তখন সুকৌশলের চুরি গণ্ডাসমাজে গৌরব ও 'বাহবা'-লাভের জিনিস ছিল। হিন্দুজাতির লোকেরা আর কথঞ্চিৎ উন্নত অন্যান্য অনার্য্যেরা গণ্ডাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করে। উহারা অস্পৃশ্য হইয়া ও অন্যান্য সমাজের প্রভাব হইতে দূরে থাকিয়া আপনাদের বংশপরম্পরাগত আচার-ব্যবহার ও 'কর্মস্মৃতি' লইয়া বাস করিতেছে। এ সমাজে চুরি-করা পাপের কার্য্য নয়,—এখানে 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা'। শিশু জন্মমাত্রেই যে-কর্মভূমিতে বিচরণ করে, ও যে-শিক্ষাশালায় বর্দ্ধিত হয়, সেখানে এখনও পর্য্যন্ত চুরি করাটা বাহাদুরির কার্য্য। এরূপ অবস্থায় গণ্ডাশিশুকে যদি চোর হইতে হয়, তবে তাহার জন্য তাহার কোন মৌলিক প্রবৃত্তিকে দোষী করা চলে না। সাধু-বংশের শিশু যদি গণ্ডাসমাজে পরিবর্দ্ধিত হয়, তবে তাহাকেও চোর হইতে হইবে। এখানে মনের অভ্যন্তরের দোষ-গুণের উত্তরাধিকারিত্ব সূচিত হয় না; কিন্তু সূচিত হয়—কর্মক্ষেত্রের আচার-ব্যবহার ও পরম্পরাগত স্মৃতিরক্ষিত ভাবের প্রভাব। উহাকে বিদেশের সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌দের ভাষায় external heritage বলিতে পারি। আমরা যেমন আভ্যন্তরিক্ দোষ-গুণের উত্তরাধিকারিত্ব এড়াইতে পারি না, তেমনই এই বাহ্যিক উত্তরাধিকার হইতেও সহজে মুক্তিলাভ করিতে

পারি না। এই বাহ্যিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিশেষ কথা পরে বলিতেছি।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের একটি পুণ্যময় বিধানে গণ্ডাজাতিকে সাধু করিবার উদ্যোগ হইতেছে। এই উদ্যোগের প্রারম্ভকালে সম্বলপুরের সেই সময়কার ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রমেজ মহোদয় আমাকে অনুগ্রহ করিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম যে, গণ্ডা বালকেরা মানসিক উন্নতির জন্য ও উপার্জনের সুবিধার জন্য সুশিক্ষা পাইলেও যদি তাহারা আপনাদের লোকজনের সমাজ হইতে অন্তর্হিত না হয়, তবে তাহারা কিংবা তাহাদের বংশধরেরা বড় সহজে চুরি-করা ছাড়িবে না। অন্যদিকে আবার আপনার লোকজনদের নিকট হইতে বালক-বালিকাদিগকে সম্পূর্ণ দুরে রাখিলে স্নেহ-মমতা প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তিগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। গণ্ডাদিগকে মানুষ করিবার পথে যে উভয়সঙ্কট রহিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট। হিন্দুজাতির নীচ শ্রেণীর লোকেরা যদি উহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা না করিত, যদি উহারা অলক্ষ্যে সামাজিকতার ফলে অন্য প্রকার external heritageএর আওতায় আসিয়া পড়িতে পারিত, তবে ধীরে ধীরে প্রতিবেশীর সুবিস্তীর্ণ বাহ্যিক উত্তরাধিকারের ফলেই শাসিত ও বৰ্দ্ধিত হইতে পারিত।

কর্মক্ষেত্রের প্রভাব বুঝিবার পক্ষে গণ্ডাজাতির এই দৃষ্টান্তটি অতি উপযোগী মনে করিতেছি। এই দৃষ্টান্তে সমাজবিজ্ঞানের (sociology) যে দুইটি সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে, তাহার **প্রথমটি এই**— প্রত্যেক সমাজেই এক-একটি পরিবারের যে বিশেষ দোষ-গুণ আছে, জন্মের পরে সন্তানেরা তাহার প্রভাবের মধ্যে পড়িবেই পড়িবে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক সমাজেই সেই সমাজের লোকসমূহের পরাম্পরাগত কীৰ্ত্তির স্মৃতি ও সমবেত কর্মফল, কর্মক্ষেত্রের আব্হাওয়ারূপে সঞ্চিত

থাকে। সমাজের সকলকেই আত্মপরিবারের দোষ-গুণ ও পুঞ্জীভূত প্রাচীনতার প্রভাব সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে হয়। কেহই এই বাহ্য-উত্তরাধিকার অতিক্রম করিতে পারে না।

যে গুণ পিতৃমাতৃশরীরের জৈবনিকে বদ্ধমূল হয় না, সন্তানশরীরে তাহা সংক্রামিত হইতে পারে না, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। মানুষ ভিন্ন অন্য-অন্য জীবজন্তুদের মধ্যে এই তথ্যের যথার্থতা সহজে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু মানুষের বেলায় সহজে এ কথা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। যেসকল দোষ-গুণ পিতামাতাব আকস্মিক কর্মলব্ধ, সেই সকল নূতন ভাব বা acquired characters সন্তানশরীরে জন্মজ না হইলেও, জন্মের পরমুহূর্ত্ত হইতেই সন্তানেরা তাহা পিতামাতাব প্রত্যক্ষ প্রভাব হইতে লাভ করিতে থাকে। মানুষের সমাজে অতীত-কালের প্রভাব সঞ্চিত হইয়া থাকে; কিন্তু পশুসমাজে তাহা হয় না। এইজন্য মানুষকে বিশেষভাবে আপনার বংশের, প্রতিবেশী-বংশের, আর অতীতকাল হইতে পুঞ্জীভূত সংস্কারের উত্তরাধিকার নিয়া বাড়িয়া উঠিতে হয়। সন্তানেরা যাহা মূল জৈবনিকে পায় নাই, তাহাও অতি শৈশবকাল হইতে কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাশালায় লাভ করিয়া বাড়িয়া ওঠে বলিয়া কোন্‌টুকু জন্মমাত্রের প্রভাব, ও কতটুকু কর্ম ও পরিবেষের প্রভাব, তাহা সহজে ধরিতে পারা যায় না। শ্রীযুক্ত টমসন প্রণীত Heredity গ্রন্থের ৫১৭ পৃষ্ঠায় এই কথাগুলি এইরূপ ভাবে আছে—

But the biological conclusion has to be, in an important respect, corrected for the social realm, in view of the fact that man has an external heritage of custom and tradition, institution and legislation, literature and art, which is but slightly or not at all represented in the

animal world, which yet may be so eflective that its results come almost to the same thing as if acquired characters were transmitted. They are reimpressed on the bodies aud minds of successive generations, though never ingrained in the germiplasm.

সমাজতত্ত্ববিদ্ গিডিংস্ যথার্থই বলিয়াছেন যে, একটি জাতি, সম্প্রদায় বা বংশের মধ্যে একটি মানবের মন, ঠিক যেন একটি সমুদ্র, নদী বা পুষ্করিণীর মধ্যে একটি মাছের মত বিচরণ করে। মানুষকে কোন প্রকার বিচার না করিয়াই সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি গ্রহণ করিতে হয়, প্রথাপদ্ধতি মানিয়া চলিতে হয়, আর যাহা বুদ্ধির বলে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়।

বিস্তৃতভাবে যাঁহারা অন্যজাতির সহিত মেলামেশা করেন, তাঁহারাও আত্মজাতীয় ভাবের প্রভাব এড়াইতে পারেন না। একালে ইউরোপে বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শ ও মিলন অত্যন্ত অধিক হইয়াছে; তবুও প্রত্যেক জাতিই যে, স্বদেশের ভাব ও বিশ্বাসের ফলে অত্যধিক পরিমাণে নিয়মিত হন, একথা সকল সমাজ-তত্ত্ববিদেরাই স্বীকার করিতেছেন। এই উন্নত যুগের সভ্যতার ফলে ইউরোপীয়েরা অন্য সকল জাতিকে সম্মান করিতে শিখিতেছেন, ও ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে পরস্পরের সদ্ভাব বাড়িতেছে; কিন্তু তবুও যে প্রতিজাতিনিষ্ঠ বাহ্যিক উত্তরাধিকারের ফলে ও জাতীয়ত্ব রক্ষার জন্য প্রাণের টানে সকল জাতির মধ্যে বিরোধ ও বিভিন্নতা থাকিবে, একথা বড়-বড় সমাজ-তত্ত্ববিদেরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। সামাজিক প্রাণের টান ও বাহ্যিক উত্তরাধিকারের কথা লিখিতে গিয়া জর্মান পণ্ডিত Luschan উপরের ব্যাখ্যাত কথাগুলি এইরূপভাবে লিখিয়াছেন—

The respect due by the white races to other races and by the white races to each other can never be too great, but natural law will never allow racial barriers to fall, and even national boundaries will never cease to exist.

বাহ্যিক উত্তরাধিকার ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিতে পারে, কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে একটি বাহ্যিক উত্তরাধিকার থাকিবেই থাকিবে। যেখানে বাহ্যিক উত্তরাধিকারের সমতা নাই, সেখানে যে বিভিন্ন লোক একজাতি হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না, সে কথা বিশেষ করিয়া পরে বলিব। জাতীয় উন্নতিতে নূতন নূতন নৈতিক শক্তি যখন ফুটিয়া ওঠে, তখন অনেক প্রাচীনকালের ভাব নূতন ভাবের প্রভাবে শাসিত হইয়া উন্নততর নূতন সামাজিক আব-হাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। যেমন করিয়াই হোক, একটা বাহ্য-উত্তরাধিকার থাকিবেই, ও সমাজের সকলকে তাহার প্রভাবে শাসিত হইতেই হইবে। বাহ্যিক উত্তরাধিকারের মধ্যে নিজের বংশ বা পরিবারনিষ্ঠ ভাব সন্তানকে অধিক পরিমাণে নিয়মিত করে। সন্তানকে পিতামাতার ক্রোড়ে ও গৃহে যাহা শিক্ষা করিতে হয়, তাহার প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। আমরা এই উত্তরাধিকারকে কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারি না বলিয়া কবি হায়েনে (Heine) অর্দ্ধ-পরিহাসে এই আন্তরিক কথা লিখিয়াছিলেন—A man shoued be very careful in the selection of his parents, অর্থাৎ কে তাহার পিতামাতা হইবে, ইহা যেন মানুষ ভাল করিয়া বাছিয়া নেয়। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান'-এ আছে—পার ত কেউ জন্মোনা ভাই বিষ্যুৎবারের বারবেলায়।

গণ্ডাজাতির দৃষ্টান্ত হইতে সমাজ-বিজ্ঞানের যে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি সমর্থিত হইতেছে, তাহা এই—যে সমাজ যত আত্মমগ্ন বা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ,—অর্থাৎ যে সমাজের সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থায় প্রতিবেশী জাতির সহিত মিলিত হইয়া সামাজিক বিস্তৃতি স্থাপন করিবার সুবিধা নাই, সে সমাজের অবনতি ও ধ্বংসের সম্ভাবনা তত অধিক।

জাতিভেদ বা সামাজিক সঙ্কীর্ণতা

যেসকল জাতি অন্যান্য প্রতিবেশী জাতির সহিত মিলিত হইয়া সামাজিক প্রসার বাড়াইতে পারে নাই, অথবা প্রতিবেশী জাতিসমূহের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া কোণ-ঠেসা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের অবনতি ও ধ্বংসের অনেক বিদেশীয় দৃষ্টান্ত Reibmayr সংগ্রহ করিয়াছেন। যে সকল নিগ্রোজাতি প্রতিবেশী জাতিসমূহের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে নাই, আর ভিন্ন জাতির সহিত বিবাহসম্বন্ধ করিয়া সমাজশরীরে নব রক্তধারা প্রবাহিত করাইতে পারে নাই, তাহাদের অধোগতির একশেষ হইয়া গিয়াছে। উহাদের মস্তিষ্ক ও মাথার খুলির অবস্থা পর্য্যন্ত এমন বিকৃতি লাভ করিয়াছে যে, উহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে মনে হয়। সুপ্রসিদ্ধ নরতত্ত্ববিদ্ Filippo Manetta (ফিলিপো মানেটা) গভীর অনুসন্ধান করিয়া ক্ষোভের সহিত লিখিয়াছেন—

The sudden arrest of the intellectual faculties of these Negro tribes at the age of puberty is due to the premature closing of the cranial sutures, and lateral pressure of the frontal bone.

সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাঁধা পড়িয়া এই জাতির যে দুর্গতি হইয়াছে, তাহাতে উহাদের মানসিক বা নৈতিক উন্নতি হওয়া দুঃসাধ্য। ইহা-

দিগকে বাঁচাইবার জন্য সমাজতত্ত্ববিদেরা প্রস্তাব করিতেছেন যে, ভারতবর্ষের যেসকল নীচ শ্রেণীর কুলিরা আফ্রিকায় চালান হয়, যদি তাহাদের সহিত অধঃপতিত নিগ্রোদের রক্তমিশ্রণের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ঐ জাতি উদ্ধারলাভ করিতে পারে। বিষয়টি গুরুতর বলিয়া পণ্ডিতদের কথা তাঁহাদের নিজেদের ভাষায় উদ্ধৃত করিতেছি। নিগ্রো-কপালের দুর্গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া A. H. Keane বলিতেছেন—

Reference has been made to the incapacity of the full-blood African Negro to make any permanent advance beyond his present normal condition without extraneous aid. In fact without miscegenation (রক্তমিশ্রণ) he seems to have no future, a truth which but for false sentiment and theological prejudice would have long since been universally recognized. (Ethnology—Homo Æthiopicus).

সুপ্রসিদ্ধ Johnston (জন্‌ষ্টন) নিগ্রোদের উদ্ধারকল্পে প্রথমত বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নিকটবর্তী কোন জাতির সহিত প্রস্তাবিত রক্তমিশ্রণ সম্ভবপর হইবে না। তাই তাঁহার ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

The admixture that the Negro requires should come from India, and that Eastern Africa and British Central Africa should become the America of the Hindu. The mixture of the two races would give the Indian (কুলি-শ্রেণী উদ্দিষ্ট হইয়াছে) the physical development which he lacks, and he in his turn would transmit to his half-Negro offspring the industry, ambition and aspiration

towards a civilized life which the Negro so markedly lacks. [উদ্ধৃত কথাগুলির মর্মার্থ পূর্বেই দিয়াছি ; কাজেই অনুবাদের প্রয়োজন নাই।]

প্রাচীনকালে যে জাতিতে যত বহুজাতিমিশ্রণ হইতে পারিয়াছিল, সামাজিক বিস্তৃতির ফলে ও রক্তের নবতার প্রভাবে সে জাতি তত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সমগ্র আর্য্যজাতি ও অন্যান্য ককেসিক জাতি যে বহুবিধ রক্ত-মিশ্রণের ফলে জীবনের তেজস্বিতা লাভ করিয়াছিল, একথা সকল মানবতত্ত্ববিদের গ্রন্থেই পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন। প্রাচীন মিসর ও বাবিলনে যে বিভিন্ন জাতির রক্তমিশ্রণে নূতন জাতি নববলে সভ্যতার বিকাশ করিয়াছিল, আর একালেও যে ইউরোপীয় জাতিরা এই রক্তমিশ্রণে বিশেষ ফললাভ করিয়াছে, একথা সর্ববাদিসম্মত। বিবিধ রক্তমিশ্রণের অভাবে রাসিয়ার অনেক অধিবাসী উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না, একথাও সমাজতত্ত্বের গ্রন্থে পড়িতে পাই।

সামাজিক সঙ্কীর্ণতার কয়েকটি দেশী দৃষ্টান্ত দিতেছি। জাতিভেদের ফলে এদেশে অনেক জাতির সহিত অনেক জাতির একসঙ্গে বসা-ওঠা পর্য্যন্ত নাই। এদেশে সর্বত্রই এক-একটি বিশেষ-বিশেষ জাতি অথবা বংশসঙ্ঘের দোষ-গুণ সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি। অমুক জাতির লোকেরা বড় স্বার্থপর, অমুক সম্প্রদায়ের লোকেরা বড় অর্থলোলুপ, এরূপ কথা আমরা সর্বদাই শুনিয়া থাকি, ও সে কথাটা বিশ্বাস করিয়া থাকি। প্রায় সকল শ্রেণীর হিন্দুজাতির লোকেরাই অনেক পরিমাণে আমাদের দেশের প্রাচীনতার সমান উত্তরাধিকারী। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদির কথা ও স্মৃতি সকল জাতির সমাজেই external heritage রূপে রহিয়াছে। উচ্চ জাতীয়দের প্রভাবে, কথকতা ও যাত্রা গান প্রভৃতির আশীর্বাদে অনেক অপেক্ষাকৃত হীন

জাতির মধ্যেও ঐ বাহ্যিক উত্তরাধিকার স্থাপিত হইতে পারিয়াছে, কিন্তু নির্বিরোধে সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সামাজিক মিলনের সুবিধা নাই বলিয়া যে অনেক দোষ-গুণ জাতিনিষ্ঠ বা বংশনিষ্ঠ হইয়া থাকিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। একালের ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ প্রভৃতি অনেক উচ্চ জাতির লোকেরা একসঙ্গে বহু পরিমাণে মিলিয়া মিশিয়া থাকেন, ও পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানও যথেষ্ট হয়। পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলেও ক্রীড়া-কৌতুকের আসরে, বিদ্যালয়ে, অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ও সভা-সমিতি প্রভৃতিতে সকলকে একসঙ্গে মিশিতে হয়। ইহার ফলে অনেক জাতির অনেক বিশেষত্বের কোণাগুলি খসিয়া গিয়া সমান হইয়া গিয়াছে। মানসিক ক্ষমতায় কিংবা চরিত্রের বলে উচ্চ শ্রেণীর সকল জাতির মধ্যেই সম্পূর্ণ সমতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উচ্চ জাতির লোকেরা যাঁহাদের জলগ্রহণ করেন না, তাঁহারা যত উচ্চ বা পদস্থ হোন না কেন, তবুও প্রশস্ত মনে ও অবাধে উচ্চ জাতীয় লোকদের সহিত সামাজিক বাহ্যিক মিলনেও বেশি মিশিতে পারেন না। এস্থলে বঙ্গদেশের একটি উন্নত জাতির কথাই বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। জাতিটির নাম না করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না।

যে জাতিটির কথা এখানে উপলক্ষিত, তাঁহারা লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপায় অনেকের উপেক্ষাকেই উপেক্ষা করিতে পারেন। শরীরের গড়নে ও অঙ্গসৌন্দর্য্যে ইহাঁরা অনেক উচ্চ জাতির উচ্চে না হইলেও নিম্নে নন। ইহাঁদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক বিদ্যালয়ে ও কর্মক্ষেত্রে সকলের সহিত তুল্যভাবে প্রতিযোগিতা করিতেছেন। সামাজিক প্রবাদ—ইহাঁরা কৃপণ ও স্বার্থপর। এই প্রবাদের বিরুদ্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা অনেক বলিতে পারিতাম ; কিন্তু তর্কের খাতিরে কথাগুলি মানিয়া

নিয়াই উহার বিচার করিতেছি। আমরা সেই ক্ষমতাশীল সম্প্রদায়টিকে কোণ-ঠেসা করিয়া রাখিয়াছি; তাঁহারা যে সামাজিক বিস্তৃতির অভাবে, অর্থাৎ আপনার সমাজেই সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকিবার ফলে একটু সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবেন, তাহা আশ্চর্য্য মনে হয় না। ইহাঁদের যখন ধন-সম্পদের বলে আপনাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু বজায় না রাখিলে চলে না, তখন কৃপণতা অনেক পরিমাণে অভ্যাস-সিদ্ধ হইবারই কথা। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান ভিক্ষুক হইয়াও সমাজে সম্মান হারাইতে না পারে; কিন্তু ইহাঁদের বেলায় সে কথা খাটে না। কাজেই কৃপণতা ও আনুসঙ্গিক স্বার্থপরতা অবস্থার ফলে জন্মিতে পারে। কোন-কোন ধনীসমাজের পক্ষে যে-কথা উক্ত হইয়া থাকে, তাহা সকল জাতির ধনীর সম্বন্ধেই সমান রকমে খাটে। ধনী হইয়া যাঁহারা আত্মসমাজমগ্ন হইয়া থাকেন, ও গুণসম্পন্ন অন্য সমাজের সহিত অবাধ-মিশ্রণের সুবিধা না করেন, তাঁহাদের পক্ষে জীবনের উপভোগ ও তৃপ্তি-সঞ্চয়ের বিষয়ে আদর্শ পন্থা অবলম্বিত না হইতে পারে। কোন সমাজে সঙ্কীর্ণতা জন্মিলে, অর্থাৎ সমাজের isolation বা individuation বৃদ্ধি হইলে যে, সন্তান-জননক্ষমতা হারাইয়া সে সমাজকে ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হইতে হয়, এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মত সংগ্রহের পর সুপ্রসিদ্ধ Thomson তাঁহার Heredity গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, individuated বড়লোকের সমাজে, তিনটি অবস্থা উৎপাদনশক্তি নষ্ট করিয়া ক্ষয়ের বিশেষ কারণ হইয়া ওঠে। যথা—অতিরিক্ত পুষ্টি (hypernutrition), ইন্দ্রিয়পরতা (sexual vice) ও বিবাহের খাতিরে স্বশ্রেণীর কাহারও সহিত বিবাহিত হওয়া (absence of love marriages, etc.)। বড়লোকে বড়লোকে বিবাহে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

একটি সমাজ, ও সকল ধনীসম্প্রদায়ে যে দোষগুলি জন্মিতে পারে

বলিয়া ধরিয়া নেওয়া গেল, সেগুলি যে আকস্মিক কারণে জাত দোষ-মাত্র, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। ঐ দোষগুলি নিয়া কেহ জন্মগ্রহণ করে না বটে, কিন্তু সমাজের মাটিতে যদি উহা অঙ্কুরিত থাকে, তবে জন্মের পরে সঙ্কীর্ণ শিক্ষাশালায় পড়িয়া বালকদিগকে উহার ফলভোগী হইতে হয়। যেখানে গৃহের বায়ু কেবল জানালা-দরজা বন্ধ রাখিবার ফলেই দূষিত হয়, সেখানে তাহা জানালা-দরজা খুলিয়া দিলেই শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। যদি বিস্তীর্ণভাবে একটি সঙ্কীর্ণ সমাজের লোকেরা সকলের সহিত সামাজিকতা স্থাপন করিতে পারে, যদি ব্রাহ্মণেরা আমার উদ্দিষ্ট জাতিটিকে কায়স্থ বৈদ্যদের মত সমাদর করেন, তবে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই আকস্মিক দোষগুলি দূর হইয়া যাইবে, ও সামাজিক সমতা স্থাপিত হইবে। বর্ণিত দোষগুলি যে মানবশরীরের রক্ত-মাংসে গজায় না, কেবলমাত্র সামাজিক অবস্থার ফলে জন্মিয়া ওঠে, সেইটুকুই বুঝিয়া নেওয়ার প্রয়োজন। জন্মমাত্রের দোষ-গুণ অপেক্ষা যে, জন্মের পরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অধিক পরিমাণে আমাদের মানসিক গতি ও চরিত্রের প্রকৃতি নিয়মিত করিয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারিলে উন্নতির পথ প্রশস্ততর করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা না হইলে পূর্বজন্ম ও গ্রহগুলির উপর সকল দোষ চাপাইয়া অলস ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িতে হয়।

ভিন্ন-ভিন্ন জাতি বা বৈবাহ্যকুল স্থাপিত হওয়ায় এদেশে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির মধ্যেই ক্ষয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে কি-না, তাহা বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিবার কথা। সমাজকে প্রসারিত করিয়া বিভিন্ন জাতির সহিত রক্তমিশ্রণ হইতে দিলে উন্নতি হইতে পারে বলিয়া কথঞ্চিৎ নির্দেশ করা গিয়াছে। কিন্তু এত বড় প্রশ্নের বিচারে ঐ ক্ষুদ্র নির্দেশ যথেষ্ট নয়। তাহা ছাড়া অনেক লোকের বিশ্বাস এই—

ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির লোকেরা অন্য জাতির সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করেন না বলিয়াই আপনাদের বংশগৌরব বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। স্ববর্ণে বিবাহ হয় বলিয়া যে, কোন জাতিতে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, একথাও অনেকে স্বীকার করেন না। বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ প্রশস্ত বিচারিত হইলেও কোন্ কোন্ জাতির মধ্যে ঐ প্রকার বিবাহ চলিতে পারে, সে বিষয়েও ভিন্ন-ভিন্ন মত আছে। বংশসংক্রমণে ব্রাহ্মণেরা এমন কিছু পাইয়াছেন কি-না, যাহা অন্য জাতির সহিত বিবাহ হইলে তাঁহাদিগকে হারাইয়া ফেলিতে হইবে, তাহাও বিচার করিবার কথা।

উত্তরাধিকার বা Heredity

৩

বর্ণসঙ্কর দোষের কি-না

বর্ণসঙ্করের স্বাভাবিকতা

মনুষ্য মাত্রেই এক জাতি—একথা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে চাই না। চেহারার বৈষম্য দেখিয়া এক সময়ে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ভাবিতেন যে, এক বংশ হইতেই মানবজাতির উদ্ভব হইতে পারে না; তাঁহারা নিজেরা জন্মিয়াছিলেন দেবতার বংশে, আর অন্যেরা কেহ-বা রাক্ষসের বংশে, কেহ-বা পিশাচের বংশে, ও কেহ-বা নাগ প্রভৃতি নীচ জন্তুর বংশে জন্মিয়াছিল। ম্লেচ্ছ, যবন প্রভৃতি জাতীয়েরা না-কি বশিষ্ঠের কামধেনুর মল-মূত্রে জন্মিয়াছিল। Anthnopozon Biblicum গ্রন্থের ধুয়া ধরিয়া আমাদের সূক্ষ্মতাবাদী Theosophist-দের কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন—মানব-সৃষ্টির আদিযুগে ভ্রষ্টাচারসম্পন্ন নরনারীরা বানর জাতির সম্পর্ক লাভ করিয়া নিগ্রো প্রভৃতি নীচ জাতির উৎপাদন করিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক সমাজে এগুলি বেজায় উপহাসের কথা হইলেও অনেক শিক্ষিত লোকেও এসকল তত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এ পৃথিবীর কোন মানুষই ভূত-পেত্নী, দৈত্য-দানা প্রভৃতির কুলে জন্মগ্রহণ করে নাই। কেহই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গরিলাকুলতিলক নয়, ওরাঙ্-নন্দন নয়, বা বানরবংশাবতংশ নয়; যে কুলে মানবের জন্ম, সে কুলের আদি পুরুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জিদের যে ধরণের কাছাকাছি সম্পর্ক ছিল, তাহা এই প্রবন্ধে বুঝাইবার নয়।

সকল মনুষ্য যে একটি জাতি (Species), তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই—যে-কোন দেশের যে-কোন জাতির নরনারীর পরস্পর বিবাহ হইলে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে ; ও সঙ্করকুলের সন্তানেরা পরস্পরের মধ্যে বিবাহিত হইলে বংশবৃদ্ধি করিতে পারিবে। নর-বানরী সংশ্রবে কখনও সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না। জাতির খাঁটি ঐক্য না থাকিলে এক বর্ণের (Genus) অন্তর্গত অতি নিকটস্থ বিভিন্ন জাতির মিলনে যে সন্তান জন্মে, তাহারা বংশবর্দ্ধন করিবার শক্তি হারায়। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়—আর্য্য, নিগ্রো প্রভৃতিরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'উপজাতি' (sub-species) পর্য্যন্তও নয়,—তাহারা সকলেই এক জাতি, ও তাহাদের বিভিন্নতা কেবলমাত্র Variety বা বৈচিত্র্যসূচক। ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থার ফলে কেহ কাল, কেহ কটা, কেহ শাদা—কেহ খর্ব, কেহ দীর্ঘ—কেহ কুৎসিত, কেহ সুন্দর হয়।

মানবসৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতেই মানবের সভ্যতা বিকাশের সময় পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, সে সময়ের মধ্যে মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র তাহার আবাস স্থাপন করিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকদের মধ্যে যে সেই আদিম যুগ হইতে আন্তর্জাতিক বিবাহ চলিয়াছিল, পণ্ডিতেরা তাহা নানা উপায়ে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মানবতত্ত্ববিদেরা মানব-শরীর ও ভূস্তর-প্রোথিত বহুযুগের নর-কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জগতে এমন জাতি নাই, যাহারা কোন একটা নির্দিষ্ট আদিম-দলের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারিয়াছে। মানুষের সমাজবিকাশের ইতিহাস একটু আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইব যে, যে জাতি যত উন্নতিলাভ করিয়াছে, সে জাতিতে বর্ণসঙ্কর তত অধিক হইয়াছিল। সে ইতিহাসের বিষয়ে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিতেছি।

খাঁটি মানুষের কথাই বল, কিংবা আমাদের বংশ-প্রবর্ত্তক ফলভোজী আদিম কৈষ্কিন্ধ মনুর কথাই বল, সকলেই সঙ্গপ্রয়াসী ছিলেন। অন্যান্য জীবজন্তুতে যোড়া-বাঁধিবার যে প্রবৃত্তি ও অভ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রবৃত্তি ও অভ্যাস, উন্নততর আদিম মানুষে, গরিলা-শিম্পাঞ্জি অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। অন্যান্য জন্তুর মধ্যেও সন্তানাদি হইলে পুরুষকে তাহার স্ত্রী ও স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে দেখা যায়। এই প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে আদিমকাল হইতেই বেশি পরিমাণে বিকসিত হইয়াছিল। শরীর-যন্ত্রের বিশেষ বিবর্ত্তনের ফলে কেবল মানুষই ঠিক্ খাড়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; ও তাহার কণ্ঠযন্ত্র হইতে যে ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল তাহা ঐ যন্ত্রের অভিনবত্বে কথা কহিবার ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। এই সুবিধায় এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মানুষ অন্য জন্তুর অপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে করিতে পারিয়াছিল। কেমলমাত্র আহার সংগ্রহের জন্য উহারা পরস্পরে পরামর্শ করিয়া, অনেক পরিবারে মিলিয়া একটি দল বাঁধিয়াছিল। এইরূপ যে কত দলের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। যে-দল যেখানে অধিক পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, ও সুবিস্তীর্ণ ভূভাগে বিচরণ করিতে পারিয়াছিল, তাহারাই বেশি বংশবৃদ্ধি করিতে পারিয়াছিল, হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল, ও বলশালী হইয়া উন্নত হইতে পারিয়াছিল। যেখানে খাদ্যের আধিক্য ও বাসের সুবিধা, সেখানে যে বহু দল পরে পরে ছুটিয়া আসিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। হয়ত ঐ দলগুলি প্রথমে কোন বিরোধ না করিয়া প্রতিবেশী দল হইয়াই ছিল; কিন্তু পরে পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট দাঙ্গা হাঙ্গামাই হইয়াছিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ে যাহারা উৎসন্ন যায়, বা তাড়িত হয়, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহারা প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া

থাকিতে পারে, অল্পদিনেই তাহাদের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হইয়া মিলন হয়। এই প্রকারে অনেক ভিন্ন-ভিন্ন দল এক-সঙ্গে মিলিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। যে জাতি যত অধিক পরিমাণে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিষ্ঠ দল-গুলিকে আপনাদের অঙ্গীভূত করিতে পারিয়াছিল, সেই জাতি তত অধিক পরিমাণে দুর্জয় হইয়া বিস্তৃত উর্বরা ভূমি লাভ করিতে পারিয়া-ছিল। বিভিন্ন দলের মিলনে পরস্পরের মধ্যে যে বিবাহ চলিত, তাহা ছাড়াও এক সম্প্রদায়ের পক্ষে অন্য সম্প্রদায় হইতে স্ত্রী-সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি সে যুগে বেশি ছিল।

একেত যেসকল বালিকাদের সঙ্গে বাড়িয়া ওঠা যায়, 'নূতনত্ব'-এর অভাবে তাহাদের প্রতি যৌবনে প্রেমের আকর্ষণ হয় না বলিয়া, অপরিচিতা বালিকার প্রতিই প্রেম বিকসিত হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; তাহার উপর আবার সেবা প্রভৃতিতে বিশেষ উপযোগী বলিয়া, ভিন্ন দলের স্ত্রীহরণ করিতে পারা আদিম বর্বরের বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। স্ববংশে বিবাহ না করার প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে কেন-যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহার আভাস দিলাম। আদিম কালে মানুষের এক-একটি দল আপনাদের এক-একটি 'রাজ্যে' (অর্থাৎ গ্রামে) বাস করিত। এই ক্ষুদ্রপরিসর স্থানের মধ্যে যাহারা থাকিত, তাহারা হয়ত মূলে এক বংশের লোক হইত; তাহা না হইলেও, এক গ্রামে এক বেষ্টনের মধ্যে থাকিত বলিয়া সকলের সহিত এক পরিবারের লোকের মত আলাপ পরিচয় হইত। এই কারণে আপনার 'গোত্র' মধ্যেও স্বাভাবিক প্রণয়সঞ্চার হইত না। উপরন্তু অন্য স্থান হইতে মেয়ে অপহরণ করিয়া আনিতে পারা বাহাদুরি ছিল। ক্রমশ যাহারা পরে অন্য দলের অঙ্গীভূত হইত, তাহারাও কল্পিত গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে 'অন্তর্বিবাহ' (endogamy) হইত না।

প্রাচীন কালের সকল উন্নত জাতির মধ্যেই exogamy বা 'বহির্বিবাহ' খুব প্রচলিত ছিল। এই অল্প দৃষ্টান্ত হইতেই পাঠকেরা আভাস পাইতেছেন যে, প্রাচীন কালের উন্নতির মূলে 'বহির্বিবাহ' একটা প্রধান জিনিস ছিল; আর এই 'বহির্বিবাহ'-এর অর্থ-ই ভিন্ন-ভিন্ন দলের বিবাহ বা বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি।

সামাজিক বিশিষ্টতা ও সঙ্কীর্ণতার ফল

যে জাতি আপনাদের গণ্ডির মধ্যে বাঁধা পড়িয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, প্রধানভাবে দুইটি কারণে তাহাদের ক্ষয় বা উচ্ছেদ হইয়া থাকে। প্রথম কারণটি এই যে, অন্য জাতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না বলিয়া, কোন প্রকার ভাবের আদান প্রদান চলিতে পারে না; কাজেই মানসিক বিকাশের অভাবে মূঢ়তা ও বর্বরতা সে জাতির উন্নতির পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষীয় জাতিসমূহের পক্ষে, বিশেষত উচ্চ জাতিদের পক্ষে, এ সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই,—হইবার সম্ভাবনাও অধিক নাই। মাদ্রাজ প্রদেশের নাম্বুথিরি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি ভীষণ ক্ষয়সাধক গণ্ডির মধ্যে বাঁধা পড়ে নাই। শৈশবকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সকলেই সকল জাতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া ভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকেন, বিদ্যালয়ে ও কর্মক্ষেত্রে জাতিনির্বিশেষে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, ও কালের ব্যবস্থার ফলে সকলকেই বহুদেশের সমাজ ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইতে হয়। যাঁহারা নিজেরা মানসিক ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইয়া, অন্য দশজনকে কেবল মাত্র স্বজাতির বা স্বধর্মের গ্রন্থ পড়িতে বলেন, তাঁহাদের কথায় কেহ বড় কর্ণপাত করে না; অন্ততঃ ক্ষুধার উত্তেজনায় ও পদগৌরবের লোভে প্রায় সকলকেই গণ্ডির বহির্ভূত ভাবের সংস্পর্শে আসিতে হইতেছে। সাহিত্যচর্চাদিতে

বাধা দেওয়া অসম্ভব দেখিয়া কোন-কোন সঙ্কীর্ণমনা ধর্ম-উপদেষ্টা আমাদিগকে ধর্মের বেলায় কেবল স্বদেশের শাস্ত্র পড়িতে বলিয়া থাকেন। কেহ-কেহ যে এই উপদেশ ভুলিয়া আপনাদের মানসিক ও নৈতিক অধোগতির পথ প্রশস্ত করিতেছেন না, তাহা বলিতে পারিনা; কিন্তু ইহাঁরা অধিকদিন আত্মপ্রতারিত হইয়া থাকিতে পারিবেন না,—নিশ্চয়ই বিধাতার বিশ্বজগতের সর্বত্রপ্রচারিত সত্য আদর করিয়া গ্রহণ করিবেন। কেহ-কেহ হিন্দুর জন্য ও মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আমাদের সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছেন। এদেশের লোকেরা ইতিপূর্বে কখনও খ্রিষ্টিয়ান, মুসলমান ও হিন্দুদের একসঙ্গে বিদ্যাভ্যাসের বিরোধী হন নাই।—ইউরোপে কাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট প্রভৃতি সম্প্রদায় নিজের-নিজের কলেজে পড়িয়া থাকেন। কিন্তু এ-দেশের উদার বুদ্ধিতে এপর্য্যন্ত সে প্রকার সঙ্কীর্ণতা জন্মিতে পারে নাই; ইহা দেখিয়া ইউরোপীয়েরাও বিস্মিত হইয়াছেন, ও আমাদিগকে প্রশংসা করিয়াছেন। ইউরোপীয় বালকদের পক্ষে সামাজিকতার অন্য যেসকল দিক্ আছে, তাহাতে বিদ্যালয়ের বিভিন্নতা বড় বেশি অনিষ্ট করিতে পারে না। আমাদের কিন্তু ইউরোপীয়দের মত অন্যান্য সুবিধা কিছুই নাই; অথচ যে সুবিধায় শৈশব হইতে মিলিয়া-মিশিয়া, ধর্মভেদ ও জাতিভেদ উপেক্ষা করিয়া মনকে প্রশস্ত করিবার পথ ছিল, সে পথেও কাঁটা দিতে চাহিতেছি।

সামাজিক সঙ্কীর্ণতার ফলে যে, সমাজ ক্ষয় হয়, তাহার দ্বিতীয় কারণটি সকল সমাজের পক্ষেই প্রযোজ্য। গণ্ডি বাঁধিয়া, একটি ক্ষুদ্র সমাজ বা ক্ষুদ্র জাতির মধ্যে যদি বিবাহ চলে, তাহা হইলে নব রক্তের অভাবে জাতীয় জীবনে অনেক বিপত্তি উপস্থিত হয়। রক্তের নবতা যে, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, তাহাতে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কিছুমাত্র মতভেদ

নাই। তবে এই রক্তমিশ্রণের সময়ে কোন্ জাতির সহিত কোন্ জাতির বিবাহ দেওয়া উচিত, তাহা সতর্কতার সহিত স্থির করিতে হয়; সে কথাও পরে বলিতেছি। মানুষেরা সকল যুগেই কিন্তু আপনাদের অভিজ্ঞতায় এ কথা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, একই রক্তের ক্রমাগত মিলন অপেক্ষা, বিবাহে নব রক্তের মিশ্রণ হইলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অনেক উপকার হয়। এই জন্য সভ্য হোক, অর্দ্ধসভ্য হোক, কিংবা নিতান্ত বর্ব্বর হোক, সকলের মধ্যেই অনেক পরিমাণে 'বহির্বিবাহ' রক্ষা করিবার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্য-অন্য অনেক দেশের অনেক জাতির মত ভারতবর্ষের আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মধ্যেও স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। গোত্র জিনিসটা মূলে একটা কল্পিত জিনিস,—খাঁটি এক বংশ নিয়া গোত্রের উৎপত্তি নয়। সে যাহাই হোক, এ কথা কিন্তু কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে, একালে যাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলি, বৈশ্য বলি, কায়স্থ বলি, তাঁহাদের কাহারও গোত্র আপনাদের বংশজ্ঞাপক নয়। যতগুলি দল বা বংশ একজন পুরোহিতের পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পুরোহিতের গোত্রের নামে এক গোত্রের লোক হইয়া গিয়াছেন। অনেক অনার্য্যদের গোত্র বা 'কিলি'-ও যে ঠিক্ একবংশ-জ্ঞাপক নয়, তাহাও অনার্য্যদের জাতির বিবরণে পাই। কোন একটি বংশের একটি নিকটস্থ শাখার মধ্যে বিবাহ যত কম হয়, ততই ভাল। উহাতে নিকটস্থ রক্তসংমিশ্রণে জাতির ক্ষয় সাধন হইতে পারে। কিন্তু কেহ যদি সযত্নে এক একটি বংশের বৈবাহ্য কুলের সংবাদ নেন্ তবে দেখিতে পাইবেন যে, ভিন্ন গোত্রে বিবাহ দেওয়াতে অনেক স্থলেই অতি নিকটস্থ রক্তের মিশ্রণ করা হইতেছে। যে-যে বংশের সহিত যাহার-যাহার বিবাহ চলিতেছে, তাহাদের পক্ষে সেই বংশগুলি একরকম

নির্দিষ্ট সংখ্যায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কাজেই ক্রমাগত আদান-প্রদানের ফলে, কল্পিত স্বগোত্রের লোক অপেক্ষা ভিন্ন গোত্রের লোকেরা অধিক পরিমাণে রক্তের নৈকট্য স্থাপন করিয়াছে। একই বংশে বিবাহ তিরোহিত করিবার অভিপ্রায় মৈত্রে-মৈত্রে কেহ যদি বিবাহ না দিতে চান, নাই দিলেন ; কিন্তু এক গোত্র বলিয়া মৈত্র-ভাদুড়ীতে বিবাহ বন্ধ করার কোন যুক্তিই নাই ; বরং সে বিবাহে একটু বেশি দূরের রক্ত পাইবারই অধিক সম্ভাবনা। যাহা হোক, আমরা এই প্রথা হইতেই দেখিতে পাইতেছি যে, ভিন্ন-গোত্র-বিবাহের নামে আমরা অধিক পরিমাণে নিকটস্থ রক্তের মিশ্রণ করিতেছি। তাহা ছাড়া জাতির গণ্ডিতে বদ্ধ এক-একটি জাতিতে বহুকাল পর্য্যন্ত বিবাহ হইলে ধীরে-ধীরে যে বংশ-উৎপাদন-ক্ষমতা তিরোহিত হয়, সে-কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন।

বংশলোপের কথা শুনিয়া অনেকেই ভীত না হইয়া বরং উল্টা একটুখানি বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন। একদিন একজন বন্ধুর সঙ্গে এ-কথার প্রসঙ্গ উঠিতেই তিনি আমারই রচিত একটি তামাসা-কবিতার একটি ছত্র আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—"বেড়ে যাচ্ছে ছেলে-মেয়ে, ধন দৌলত বাড়ে না।" আমরা ক্ষয়শীল বা dying race কি-না, এই কথা নিয়া যখন একবার তর্ক উঠিয়াছিল, তখন আমাদের বংশবহুলতার অনুকূলে অনেক অবৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শিত হইতে দেখিয়াছিলাম। ১৯০১ সালের আদমস্সুমারির বিবরণে দেখিয়াছিলাম যে, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুজাতির লোকেরা, ও বিশেষভাবে সঙ্কীর্ণসমাজভুক্ত নিপুণ শিল্পজীবীর (skilled artisans) সংখ্যায় কমিয়া আসিতেছেন। কথাটা যদি সত্য হয়, তবে বিশেষ করিয়া ভাবিবার কথা। কিন্তু এত বড় একটা কথা কেবলমাত্র সংখ্যা গণিয়া স্থির করা চলে না ; কারণ সংখ্যা-গ্রহণে

ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা (বিশেষত এ দেশে) বড় অধিক। যাহা হোক, আমরা যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাকৃত নিয়মগুলি ভাল করিয়া আলোচনা করি, তাহা হইলে ভাল হয়। যে কারণে জীবের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়, যদি সেই কারণ দুর-ভাবেও আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকে, তবে অতি শীঘ্র তাহার প্রতিষেধের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পুরুষ বা নারী-সম্প্রদায় অতি অলক্ষ্যে ধীরে-ধীরে সন্তান-জনন-ক্ষমতা হারাইয়া থাকেন ; সহসা সেই ক্ষয়ের গতি লক্ষ্য করা যায় না, ও কিছু পরিমাণে লক্ষ্য করিতে পারিলেও কি কারণে তাহা ঘটিতেছে, লোকে তাহা ধরিয়া উঠিতে পারে না। তাহার পর যেদিন বিশেষভাবে ক্ষয়ের লক্ষণ ফুটিয়া ওঠে, সেদিন কোন উপায়েই তাহার প্রতিকারের পন্থা দেখা যায় না। সেদিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের একটা অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারিবে বটে, কিন্তু সে জ্ঞানে মুক্তির পথ প্রসারিত হইবে না। যমের পুরীতে একবার পা বাড়াইলে কেহই পিছাইয়া আসিতে পারে না। কাজেই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, যাহা নিশ্চয়ই ধ্বংসের কারণ, তাহা আমাদের সমাজে উপস্থিত হইয়াছে কি না? এই কারণে এক-দুই করিয়া সমাজ-বিজ্ঞানের ও জীবন-বিজ্ঞানের (Biology) কয়েকটি প্রধান-প্রধান সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের সমাজের অবস্থা বিচার করিতেছি।

(১) অতি নিকট সম্পর্কে বিবাহ হইলে বড় কুফল ফলে—অন্যান্য জাতির লোকের মত আমাদেরও এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তবুও এ বিষয়ে বড় লোকের কথা উদ্ধার করা চলে। ডারউইন তাঁহার গৃহ-পালিত জীব ও উদ্ভিদ্-বিষয়ক গ্রন্থে (Animals and Plants under Domestication) লিখিয়াছেন যে, বহুকাল ধরিয়া নিকট সম্পর্কে বিবাহ চলিলে বংশটির বলক্ষয় হয়, আকৃতি খর্ব হয়, উৎপাদনের ক্ষমতা

নষ্ট হয়, ও অঙ্গের বিকৃবতা জন্মে। ইংরেজিতে কথা কয়েকটি এই—The consequences of close inter-breeding carried on for too long a time are loss of size, constitutional vigour and fertility, sometimes accompanied by a tendency to malformation. স্বগোত্রে বিবাহ না হইলেও, আমাদের সমাজে যে প্রকৃতপক্ষে বিবাহে নিকট-রক্তের মিশ্রণ হয়, তাহা বলিয়াছি।

(২) অনেক সময়ে যত্ন-পূর্ব্বক inbreeding (নিকট সংযোগ) করাইলে যে, বংশের কোন-কোন গুণ সন্তান-শরীরে দৃঢ় হয়, তাহাও স্বীকৃত। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, যেসকল গরু বা ঘোড়া ঐভাবে breederদের হাতে জন্মিয়াছে, সেগুলি একদিকে বিশেষ গুণের জোরে বেশি মূল্যে বিক্রীত হয় বটে, কিন্তু তাহারা অল্পকালের মধ্যেই উৎপাদন-ক্ষমতা হারায়। Weismann প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সকলেই পরীক্ষা করিয়া এই সত্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

(৩) আভিজাত্যের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য যে-সকল বড়লোকেরা কেবল বড়লোকের সমাজের মধ্যে বিবাহ চালাইয়া, বড়লোকদের একটা বৈবাহিক সম্বন্ধের গণ্ডি আঁকিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক স্থলেই যে বংশলোপ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের স্বজাতীয় বিবাহে ইহা ঘটিতেছে কি-না, ও বিশেষভাবে কৌলিন্যে এই ফল ফলিতেছে কি-না, তাহা বংশলোপের অন্যান্য কারণের সমালোচনায় নিরূপিত হইতে পারে। বড়লোকের বিবাহের সম্বন্ধে এইটি নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, অতিপুষ্টির ফলে আলস্য ও ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্ণয়ে প্রেমের আকর্ষণের দিক্ উপেক্ষিত হয় বলিয়া, অনেকের যৌন প্রবৃত্তি পাপের পথের পরিচালক হয়। তাহা ছাড়া কঠোর দারিদ্র্য যেমন

মানুষের মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন সাধন করে, অর্থবাহুল্যে বিলাস আসিয়াও ঠিক্ তেমনইভাবে মানুষকে মূঢ়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও পাশব-ধর্ম্মবিশিষ্ট করিয়া ফেলে।*

আমাদের দেশের উচ্চ শ্রেণীর জাতির লোকেরা সকলেই বড়মানুষ নন্। বরং বলিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের অধিকাংশ লোকই মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক। নিকট-রক্তের বিবাহে তাঁহাদের যে অধোগতির সম্ভাবনা থাকে, থাক্; কিন্তু যাহা বিলাসের ফলে ঘটে, তাহা তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ নাই। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে-প্রণালীতে পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচিত হয়, তাহাতে 'প্রেমে পড়া' অপেক্ষা আভিজাত্য রক্ষার দিকেই দৃষ্টি অধিক। আমি প্রেমের পূর্ব্বরাগের কথা বলিতেছি না; বিবাহের পরে উপযুক্ত বয়সেও যৌন আকর্ষণের প্রবলতা ঘটিতে পারে। তাহা না ঘটিলে যে, পুরুষের পক্ষে পরদার-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা 'প্রেমে পড়া' কথাটা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকি; কিন্তু বংশের জীবনীশক্তির জন্য ইহার বৈজ্ঞানিক মূল্য অত্যন্ত অধিক।

সম্পর্কিত লোকদের মধ্যে অতি শৈশবকাল হইতে বালক-বালিকার পরিচয় হয়, ও সেই পরিচয়ের ফলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের স্নেহের বন্ধন জন্মে। জোর করিয়া 'স্ত্রী' করিয়া নিয়া সে শ্রেণীর কোন বালিকাকেও গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা তাহাতে স্বভাবজাত স্নেহের ভাবকে দলিয়া ফেলিয়া নূতন ভাব জন্মাইয়া নিতে হয়। মানুষ

---

* আভিজাত্য রক্ষার চেষ্টার বাড়াবাড়িতে মিসর প্রভৃতি অনেক দেশে রাজপরিবারে ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছিল। রাজবংশের রক্তের পবিত্রতা রাখিতে গিয়া কেবল বংশলোপই সাধিত হইয়াছে।

যদি একবার এক শ্রেণীর পবিত্র স্নেহকে পদদলিত করিতে শেখে, আর স্নেহের পাত্র-পাত্রীতে জোর করিয়া যৌন আকর্ষণ ফুটাইয়া তোলে, তাহা হইলে অন্য যেসকল স্থলে সম্পর্কের মর্য্যাদা থাকে, তাহাও ভাঙ্গিয়া যাইবার পথ পরিষ্কার হয়, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যেখানে যৌন আকর্ষণ হওয়া উচিত, সেখানে তাহাকে বিকসিত না করিয়া, কেবলমাত্র যৌন উত্তেজনার খাতিরে, তাহাকে কোন একটা স্থানে বাড়িতে দিলে, পবিত্রতার স্বাভাবিক স্থায়ী মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ইহাতে যে চরিত্র-গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িবার কথা, তাহা সকল সমাজতত্ত্ববিদেরাই একবাক্যে স্বীকার করেন।

বঙ্গদেশের বাহিরে বিবাহিতা পাত্রীকে যৌবনসীমায় পা দিবার পূর্বে গৃহে আনিবার প্রথা নাই। কেবল আমাদের উন্নত বঙ্গদেশের ঋষিরাই শিশু বধূকে গৃহে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যখন যৌন আকর্ষণের কথা স্বপ্নেও থাকে না, সেই সময় এক পরিবারের অন্য বালকবালিকাদের সহিত এই বালিকা বাস করে। যদি ঐ বাসের ফলে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে একটা 'মনের টান' জন্মিয়া যায়, তবে সে মনের টান নিতান্ত অন্যবিধ। তাহার সহিত ভ্রাতা-ভগিনীর স্নেহাদির কতক তুলনা করা চলে। সেই শ্রেণীর 'মনের টান' বা স্নেহের ভিত্তির উপর যৌন আকর্ষণের সৃষ্টি হইলে মানুষের মনে নৈতিক অধোগতি জন্মে।

এ দেশে বধূদের পক্ষে মুখে ঘোমটা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এক পরিবারে বাস করিলে, পরিবারের সকলের সহিত যে সাধারণ সৌহার্দ জন্মে, সেই প্রকার সৌহার্দ ও স্নেহ, বধূর স্বামীর মনে জাত না হওয়া উচিত। নব-বধূ সকলের সমক্ষে স্বামীর সহিত কথা কহিতে পারেন না, ও ঘোমটা দিয়া পরিবারের অন্য সকলের সহিত পৃথক্ বলিয়া সূচিত হইয়া থাকেন; আর ঐ ঘোমটার ফলে স্বামীর দৃষ্টিতে বধূর

'নবতা'ও কিছু রক্ষিত হয়। যতদিন বালিকা-বধূর অকালে স্বামি-গৃহে বাস করিবার অতি কুৎসিত প্রথা বজায় থাকিবে, ততদিন বধূর পক্ষে ঐ ঘোমটার বিধি ও সর্বসমক্ষে কথা না কহিবার নিয়ম—মন্দের-ভালরূপে বজায় থাকা বাঞ্ছনীয়। বালিকারা যে-বয়সে খেলা করিয়া অবাধ প্রফুল্লতা লাভ করিতে পারে, ও প্রফুল্লতা-লাভের ফলে জীবনী-শক্তি বাড়াইতে পারে, সে বয়সে তাহাদিগকে আদব-কায়দা শিখিয়া গাম্ভীর্য্য অভ্যাস করিতে হইলে যে, জীবনীশক্তির ক্ষয় হয়, তাহাও স্মরণ রাখা উচিত।

যৌন আকর্ষণকে পাশব প্রবৃত্তি বলা নিতান্ত মূঢ়তা। স্বাভাবিক-ভাবে উপযুক্ত কালে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীতে উহার বিকাশ হইলে, মানবের নৈতিক স্থিতির মূলটি দৃঢ় হয়। শরীরের দিক্ দিয়াও উহার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কেহ যেন মনে না করেন যে,—অধিক বয়সে বিবাহ হয় বলিয়া ইউরোপে সর্বত্রই 'প্রেমে-পড়া' বিবাহ হইয়া থাকে। টাকাকড়ি, পদমর্য্যাদা প্রভৃতির লোভে ইউরোপে অনেক বিবাহ হইয়া থাকে বলিয়া যেসকল বিষময় ফল ফলিতেছে, তাহা নিয়া সমাজতত্ত্ববিদেরা বিশেষ আলোচনা করিতেছেন।

(৪) কোন একটা প্রকৃত বা কল্পিত গুণ রক্ষা করিবার জন্যও বংশনিষ্ঠ কতকগুলি ভাব আর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে-প্রকারের জাতিভেদের সৃষ্টি হয়, তাহার দৃষ্টান্তও ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র অনেক পাওয়া যায়। সে সকল সমাজের বিশেষ বিবরণ এখানে দেওয়ার প্রয়োজন দেখিতেছি না। ঐরূপ ধরণে যেসকল বাছা বাছা দল বা জাতির সৃষ্টির ইতিহাস আছে, সে সকল স্থলে যে যথার্থ ও কল্পিত গুণ বংশনিষ্ঠ করিবার চেষ্টায় আর বংশমর্য্যাদার জন্য ক্রমাগত বিশেষ শ্রেণীর পাত্রী

বিবাহ করার ফলে, ঐ দল বা জাতিগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক সাক্ষী অগ্রাহ্য করা চলে না। Weismann প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলিতেছেন—No one can deny the fact of the great infertility of what we believe to be types and stocks of high social efficiency. বহু জাতির উত্থান-পতনের দৃষ্টান্ত বিচার করিয়া শ্রীযুক্ত টম্‌সন তাঁহার Heredity গ্রন্থে লিখিয়াছেন—Over and over again, in the history of mankind, *elect castes*—true aristocracies—have arisen, only to disappear again in *sterility*, or in the course of inter-societary struggle. Even if the latter doom be averted by more evolved social organization and racial pacification, how are we to face the fact of the dwindling fertility of what we believe to be the better stocks? কথা কয়েকটির ভাব-অর্থ এই যে—পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বহুতর জাতির বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, যাহারা, বিশেষ গুণবান্ জাতি হইবার জন্য গণ্ডি বাঁধিবার ফলে, উৎপাদন ক্ষমতা হারাইয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় হঠিয়া গিয়া লোপ পাইয়াছে। সামাজিক বিশেষ বিধানে শেষ কুফলটি এড়াইতে পারা যাইতে পারে; কিন্তু গণ্ডি বাঁধিয়া গুণে বড় হইলে যে নির্বংশ হইবার পথ প্রশস্ত হয়, সে সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার থাকে না।

(৫) সমাজক্ষয় সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবেচনার কথা—বিশেষ গুণ রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যেসকল 'বিশিষ্ট জাতি' (elect castes) সৃষ্টি হয়, সমাজতত্ত্ব বিদ্‌দের বিচারে তাহারা ধ্বংসপ্রবণ বলিয়া বিচারিত হইয়াছে বটে; কিন্তু আমাদের দেশে ব্রাহ্মণাদি বিশিষ্ট জাতিতে এই

ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে কি-না? আদমসুমারির তালিকায় ভুল থাকিতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি। ভুল থাকিতে পারে বলিয়া যে তাহা সম্পূর্ণ ভুল, এ কথা বলা চলে না। যাহা হউক, সামাজিক স্থিতি বা জীবনীশক্তির যেসকল লক্ষণ সমাজতত্ত্বে নির্ণীত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া পাঠকদিগকেই বিচার করিতে দিতেছি যে—আমাদের বিশিষ্ট জাতির মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির মধ্যে কোন্ লক্ষণটি অধিক দেখিতে পাওয়া যায়? (ক) High Vitality Class অর্থাৎ অধিক জীবনীশক্তিবিশিষ্ট সমাজ। এই সমাজের লক্ষণ এই যে, সেখানে জন্মসংখ্যা অধিক ও মৃত্যুসংখ্যা কম। ইউরোপ ও আমেরিকার স্বচ্ছল কৃষক সম্প্রদায় এই শ্রেণীর অন্তর্গত; (খ) Medium Vitality ɯlass অর্থাৎ মাঝারি রকমের জীবনীশক্তিবিশিষ্ট সমাজ। এ সমাজের লক্ষণ এই যে, সেখানে জন্মসংখ্যাও যেমন তুলনায় অধিক নয়, মৃত্যুসংখ্যাও তুলনায় সেইরূপ কম; (গ) Low Vitality ɯlass অর্থাৎ অল্প-জীবনীশক্তিবিশিষ্ট সমাজ। এই সমাজে জন্মসংখ্যাও যেমন খুব অধিক, মৃত্যুসংখ্যাও তেমনই অত্যন্ত অধিক। এদেশের বিশিষ্ট জাতির মধ্যে যে এই শেষ অবস্থাটি অধিক লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহাই আমার অভিজ্ঞতা। যে সমাজে শিশুর মৃত্যু অধিক, প্রৌঢ় বয়সেই বার্দ্ধক্যের অকর্মণ্যতা বেশি ফুটিয়া ওঠে, আর সমাজে জীবন্ত আশীর্বাদরূপে অবস্থিত বৃদ্ধদের সংখ্যা কম পড়ে, সে সমাজ যে নিতান্ত ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইতেছে,—যমরাজা যে বিশেষ করিয়া সে জাতির টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই। একটু বৃদ্ধ হইলেই যে আমাদের দেশের লোক এখন কাজের বাহির হইয়া পড়ে, ও কোন প্রকারে ভীমরতি-গ্রস্ত হইয়া জড়ের মত বাঁচিয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করা যায় কি?

জাতির জীবনীশক্তি সম্বন্ধে Hansen কৃত যে তিনটি বিভাগের উল্লেখ

করিলাম, তাহা প্রোফেসর Levasseur, M. Dumont, Miss Brownell প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের বিচারে যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত। বহুদিন পূর্বে বিখ্যাত স্পেন্সার তাঁহার Biology গ্রন্থেও এই তত্ত্বের আভাস দিয়াছিলেন। জন্মমৃত্যুর এই সকল বিচার হইতে, সমাজক্ষয়ের বিষয়ে সাধারণ লোকের মনে দৃঢ় ধারণা হওয়া শক্ত, কারণ একে পর্য্যবেক্ষণের অভাব; তাহার পর সামাজিক দায়িত্ববোধ অতি অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সকল কথা উড়া theory বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি; কিন্তু তাহাতে যমকে ভুলান যাইবে না। যখন ক্ষয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইবে, যখন পুরুষ-নারীর শরীরে বংশবর্দ্ধিনী শক্তি অধিক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরা পড়িবে, তখন আর শোধরাইবার পথ থাকিবে না। তখন আমাদের দুঃখলব্ধ অভিজ্ঞতা আমাদিগকে পণ্ডিত করিতে পারিবে; কিন্তু জীবনীশক্তি দিতে পারিবে না। নিষেধসত্ত্বেও বালক যখন পড়িয়া মরিবার মত যায়গায় বসিয়া বলে—কৈ, আমি পড়ি নাই ত, তখন কেহ তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া থাকেন কি? পণ্ডিতেরা বহু সমাজ ও বহু ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যেসকল সিদ্ধান্তে আসিতেছেন, আমরা যদি আপাতত আত্মক্ষয় না বুঝিতে পারিয়া সে জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করি, তবে কি বুদ্ধিমানের কার্য্য করা হইবে? যে কারণে দশটা সমাজ ভাঙ্গিয়া গেল, সে কারণ আমার পক্ষে অপ্রযুক্ত হইবে বলিয়া যিনি নিজের মহিমার বড়াই করেন, তাঁহাকে অন্ধ ও মূর্খ বলিলেও যথেষ্ট তিরস্কার করা হয় না।

রক্ত মিশ্রণে কি দোষ নাই?

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, মানব সমাজকে একমাত্র Biology বা জীবনবিজ্ঞান দিয়া শাসন করা চলে না। রক্তমিশ্রণে সুপুষ্ট শরীর ও

দীর্ঘজীবন লাভ হইতে পারে, কিন্তু উহাই মনুষ্যত্বের আদর্শ নয় আর সমাজের একমাত্র স্থিতির কারণ নয়। একথা আংশিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি। কথা এই—জীবন-বিজ্ঞানের আইন যে, সামাজিক নৈতিক বিকাশের আইনের বিরোধী নয়,—ভৌতিক শরীরের আইন-কানুন যে আত্মার আইনকানুনের অপরিত্যাজ্য ভিত্তি, তাহা আমরা অল্প প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারি। আমরা রক্তমিশ্রণ করিয়া কেবল 'চোয়াড়' হইয়া উঠিব, ইহা কাহারও আদর্শ নয়। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক, স্নায়ুচক্র, ও মাংসপেশী যদি সুস্থ ও সতেজ না হয়,—যদি এ দেহ-মন্দির আত্মার বাসের সুদৃঢ় গৃহ না হয়, তবে কোন দিকের কোন উন্নতিই সম্ভবপর হয় না।

নৈতিক হিসাবে রক্তমিশ্রণের প্রত্যক্ষ দোষ দেখাইবার জন্য অনেকেই এমন অনেক শ্রেণীর উল্লেখ করিয়া থাকেন, যাহাদের উৎপত্তি পাপে, পরিবর্দ্ধন প্রতিবেশীর ঘৃণায়, ও জীবন-যাপন সমাজের দূর প্রান্তে হইয়া থাকে। মানবতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ফেলিক্স ফন লুসান (Felix Von Luschan) এক স্থলে লিখিয়াছেন—It would be absurd to expect from the union of a good-for-nothing European with an equally good-for-nothing black woman, children that march on the heights of humanity, and we know of many half-castes that are absolutely *sans reproche*.

বর্ত্তমান যুগে যে রক্তমিশ্রণের ফলে অনেক জাতির শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এ দৃষ্টান্তের কিছুমাত্র অভাব নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্মনি বহুবিধ রক্তমিশ্রণের গৌরবের সাক্ষী। তবে একথা সত্য যে, যাঁহারা শিক্ষায় উন্নত, চরিত্রে মহৎ আর শিক্ষা ও চরিত্রের অনুকূল দেহ-যন্ত্রের অধিকারী, তাঁহারা অতি হীন, বর্বর

ও দুরাচার জাতির সহিত রক্তমিশ্রণ করিতে পারেন না। যাঁহাদের সঙ্গে যৌলিক অনেক বিষয়ে প্রভেদ আছে, তাহারা উন্নত হইলেও তাহাদের সঙ্গে রক্তমিশ্রণে শুভফল উৎপন্ন হয় না। এস্থলে সম্পূর্ণ জীবনবিজ্ঞান দিয়া মনুষ্যসমাজ শাসিত হইতে পারে না। মনুষ্যেতর জীব-জন্তুরা ঠিক্ মানুষের মত সমাজ বাঁধিয়া বাস করে না। মানুষ যখন একজনকে বিবাহ করে, তখন তাহাকে অন্য সমাজের সম্পর্ক ও প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়। স্বামী যদি স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে তাহার জন্মনিকেতন বা সমাজ হইতে দূরে নিয়া যান, তাহা হইলে একদিকে স্ত্রীকে জলাশয়বর্জিত মাছের মত দুরবস্থায় পড়িতে হয়; অন্যদিকে আবার সম্পূর্ণ নূতনত্বের মধ্যে বুদ্ধি বড় ভাল হইতে পারে না। এইজন্য যেখানে external heritage বা বাহ্য-উত্তরাধিকারের মিল নাই, ও জাতীয় রীতি-নীতি বা প্রকৃতিতে অধিক বৈষম্য আছে, সেখানে রক্তমিশ্রণ শুভফল প্রদান করে না। সভ্য জাতিদের মধ্যেও যেখানে সভ্যতায়-সভ্যতায় অত্যন্ত প্রভেদ, সেখানে বৈবাহিক মিলন সম্ভব হইতে হইতে পারে না।

প্রভেদ যেখানে অত্যন্ত অধিক, সেখানে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ হইতেও দেখা যায় না। এসকল স্থলে জীবনবিজ্ঞানের নিয়ম কিরূপ সূক্ষ্মভাবে মনের মধ্যে কার্য্য করে, তাহা ধরিবার জন্য পণ্ডিতেরা অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। কেন-যে এক-একটি জাতি প্রায় আপনার অনুরূপ জাতি না পাইলে বিবাহ সম্বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তাহা ঠিক্ বলিয়া ফেলা কঠিন। হয়ত বা যাহাদের মুখের হাবভাবের সহিত আমাদের পরিচয় নাই, তাহাদের দৃশ্যে আমাদের মন ফুটিতে পায় না; হয়ত-বা জাতিতে-জাতিতে সৌন্দর্য্যের আদর্শ নিয়া যে ভেদবুদ্ধি আছে, তাহাতে আমরা আত্মসমাজের, বাহিরের সুন্দরীদের অঙ্গসৌষ্ঠবে মুগ্ধ

হই না ; হয়ত বা বহুকালের সঞ্চিত জাতীয় প্রবৃত্তি রূপজ মোহ সৃষ্টির পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। ডারউইনের Descent of Man গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ৩৮১ পৃষ্ঠায় আছে যে, যে-নিগ্রোদিগকে আমরা অতি কুৎসিত মনে করি, তাহারা ইউরোপের পরমা সুন্দরী রমণী দেখিয়া কোন প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করে না ; কিন্তু তাহাদের চক্ষে নিগ্রো-সুন্দরী বড় মোহিনী। যে কারণে বনিয়াদি বড়মানুষ দরিদ্রের গৃহে বিবাহ করিতে চায় না, ও শিক্ষিত ব্যক্তি চাষার মেয়েকে বিবাহ করিতে চায় না, ঠিক্ সেই কারণেই একজন সুসভ্য লোক নীচ ও বর্বর সমাজের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চান না। এস্থলে এই সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ঠেলিয়া বিবাহ সম্বন্ধ করিতে গেলে সুফলের কিছুমাত্র আশা করা যায় না। তবে যাঁহারা রীতি-নীতিতে, আচার-ব্যবহারে, শিক্ষা ও সভ্যতায় একরূপ হইলেও, কোন প্রাচীন প্রথার হিসাবে বা অন্য কোন কারণে পরস্পরে বিবাহাদি করেন না, তাঁহারা মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কারগুলি পরিহার করিলেই শুভফলদায়ক মিলন বিধান করিতে পারিবেন।

ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বহুযুগ ধরিয়া রক্তমিশ্রণ চলিয়াছিল। বরং বলিতে পারা যায় যে ভারতের অনেক অনার্য্যজাতীয়েরা কিছু পরিমাণে তাহাদের বংশ বা সম্প্রদায়নিষ্ঠ রক্তের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। গীতাকারের অর্জুন ভবিষ্যতে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু 'কুন্তীনন্দন' অর্জুনের বংশের ইতিহাসে রক্তের পবিত্রতার কথা বড় নাই—ও তিনি স্বয়ং বিভিন্নজাতীয়া রমণীর প্রেমের পাত্র হইয়া বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করিতে ছাড়েন নাই। মনুর ব্যবস্থায় যখন পড়িতে পাই—ব্রাহ্মণের শূদ্র পত্নী থাকিলে তিনি সেই শূদ্র পত্নীকে

নিয়া যজ্ঞ করিতে পারিবেন না, তখন একদিকে তৎপূর্ব সময়ের পূর্ণ অধিকারের কথা ও অন্যদিকে তৎসময়েও শূদ্র পত্নীর অস্তিত্বের কথা সূচিত হয়। পুরাণের বংশাবলীর তালিকায় যখন পড়িতে পাই—দলে-দলে অনেক ক্ষত্রিয়-বংশ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তখন বৈদিক যুগের বহু পরবর্তী সময়েও যে জাতিভেদের কড়াকড়ি নিয়মের সৃষ্টি হয় নাই, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া যেমন করিয়া পরে-পরে বিভিন্ন জাতির রক্তমিশ্রণ ও রক্তমিশ্রণ বিষয়ে নিষেধ-বিধি হইয়াছিল, এখানে তাহা অতি সংক্ষেপেও লেখা চলে না। যোগেন্দ্র শিরোমণির জাতি বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থে পাঠকেরা এ বিষয়ের কোন-কোন বিভাগের অনেক সংবাদ পাইতে পারিবেন। এখানে গোটাকতক অতি প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

অতি প্রাচীনকালে গ্রীক-যবন, শক, পহ্লব ও হূণ প্রভৃতি অনেক বিদেশীয় উচ্চ জাতির লোকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশের লোক হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা যে প্রথমে ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও পরে কুলীন ক্ষত্রিয় বলিয়া সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন, সে ইতিহাস এখন প্রায় সকলেই জানেন। এই সকল শক, যবন, পহ্লবাদি জাতির যেসকল লোক আপনার লোকদের মধ্যে পৌরোহিত্য কার্য্য করিতেন, তাঁহারা উপমানের জোরে, অথবা সদৃশ অবস্থার কল্পনায় ব্রাহ্মণ বলিয়া বিচারিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়া তাঁহারা সকল ব্রাহ্মণের সঙ্গেই বিবাহাদি করিয়াছেন; কাজেই শক, যবনাদি সম্পর্কে কেবল ক্ষত্রিয়ের বংশধরেরাই সম্পর্কিত নন্। মুসলমান অধিকারের পূর্বসময় পর্য্যন্ত স্মৃতির বিধান অনুযায়ী ব্রাহ্মণ মাত্রেই সর্বত্র বিবাহ চলিত; কিন্তু এখন এক প্রদেশের সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যেও বিবাহ চলে না।

স্মৃতির ব্যবস্থা যে এদেশের প্রাচীন আইন নয়,—উহা যে আদর্শ ব্যবস্থা মাত্র, তাহা অনেকেই জানেন। স্মৃতির ব্যবস্থায় যাহাই থাক্, ব্রাহ্মণেরা যে অন্য জাতির মধ্য হইতে পত্নী সংগ্রহ করিতেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে কনৌজের রাজাদের গুরু কবি রাজশেখর নিজে চোহান-কন্যা বিবাহ করিবার গৌরবের কথা নিজের নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন। সমাজে ঐ বিবাহ দূষিত মনে হইলে কবিটি রাজ-গুরু হইতে পারিতেন না, আর নিজের বিবাহের কথা গ্রন্থের ভূমিকায় গৌরব করিয়া লিখিতে পারিতেন না। পুলিন্দ, পড়ু, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির লোকেরা যে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অনেক পুরাণ হইতেই তাহা জানা যায়। সেদিনকার আসামের ইতিহাসেও দেখিতে পাইতেছি যে, কেবলমাত্র রাজার আজ্ঞায় বা ব্যবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর অনার্য্য জাতি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছেন। গুজর জাতির পাল রাজারা বঙ্গের অনেক শ্রেণীর কায়স্থদের উৎপাদক। দক্ষিণ প্রদেশের অর্দ্ধ-অনার্য্য সেন রাজারাও অনেক উচ্চ জাতির জন্ম দিয়াছেন।

এইসকল দৃষ্টান্তের জোরে বলিতে পারা যায় যে, যদি ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণে এখনও পর্য্যন্ত ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা না দিয়া থাকে, তাহার কারণ এই—ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে এখন যে অন্তর্বিবাহ চলিতেছে, তাহা খুব অধিকদিনের প্রাচীন নয়। সকল উচ্চ জাতিরই সামাজিক গণ্ডি ও অন্তর্বিবাহ অতি পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া যে বিশ্বাস আছে, তাহা ঠিক্ নয়। অন্তর্বিবাহ খুব অধিকদিন না হইলে ক্ষয়ের চিহ্ন হয় না। যাহা হোক, ইহার মধ্যেই যে সে চিহ্ন কিছু-কিছু দেখা দিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

জাতীয় উদ্ধারের উপায়

বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধান ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের বিচার অবলম্বন করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, জাতীয় উন্নতিকল্পে অসম্পর্কিত রক্তমিশ্রণ অত্যন্ত উপযোগী। উপযোগী হইলেও, যেসকল কারণে ও যেসকল অবস্থায় সর্ববিধ জাতির মধ্যে অবাধ বিবাহ চলিতে পারে না, তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। ভারতবর্ষের জাতিসমূহের মধ্যে এখন কোন্ কোন্ জাতি বা সম্প্রদায় নির্ভয়ে পরস্পরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাহার বিচার করিতেছি।

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত উচ্চ জাতিগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—বর্ণভেদ দিয়া যে জাতিভেদ, তাহা এখন আর নাই; কোন জাতি বা সমাজই রঙ্‌-এর প্রভেদে সূচিত হয় না। এখন 'কাল বামুন' কিংবা 'কটা শূদ্র' আদৌ লক্ষ্য করিবার জিনিস নয়; বহুদিন পূর্ব হইতেই বর্ণ-সমতা সাধিত হইয়া গিয়াছে। বর্ণভেদ ত গিয়াছেই,—কর্মভেদও এখন আর নাই। সমাজবিকাশের প্রাথমিক অবস্থায়, এক-একটি দলে বা জাতিতে কোন শিল্প বা ব্যবসায় স্থায়ী হইলে, যেসকল ফললাভ করা যাইতে পারে, সে কথার বিচার এখন ঐতিহাসিক সমালোচনা মাত্র; উহার ব্যবহারিক মূল্য নাই। পুরুষের দিক্ দিয়া যখন বংশ ও দল নির্দিষ্ট হয়, তখন বংশবিশেষে বা জাতিবিশেষে কোন শিল্প বা ব্যবসায় স্থায়ী হইলেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহে কোন বাধা উপস্থিত হয় না; প্রাচীন কালেও যে, বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়-অবলম্বীদের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার ঐতিহাসিক সাক্ষী কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই অগ্রাহ্য করেন না। কোন একটি বিশেষ কর্মনিষ্ঠ বংশের মেয়ে যে তাঁহার শরীরের

মধ্যে ঐ বংশগত কর্মের বীজ নিয়া জন্মগ্রহণ করেন, উত্তরাধিকারবাদে এ কথা মোটেই স্বীকৃত হইতে পারে না; কোন একজন বিশেষ শিল্পীর মেয়ে যদি অন্যব্যবসায়-অবলম্বীর গৃহে সন্তান উৎপাদন করেন, তবে তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে নূতন কর্মভূমি বা শিক্ষাশালায় কোন বাধা উপস্থিত হইতে পারে না। আজকালকার দিনে কেহ-বা আইনের, কেহ-বা চিকিৎসার, আর কেহ-বা অধ্যাপনার বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন; উহাতে যে এক জাতির এক ব্যবসায়ীর ঘরের পুত্রকন্যা, সেই জাতির ভিন্নব্যবসায়-অবলম্বীর গৃহে বিবাহিত হইতে পারে না, কিংবা সে বিবাহে কুফল ফলে, এ কথা কেহই বলেন না।

যাহা হোক, আমি সুবিধার জন্য কয়েকটি উচ্চ শ্রেণীর কথাই বলিতেছি। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে যে সকলেই ইচ্ছানুরূপ ও লাভের পন্থা অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন, তাহা ত সকলেই জানি। হাইকোর্টের উচ্চ মঞ্চে বসিয়া অনেক কৃতী কায়স্থ সন্তান, নবযুগের স্মৃতির ব্যবস্থাপক ও বিচারের অধ্যক্ষ হইয়াছেন; তাহাতে যোগ্যতার অভাবও দেখা যায় নাই, আর সামাজিক অধোগতিও ঘটে নাই। নরেন্দ্রনাথ দত্ত 'স্বামী বিবেকানন্দ' হইয়া অনেক ব্রাহ্মণের গুরু হইয়াছেন; নবদ্বীপের কোন পণ্ডিতের আদেশে এ কালের কোন রাজা বা জমিদার সেই সম্মানিত শূদ্রতপস্বীর শিরশ্ছেদ করিতে যান নাই। বর্ণবৈষম্যের জাতিভেদ বহুকাল হইল উঠিয়া গিয়াছে,—কর্ম ও ব্যবসায়ের বৈষম্যেও (অন্তত উক্ত জাতিসমূহের মধ্যে) জাতিভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কথা এই, ব্রাহ্মণেরা হয়ত মনে করিতে পারেন—অনেক মানসিক ও নৈতিক সদ্‌গুণ এখনও পর্য্যন্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের জাতিতেই রহিয়াছে; কাজেই অসম্পর্কিত রক্ত-মিশ্রণে তাঁহাদের সে গুণের ক্ষয় হইতে পারে।

উত্তরাধিকারবাদের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া সহজবুদ্ধির দিক্ দিয়া অগ্রসর হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি যে—কেহ আমাকে বলিতে পারেন কি যে, কোন প্রকারের মানসিক ক্ষমতা বা নৈতিক বল বিশেষ ভাবেই ব্রাহ্মণসমাজে বদ্ধ রহিয়াছে? সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রতিভাসম্পন্ন ক্ষণজন্মা ব্যক্তির (genius) কথা গণিত হয় না; সমাজের অধিকাংশ লোকের কথা নিয়াই সকল তত্ত্বের বিচার হয়। কাজেই এ গণনায় রামমোহন রায়, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি লোকের কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। মানসিক ক্ষমতার কথা সাধারণ বিচারের জন্য অত্যন্ত উপযোগী বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ɯalendar হাতে নিতে পারি। এ-কালের বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীর লোকেই তুল্যভাবে মানসিক ক্ষমতা দেখাইবার সুবিধা পাইয়াছেন। এদেশের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃতি জাতির লোকসংখ্যা হিসাব করিয়া দেখিতে পাই যে, কোন জাতির বালকেরাই জাতিবিশেষের বালকদের অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মানসিক শক্তির পরিচয় দিতেছে না। কর্মক্ষেত্রেও আমরা তুল্যরূপে সকল জাতির লোককেই দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে দেখি; আইনের ব্যবসায়ে হোক, চিকিৎসা বৃত্তিতে হোক, অধ্যাপনার কার্য্যে হোক, শাস্ত্র আলোচনায় হোক, কিংবা কেরানিগিরিতে হোক, কোন ব্যক্তিই জাতিনিষ্ঠ বিশেষত্বে, প্রাধান্য বা হীনতা প্রদর্শন করিতেছেন না। নিত্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের কথা সকলেরই চক্ষুর সমক্ষে রহিয়াছে; নাম করিয়া দৃষ্টান্ত দেওয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

নৈতিকবল ও চরিত্রনিষ্ঠায় যে, ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ, ও বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃতি হীন, একথা কেহ গায়ের জোরেও বলিতে সাহস করিবেন না। চরিত্র-সংযম, সদাচার, সত্যবাদিত্ব, সৎসাহস, পরহিতৈষণা, স্বদেশপ্রীতি,

স্নেহশীলতা ও কর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণ কি ব্রাহ্মণ-কায়স্থভেদে বিকাশ লাভ করিতে দেখিয়াছি? জোর করিয়া এ বিষয়ে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিতে যাওয়া দুঃসাহসের কর্ম। এত বড় মিথ্যা কথা নিতান্ত জেদাজেদির বিতর্কেও কেহ কখন বলিবেন না। নৈতিক সদ্‌গুণের কথার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনিষ্ঠা বা ধর্মপ্রাণতার কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা সকলেই ভিন্ন-ভিন্ন জাতির বহু পরিবারের সহিত পরিচিত; কেবল বিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রের খোস-পোষাকি পরিচয়ে নয়,—অনেক স্থলে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত পরিচয় হইয়া গিয়াছে। যেসকল সদ্‌গুণের ভিত্তিতে গৃহধর্মের ব্যবস্থা স্থাপিত, তাহার অভাব বা আবির্ভাব জাতির হিসাবে কেহ লক্ষ্য করি নাই। অত্যন্ত নিগূঢ় বন্ধুত্বে অনেক কায়স্থ ও বৈদ্যদের সহিত আমরা আবদ্ধ হইয়াছি; আর সামাজিক মেলামেশায় ও আপুষি আমোদ-প্রমোদের বৈঠকে বিভিন্ন জাতির লোকের সহিত একসঙ্গে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া প্রতিদিনই অনেক শিক্ষা ও তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকি। এমন করিয়া গূঢ়ভাবে মিলিয়াও, যখন জাতিমাত্রের কারণে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয় না, বরং উপকার লাভ করিয়া থাকি, তখন আমাদের পুত্রকন্যারা বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলে যে ভিন্ন জাতির গৃহে অতৃপ্তি লাভ করিবেন, কিংবা দুর্গতি লাভ করিবেন, একথা জোর করিয়াও কল্পনায় আনা চলে না। সাধারণ ব্যবহারে ভিন্ন জাতির সহিত যে-প্রকার মিলন হইয়া থাকে, স্বজাতীয় বৈবাহিকদের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ মিলন হয় না। এরূপ অবস্থায় কোন্ প্রমাণের বলে বলিব—ব্রাহ্মণবংশে নিগূঢ়ভাবে এমন কোন গুণ লুকাইয়া আছে, যাহা বৈদ্য বা কায়স্থ সমাজে নাই।

আমরা যাহাকে বাহ্য-উত্তরাধিকার বা external heritage বলি,

তাহাও যে অন্তত সকল উচ্চ জাতীয়দের মধ্যেই এক, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। এক সময়ে কতকগুলি মন্ত্রের গ্রন্থ ব্রাহ্মণদের বিশেষ অধিকারে ছিল; কিন্তু সেসময়েও যথার্থ বিদ্যার গ্রন্থ ও সুশিক্ষার গ্রন্থ পড়িবার অধিকার সকলেরই ছিল। মন্ত্রগ্রন্থগুলিও এখন সকলের অধিকারে আসিয়াছে। অনেক বৈদ্য-কায়স্থেরা বেদাদির আলোচনা করিতেছেন, আর সকল ব্রাহ্মণই শাস্ত্রপারদর্শী হইতে যান না। শিক্ষিতদের মধ্যে সংখ্যার হিসাবে সকল জাতির লোকেরাই তুল্যরূপে শাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। যেখানে শশধর পাই, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন পাই, নরেন্দ্রনাথ দত্ত পাই। যাহা হোক, শাস্ত্র-পাঠের উপরেই বাহ্যিক উত্তরাধিকার নির্ভর করে না। প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন কীর্তির স্মৃতি, সকল উচ্চ জাতির পরিবারের মধ্যেই তুল্যরূপে শাসন ও অধিকার বিস্তার করিয়াছে। জাতিভেদ-বিহীন যুগের মন্ত্রগ্রন্থ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ রচিত উপনিষদাদি, নীচ বলিয়া আখ্যাত সূতজাতীয়দের বিবৃত মহাভারত, পুরাণাদি, বিবিধ-জাতীয় লোকদের রচিত অন্য প্রাচীন সাহিত্যাদি আমরা সকলে তুল্যরূপে উত্তরাধিকারিত্ব-সূত্রে পাইয়াছি। ক্ষত্রিয় শ্রীরামচন্দ্র ও আভীর নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের দেহ বিষ্ণুর আবির্ভাবের পক্ষে অনুপযুক্ত হয় নাই বলিয়া, তাঁহাদের চরণ ব্রাহ্মণাদি সকলের মস্তকে স্থাপিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণেতর মহাবীর, বুদ্ধদেব প্রভৃতির সুশিক্ষা ব্রাহ্মণ্য-প্রধান সমাজ মাথায় করিয়া নিয়া, সকল শাস্ত্রে তাহা জুড়িয়া দিয়া শাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। গীতাগ্রন্থের প্রমাণেই বলিতে পারা যায়—দেশপূজ্য গীতার ধর্মের উপদেষ্টা কোন ব্রাহ্মণেতর মহাপুরুষ। যাহা হোক, এই সকল শাস্ত্র, সকল আদর্শ আর সকল সুশিক্ষাই তুল্যভাবে সকল জাতির বাহ্য-উত্তরাধিকার। যাঁহারা একালে

রাজনীতিতে, সাহিত্য ও ধর্ম-আলোচনা প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আমাদের নেতা হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাঁহারা সকল জাতিরই সম্পদস্বরূপে গৃহীত হইতেছেন।

জীবনবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের সিদ্ধান্ত এই—যাঁহাদের সহিত রক্তমিশ্রণ করিলে নিঃসন্দেহে সর্বতোভাবে উপকার হয়, তাঁহাদের একদিকে পৃথক্ জাতি হওয়া চাই, ও অন্যদিকে তাঁহাদের সহিত অনেক বিষয়ে মিল থাকা চাই। Arthur Thomsonএর—They should be dissimilar, but not wholly unlike—একথা যে অন্তত-পক্ষে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃতির বেলায় সম্পূর্ণ খাটে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ভাষার বিভিন্নতা ও অনেক বিষয়ের ধরণ-ধারণের বিভিন্নতা-হেতু বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণে-ব্রাহ্মণে ও কায়স্থে-কায়স্থে বৈবাহিক মিলন কথঞ্চিৎ অসুবিধাজনক হইতে পারে। বিভিন্ন প্রদেশে সমজাতীয় লোকের সহিত বিবাহ অপেক্ষা, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতিতে বিবাহ প্রশস্ততর, ও সমধিক উন্নতিবিধায়ক। যখন ব্রাহ্মণসমাজে প্রাণপণে খুঁজিয়া-পাতিয়াও অন্য উচ্চ-জাতি হইতে স্বতন্ত্র কোন বিশিষ্ট গুণ পাওয়া যায় না, তখন ব্রাহ্মণেরা যে-কারণে স্বতন্ত্র থাকিতে চান, তাহার যৌক্তিকতা সমর্থিত হয় না। বিশিষ্ট গুণ নিয়া দল গড়িলে দলটি যে ধ্বংসপ্রবণ হয়, সে কথা বারে-বারে বলিয়াছি। যাহা হোক, উচ্চ শ্রেণীগুলির অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে উচ্চজাতীয়দের মধ্যে রক্তমিশ্রণ হইলে আকাঙ্ক্ষিত অনুদ্দিষ্ট গুণেরও রক্ষা হইবে, আর নব রক্তমিশ্রণের সুফলও ফলিবে। ব্রাহ্মণেরা যদি উচ্চজাতীয়দের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা শ্যামকেও পাইবেন, কুলও বজায় রহিবে।

জাতিভেদ

১

প্রভেদের মৌলিক ভাবের ইতিহাস

ভ্রান্ত তাঁহারা, যাঁহারা মনে করেন—মানুষ তাহাদের খামখেয়ালিতে সমাজ গড়িয়াছিল, অথবা আমাদের দেশে নীচ স্বার্থপরতায় ঠকামি করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির লোকেরা জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, আর নিজেদের সংখ্যা অপেক্ষা বহুলক্ষগুণে অধিক সংখ্যার লোকদিগকে পায়ে দলিয়া নীচ করিয়া রাখিয়াছে। ভ্রান্ত ও বিপথগামী তাঁহারা যাঁহারা সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিবর্তনের প্রাকৃতিক নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের হিতৈষণার ভাবের উচ্ছ্বাসে হুকুম জারি করিয়া মনের মত সামাজিক পরিবর্তন ঘটাইতে চান্ ও ব্রাহ্মণাদিকে জাতিভেদের মত প্রথার জন্য দায়ী করিয়া স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও অনুতাপ করিতে বলেন। ভ্রান্ত মনস্বীরা উপেক্ষা করিলেও বুঝিয়া নিতে হইবে, জাতিভেদের জন্মের প্রাকৃতিক ইতিহাস আছে, উহা পাপিষ্ঠ-বিশেষের পাপে জন্মে নাই; বুঝিয়া নিতে হইবে, উহার পরিবর্তন হইবে সমাজ-বিকাশের প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণে,—ভাবের উচ্ছ্বাসের হুকুমে নয়।

অতি অল্পে জাতিভেদের যে ইতিহাস দিতেছি, উহাতেই সূচিত হইবে—প্রকৃতির যে বিধানে জাতিভেদের সৃষ্টি, ঠিক সেইখানেই উহার

পরিবর্তন ও বিনাশ সাধিত হইতেছে। সামাজিক অবস্থার মধ্যেই ধাতার বিধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইবেন—সারা বিশ্বের সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া মানুষের অবাধ উন্নতির সহায়রূপে প্রাচীনের স্তর ভাঙ্গিয়া নূতন স্তর গড়িয়া উঠিতেছে।

যে-মানুষদের বংশে এখনকার পৃথিবীর সকল স্থানের মানুষদের দলের উৎপত্তি, সেই মানুষেরা কম্‌সেকম্ পাঁচ-ছয় লক্ষ বৎসর আগে পৃথিবীতে দেখা দিয়াছিল। প্রথম জন্মভূমিতে যখন বংশ বাড়িয়া লোকসংখ্যা হইয়াছিল, তখন পেটের দায়ে ও জীবনরক্ষার দায়ে তাহাদের বেশির ভাগ লোককে আলাদা-আলাদা দল বাঁধিয়া পৃথিবীর নানাদিকে ছুটিয়া আহার পাইবার উপযোগী বাসস্থান খুঁজিতে হইয়াছিল। একদলের বাসের ভূমিতে পরবর্তী অন্যদল যাহাতে ঢুকিবার সুবিধা না পায় ও স্বভাবজাত পরিমিত খাদ্যে ভাগ বসাইতে না পারে, তাহার জন্য অগ্রবর্তী বহুদলের লোকেরা এমন বনে-পাহাড়ে আবাস রচিয়াছিল, যেখানে বনের ফল-মূল ও পাহাড়ের দুর্গের বেষ্টন ছিল অনুকূল। যেসকল পরবর্তী দলের লোকেরা আদিযুগের পক্ষের অনুকূল পাহাড়ের বেড়ার মধ্যে স্থান পায় নাই, তাহারা বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল সমভূমিতে ও বড় নদীর কূলে।

অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত সমভূমিতে যাহাদের বাস হইয়াছিল, তাহাদের পক্ষে জীবনরক্ষার জন্য অতি প্রখর ও সযত্ন পরিশ্রম বাড়িয়াছিল। একে ত দলের পর দল মানুষ আসিয়া তাহাদের বাসভূমিতে ঢুকিতেছিল ও আহারের কষ্ট বাড়াইতেছিল, তাহার উপর আবার এদল বা সেদলকে পরাভূত করিয়া তাড়াইবার জন্য যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল। পরাভূত হইয়া যাহারা নিঃশেষে মরে নাই বা স্থানান্তরে যায় নাই, তাহারা নানা ঝগড়া-বিবাদের পর একসঙ্গে মিলিয়া একদল হইয়াছিল; যে-যাহার দলের

আদি-নাম বজায় রাখিয়া এক-সমাজেই আলাদা-আলাদা গোত্রের নামে পরিচিত হইয়াছিল। পেটের দায়ে আবার নূতন-নূতন খাদ্য আবিষ্কার করিয়া খাইতে শিখিয়াছিল ও কোন-কোন খাদ্য-পদার্থের জন্মের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া চাষ করিয়া খাইতে শিখিয়াছিল; কাজেই ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া গেল, যুদ্ধ করিতে-করিতে শরীরের বল-কৌশল বাড়িল,—জীবনের তাড়নায় উদ্ভাবনী শক্তি বাড়িয়া মনের বল বাড়িল। জীবনে যেখানে যুদ্ধ বাড়িয়াছিল ও দলে-দলে মিলিয়া সহযোগিতায় কাজ করিবার ক্ষমতা বাড়িয়াছিল, সেখানে নূতন-নূতন বিপদের অভিজ্ঞতায় ও দুঃখ সহিবার শিক্ষায় বাড়িয়াছিল শক্তি, বুদ্ধি ও চরিত্রের বল অর্থাৎ মনুষ্যত্ব।

জিতিয়া গিয়াছিল তাহারাই যাহারা আদিকালের উপযোগী সুরক্ষিত আবাস পায় নাই, আর হারিয়া গিয়াছিল তাহারা যাহারা নির্বিবাদে সুরক্ষিত আবাসের আশ্রয় নিয়াছিল। মুক্ত স্থানের উন্নত জাতিদের বংশেই জন্মিয়াছে একালের ক্ষমতাশালী সভ্য জাতীয়েরা, যাহাদের মধ্যে আর্য্যবংশের লোকেরা হইয়াছে অধিক অগ্রগণ্য।

যাহারা নিরাপদে ছিল পাহাড় প্রভৃতির দুর্গে, তাহারা জীবন-যুদ্ধের অভাবে বহু দলের সঙ্গে মিলিয়া নূতন-নূতন রক্ত মিশ্রণে বাড়িতে না পাইয়া হইয়াছে কোনঠেসা ও অনুন্নত। যত অধিক পরিমাণে সমাজের প্রসার বাড়াইবার সুবিধা হয় ততই যে ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও স্থিতি বাড়ে তাহা 'উত্তরাধিকার' প্রবন্ধগুলিতে দেখাইয়াছি। ভারতের আর্য্যেরা বহুদলে মিলিয়া বড় হইয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রধান পাঁচটি দলের সমষ্টির নামে বা পঞ্চজনের নামে যুদ্ধের সময়কার পাঞ্চজন্য শঙ্খের নাম পাই।

পেটের দায়ে যখন পৃথিবীর বহুস্থানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রভাবের

ভৌগোলিক সীমার মধ্যে মানুষেরা কঠোরভাবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বাস করিয়াছিল, তখন তাহারা ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাবে, খাদ্যের প্রভাবে ও অন্য দশটা কারণে ভাষায়, চেহারায় ও প্রবৃত্তিতে একেবারে আলাদা হইয়া পড়িয়াছিল। বহু লক্ষ বৎসরের স্বতন্ত্রতায় নানা দেশের নানা জাতি এমন আকৃতি-প্রকৃতি পাইয়াছে যাহাতে উপর-উপর দৃষ্টিতে মনে হয় যে উহারা এক-মানুষের বংশের সন্তান নয়,—যেন সকলেই আলাদা-আলাদা ছাঁচে ঢালা। এই আলাদা রকমের ছাঁচ জাতিতে-জাতিতে প্রভেদ নির্ণয়ের সর্বপ্রধান অবস্থা।

এই যে দেখিতে পাইলাম বিশ্বব্যাপী জাতিভেদের প্রকৃতি ও কারণ, তাহা মনে রাখিয়া ভারতের অবস্থা আলোচনা করিব। উন্নত আর্য্যেরা যখন উত্তর ভারতের সমতল ভূমিতে অধিক পরিমাণে আবাস বাঁধিয়া প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, তখন অনেক বনে ও পাহাড়ে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রেণীর বহু জাতি প্রায় নির্বিবাদে আপনাদের সুরক্ষিত ভৌগোলিক সীমায় বাস করিতেছিল, অথবা এখনও বাস করিতেছে। এইসকল পাহাড় প্রভৃতি স্থানের আদিম অধিবাসীদের সামাজিক নিয়ম আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, যেসকল আদিম জাতির লোকদের ক্ষয় হয় নাই ও যাহারা সামাজিক বন্ধন ও স্বাধীনতা হারাইয়া আর্য্যদের আওতায় বাস করিতে বাধ্য হয় নাই, তাহারা বহুলক্ষ যুগের প্রাচীন ভাষা ও বহুপরিমাণে তাহাদের প্রাচীন সামাজিক প্রথা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। আদিম যুগে পেটের দায়ে যখন কঠোরভাবে স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া ভিন্ন-ভিন্ন দলের লোকেরা প্রাণপণে একদল অপর দলের সহিত সম্পর্ক-শূন্য হইয়া বাস করিতেছিল, তখন তাহারা নিজেদের অবস্থার অনুরূপে ধর্ম ও সমাজ গড়িয়াছিল। একদলের লোক যদি অপর দলের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা বেশি করিত, তবে তাহাদের

স্বতন্ত্রতা-রক্ষায় বাধা ঘটিত ;—সমাজ ক্ষয়ের সম্ভাবনা হইত। নিজেদের দলের লোক ছাড়া অন্য দলের লোকের ছোঁয়া জলটুকুও খাওয়া পাপ, আর দৈবাৎ ভিন্ন-ভিন্ন দলের স্ত্রী-পুরুষে সখ্য জন্মা মহাপাপ। অতি কাছে-কাছে বাস করিয়াও আদিম জাতির শবর-মুণ্ডারা অর্থাৎ কোল জাতির লোকেরা কোন কন্দ বা গোণ্ডের ছোঁয়া জলটুকুও খায় না,—অন্য রকমের সম্পর্ক ত দূরের কথা। যাহা মুণ্ডারা করে, গোণ্ড্ ও কন্দেরা ঠিক তাহাই করে। একালে মুণ্ডা, গোণ্ড্ ও কন্দ প্রভৃতি লোকেরা একসঙ্গে অনেক রকম উপার্জনের কাজ করে, আর আকৃতি ও সামাজিক অবস্থায় উহারা পরস্পর হইতে বেশি ভিন্ন নয় ; তবুও উহারা এ-উহার ছোঁয়া জলটুকুও খায় না। এই আদিম জাতির লোকদের এই প্রথা ও নিয়ম যে কেবল তাহাদের মধ্যেই নির্দিষ্ট আছে তাহা নয়। কোন মুণ্ডা, ওরাওঁ বা কন্দ একালে হিন্দু নামে পরিচিতদের কাহারও জলস্পর্শ করে না। হিন্দুদের অতি বড় পূজ্য ব্রাহ্মণের সাধ্য নাই যে তিনি উহাদের কাহাকেও তাঁহার ছোঁয়া জল পান করাইতে পারেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে আপনাদের স্থিতি স্বতন্ত্র রাখিবার উদ্যোগে যে প্রথা স্বাভাবিক ভাবে প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেই প্রথা আজও বজায় রহিয়াছে।

হিন্দুরা—অর্থাৎ যাঁহারা আর্য্য-সভ্যতার ঐতিহ্য পালন করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা—যে অপরের দেওয়া অন্ন-জল স্পর্শ করেন না, তাহা আপনাদের দলের পবিত্রতা বা স্বতন্ত্রতা (integrity) রক্ষা করিবার জন্য হইয়াছে। জাতিভেদের অতি মৌলিক কথা—পরস্পরের *মধ্যে আহারাদি না চলা* ; সে প্রথা সামাজিক স্থিতির উদ্যোগে দেশের সকল শ্রেণীর মধ্যেই আপনা-আপনি জন্মিয়াছিল। এ প্রথা আদিম জাতির লোকেরা হিন্দুর কাছে ধার করে নাই। মৌলিক প্রভেদের এই

কারণটুকু বা ইতিহাসটি দেখাইয়া দিয়া আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধেই কয়েকটি কথা আরও বলিতেছি; পরে হিন্দুদের বিশেষ জাতিভেদের কথা বলিব।

আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বা অনার্য্যদের মধ্যে এই যে ভেদবুদ্ধি-চালিত সামাজিক ভাব পাকা হইয়াছে, উহাতে দেশের অন্য দশজনের সঙ্গে তাহাদের মিল হওয়ার অর্থাৎ একতার বাঁধন পড়িবার পক্ষে বিস্তর বাধা হইয়াছে। দেখিয়াছি, উহারা গৌরবে-স্ফীত ধনসম্পদে-পুষ্ট হিন্দুদের বাড়ীতে গতর খাটাইয়া কাজ করিয়া পেটের ভাত উপার্জন করে। আমরা স্পেনের Novelএর Don Quixote-এর বুদ্ধিতে উহাদের কাছে গিয়া উহাদিগকে ছুঁইতে চাহিলে ও সামাজিক মিলন ঘটাইতে গেলে উহারা ধরা দিবে না, বরং তোমাকে তাড়াইয়া দিবে; তোমাদের উদারতায় ও মুরুব্বিয়ানায় কোন কাজ হইবে না। আবার, যে অনার্য্যেরা আত্মসমাজ হারাইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়াছে ও ছোট জাতির লোক হইয়া আর্য্যদের আওতায় ও আশ্রয়ে বহুকাল বাস করিয়া আসিয়াছে তাহারা যে অধিকাংশ স্থলে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের মন্দিরে ঢুকিয়া আঁৎকাইয়া উঠিবে, আর ব্রাহ্মণ ও দেবতার মারাত্মক নজরে পড়িয়া মরিবার ভয় পাইবে, তাহা 'জুজুর ভয় ছাড়' প্রবন্ধের প্রথম অংশেই লিখিয়াছি। অন্যদিকে আবার যদি এই অনুগ্রহ-রক্ষিত জাতির লোকেরা আত্ম-সম্মানবোধ-বর্জ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার পায়ের তলায় পড়িয়া মন্দিরের একটি কোণে স্থান চায়,—আর নিজের মন্দির নিজে গড়িতে না চায়, তবে তাহাদের হাড়ে-হাড়ে জাত-গোলামি বুদ্ধি অধিক মাত্রায় বাড়িবে। সে লোকদের পক্ষে কোনও দিকের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে না। রাজ্যে বাস করিতে হইলেই যে অর্থ দেয় হয়, তাহা না দেওয়ার সুবিধার প্রলোভনে হৈ-চৈ বাধাইতে পারে, কিন্তু

স্বাধীন হইবার বুদ্ধিতে যেভাবে অপরের সঙ্গে মিলিতে হয়, সেভাবে মিলিয়া কাজ করিতে পারিবে না।

হিন্দুদের সহিত অসম্পর্কিত পাকা অনার্য্যেরা অন্য অনুন্নতদের কাছাকাছি বাস করিয়াও যে সম্পূর্ণ অসম্পর্কিত থাকে, অর্থাৎ তাহারা যে ইংরেজি কথায় contiguous isolation-এ বাস করে তাহা বলিয়াছি। এই অনার্য্যদের মধ্যে কোন-কোন জাতির অতি প্রাচীন-কালের ধর্ম-বিশ্বাসে ছিল যে নিজেদের জাতির লোক ছাড়া অন্য জাতির লোককে শুভদিনে হত্যা করিতে পারিলে দেশের মারীভয় প্রভৃতি পালায় ও জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে। এযুগে ব্রিটিশ-শাসনে ইহারা বহু বিরোধী দলের লোকের প্রতিবেশী হইয়া বাস করে ও পুলিসের ভয়ে শত্রু জাতির লোককে মারিতে-কাটিতে পারে না। তবুও প্রতি বৎসর এমন রিপোর্ট পাওয়া যায় যে উহারা গোপনে প্রাচীনকালের শত্রুদলের লোক হত্যা করিয়া ধর্মবুদ্ধির চরিতার্থতা ঘটায়।

তবেই দেখা গেল, দেশবাসীদের অনেক জাতির লোককে আমরা কেবল ছোঁয়া দিয়া দেশের কোন উপকার করিতে পারিব না। আরও দেখা গেল, এখনকার দিনে কোনও বিরোধ ও শত্রুতা না থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে এমন মারাত্মক বিরোধ-বুদ্ধি আছে, যাহাতে একে অপরকে হত্যা করিতে সঙ্কুচিত হয় না। ইহাদের হাড়ে-হাড়ে আছে অসহযোগ করিবার অর্থাৎ আড়ি করিবার বুদ্ধি; ইহাদিগকে আড়ি করিবার শিক্ষা দিলে সহজেই শিখিবে, কিন্তু ভাব করিয়া সকলের সঙ্গে বাড়িবার বুদ্ধি পাওয়া অতিশয় কঠিন।

এই বুদ্ধি অনার্য্যদের মধ্যে কত পাকা, তাহার একটা বিদেশী দৃষ্টান্ত দিতেছি। সঙ্কীর্ণ সমাজে বাস করিয়া শরীরে নূতন রক্ত ও নূতন বুদ্ধি না পাইয়া Bushman, Bantu প্রভৃতি জাতির লোকেরা যৌবনের

প্রারম্ভেই মস্তিষ্কের এমন অবস্থা পায়, যাহাতে তাহাদের সমাজকে ক্ষয়ের পথ হইতে রক্ষা করা দুঃসাধ্য। একথা উহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও উহাদের কয়েকজন খ্রিষ্টিয়ানের দৃষ্টান্তে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে উহাদের অনুরূপ অন্য জাতির সঙ্গে রক্তমিশ্রণ করিলে শরীর ও মনের উন্নতি ঘটে; তবুও তাহারা সনাতন সংস্কারের প্রভাবে উন্নতির দিকে না চলিয়া নিজেদের ক্ষয়সাধন করিতেছে। এই-সকল কথা যদি পূর্ণভাবে মনে রাখা যায় ও কেবল ভাবের উত্তেজনায় নিষ্ফল কোলাহল না ঘটান' যায়, তবে এইসকল রোগ দূর করার জন্য কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন ও কিরূপ সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজন, সে বুদ্ধি সুশিক্ষিত নেতাদের মনে নিশ্চই জাগিবে।

জাতিভেদ

২

হিন্দু জাতিভেদের বিশেষ প্রকৃতি

জাতিভেদের নৈসর্গিক মূল দেখাইতে গিয়া প্রধানভাবে দৃষ্টান্ত দিয়াছি অনার্য্যদের। অন্য জাতির সঙ্গে যদি প্রভেদ না থাকে তবে কোন সম্প্রদায় নিজের বিশেষত্ব রাখিতে পারে না—এই বিশ্বাসেই অনার্য্যদের পরস্পরের মধ্যে ও হিন্দুদের সঙ্গে তাহাদের আহার ও মেলামেশা বন্ধ করিতে হয়। যাহারা ভাবেন—অনার্য্যেরা আমাদের বাড়ীতে খাইলে তাহারা উদ্ধার হইবে, তাঁহারাই ভুল বুঝিয়াছেন। কেন-না, জাতিভেদ রাখিতে গেলে উহার যথার্থ-ই প্রয়োজন আছে।

খাঁটি রকমে জাতিভেদ রক্ষা করিতে গেলে যে একালেও দশ জনের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা চলে না, তাহার একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত দিতেছি। হিমালয়ের একটি স্বাস্থ্য-নিবাসে একটি বিলাত-ফেরৎ ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়েরা ইউরোপীয় ধরণে স্বাধীনভাবে বেড়াইতেন ও সামাজিকভাবে ঐ পরিবারের সকলে ভিন্ন-ভিন্ন জাতির লোকের বাড়ীতে যাইতেন ও আহারাদি করিতেন। এই পরিবারের লোকেরা আহারাদিতে জাতিভেদ মানিতেন না অথবা মানেন না, কিন্তু বিবাহের বেলায় জাতিভেদ মানিতেন বা মানেন। যাঁহারা বিবাহে জাতিভেদ মানেন, তাঁহাদের পক্ষে যে ইউরোপীয় ধরণে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া

চলে না ও ব্রাহ্মণেতর জাতির সঙ্গে আহারাদি প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্কে আসা চলে না, এই কথাটি বিশেষভাবে আমার একজন বিজ্ঞ বন্ধু উদ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ-পরিবারের কর্তাকে বলিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যেসকল ব্রাহ্মণেতর জাতির লোকের সহিত শিক্ষায়, সামাজিক সংস্কারে ও ভদ্রতায় তাঁহাদের প্রভেদ নাই, সেসকল লোকের বাড়ীর কোন যুবকের প্রতি কর্তাটির বয়স্কা মেয়েদের প্রেমে-পড়া স্বাভাবিক হইতে পারে, আর সেরূপভাবে যদি প্রেম জন্মে, তবে ব্রাহ্মণত্ব বাঁচাইতে গিয়া বিবাহ বন্ধ করিতে গেলে মেয়েদিগকে চিরদিনের জন্য অসুখী করিতে হয়। কর্তাটি একথা প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়াছিলেন, কিন্তু একমাস না যাইতেই দেখিতে পাইলেন যে আমার সেই বিজ্ঞ বন্ধুর কথার মূল্য কতখানি।

যাঁহারা প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা জানেন—যখন অতি প্রাচীনকালে মেয়েদের বেশি বয়সে বিবাহের প্রথা ছিল, তখন আর্য্য-গ্রামগুলির স্থিতির বিধান ছিল জাতি-কুল রক্ষার অনুকূলে। যাহাদের সঙ্গে যাহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে পারিত না, তাহারা একগ্রামে বাস করিত না; বড় একটা জাতির গ্রামের উপান্তে অন্য জাতির লোক বাস করিত, আর প্রত্যেক জাতির আবাস ভিন্ন-ভিন্ন পল্লীতে বা পাড়াতে হইত। আর্য্য-গ্রামের মধ্যে কিভাবে কোথায় শূদ্রেরা বাস করিতে পাইবেন, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

এবারে দেখাইব হিন্দুর জাতিভেদের প্রকৃতি ও কি কারণে একসময়ের সমাজের অবস্থায় যে-ভেদ জন্মিয়াছিল; সেই ভেদে ভিন্ন-ভিন্ন জাতির জাতি-মর্য্যাদা প্রতি জাতিতে বংশবদ্ধ হইয়াছে। স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বাধীন সম্প্রদায়ের লোকের নানা জাতির সঙ্গে একদেশে কাছাকাছি বাস করিতে হইলে প্রভাব-সম্পন্ন উন্নত জাতির লোকে আপনাদের

আভিজাত্যের অভিমানে অন্যকে ঘৃণ্য ও নীচ মনে করে। এ অবস্থা পৃথিবীর নানা দেশে ঘটিয়াছিল ও তাহাতে উচ্চ-নীচ জাতির প্রভেদ ঘটিয়াছিল। তবে কি কারণে অন্যত্র পিতৃ-পুরুষদের জাতির বংশধরদের মধ্যে আদিমকালের জাতি-মর্য্যাদা বংশ-বদ্ধ হয় নাই, আর ভারতবর্ষে হইয়াছে, তাহাও দু-একটি কথা বিচারের পর স্থির করিতে হইবে।

আর্য্য-অনার্য্য হিসাবে নিঃসম্পর্কিতদের মধ্যে জাতিভেদ ঘটিয়াছে অপরিচয়ে, বিদ্বেষে ও বিদ্রোহে; কিন্তু একই দলের লোকের মধ্যে সমাজের প্রয়োজনের একাজ-সেকাজ করার ফলে ভেদ-বিচার হইল কেন, আর সেই ভেদ-বিচার হিন্দুনামে পরিচিতদের মধ্যে অধিক কেন? ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্বাধীনদলের মধ্যে এরূপ ভেদ যে জন্মে না, তাহা অনার্য্যদের সমাজনীতিতে দেখিতে পাই। একটি স্বাধীন ছোটদলের নেতা বা মোড়ল বা মাঝি বা রাজা সমাজে সম্মানিত হইলেও তাহাকে নিজের অধীন বা বশবর্ত্তী লোকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতে হইবে, আর অধিকাংশ স্থলেই সাধারণ লোকদের মত তাহাকে উপার্জ্জনের ও ঘরকন্নার কাজ না করিলেই চলিবে না। শুধু এখনকার কতকগুলি অনার্য্যদলের লোকের অবস্থার দিকে তাকাইয়াই একথাটা বলি নাই। অনেক লুপ্ত ও বিস্মৃত সমাজের সামাজিক অবস্থার বর্ণে চিত্রিত রূপ-কথায় বা উপকথায় রাণীদের পক্ষে অতি সাধারণ ঘরকন্নার কাজের বিবরণ শুনি। পৃথিবীর সকল দেশের প্রাচীন গল্পেই এই ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। হোমরের ইলিয়দ মহাকাব্যে আছে—এক রাজা যখন ক্ষেতে লাঙ্গল চালাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে মেনেলসের পক্ষের দূত তাঁহাকে ট্রয়ের অভিযানে জুটিবার জন্য অনুরোধ করিতে গিয়াছিলেন। এদেশের অনার্য্যদলের দলপতিরা নিজে লাঙ্গল চালাইয়া সম্মান হারান না। সংখ্যাবৃদ্ধির অভাবে ও সামাজিক প্রসারের অভাবে এক-

দলের ছোট-বড় সকলেই প্রায় একই শ্রেণীর শিক্ষায় ও কাজ-কর্মে জীবন কাটায়।

অন্যদিকে সমাজ যেখানে বহু জনসংখ্যায় পুষ্ট সেখানে ঐরূপ সমতা থাকিতে পারে না। বড় সমাজে নানা শ্রেণীর কাজের প্রসার বাড়ে ও মানুষের ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবসায় জন্মে; তবে সকল ব্যবসায়ই যখন সমাজের হিত ও স্থিতির জন্য, তখন ব্যবসায়ের উচ্চতা ও নীচতা বিচারিত হয় কেন, তাহা বলিতেছি।

(১) বুদ্ধির বলে কাজ চালাইবার নূতন কৌশল উদ্ভাবনা করিতে পারে অত্যন্ত অল্প লোকে, আর অনুকরণ করিয়া কাজ করে বহুলোকে; বুদ্ধিমানেরা স্বতঃই বাহাবা পাইয়া সমাজে সম্মানিত হইবেই। (২) মানুষে আপদে-বিপদে যাহার ক্ষমতায় রক্ষা পায়, সে ব্যক্তি সমাজে অধিক আদর পাইবেই। (৩) মানুষের আগ্রহ—আকাঙ্ক্ষা, সে যাহাতে শরীরকে অধিক ক্লান্ত না করিয়া প্রয়োজনের কাজ হাসিল করিতে পারে; যে তাহা পারে, পরিশ্রম-কাতরেরা তাহাকে উঁচু মনে করিবেই। (৪) যে অনেক উপার্জন করিতে পারে ও কাজেই যে অনেককে রক্ষা ও পালন করিতে সমর্থ, সে ব্যক্তি সমাজে পূজিত হইবেই। (৫) যে ব্যক্তি শিল্পী ও শ্রমজীবীদিগকে না তুষিয়া পুষিতে পারে, অর্থাৎ যাহার এমন সম্পদ আছে যে, সে শিল্পী ও শ্রমজীবীদের তৈরি জিনিস কিনিয়া ভোগ করিতে পারে, সে সাধারণ লোকের কাছে পদগৌরব পাইবেই। (৬) যেকাজ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ব্যক্তি-বিশেষের সেবা, অর্থাৎ যেকাজ একদিকে স্বাধীনভাবে নিজের ঘরে বসিয়া করিয়া মূল্য আদায় করা চলে না, ও অন্যদিকে যেকাজ করাইবার জন্য বিশেষজ্ঞ কৌশলী বা শিক্ষিতকে খুঁজিতে হয় না, সেই কাজ ও সেই কাজের লোক নীচু বলিয়া বিবেচিত হইবেই।

এই-যে ব্যবসায়ের মধ্যে উচ্চতা ও নীচতার বোধ, ইহা ত পৃথিবীর সকল বড়-বড় জাতির মধ্যে ছিল ও আছে। মানুষে-মানুষে যখন ক্ষমতার হিসাবে প্রভেদ থাকিবেই তখন আহারে-বিবাহে জাতিভেদ উঠিয়া গেলেও এই উচ্চতা ও নীচতার বোধ মানুষের মন হইতে দূর হওয়া তেমন সম্ভব নয়; ক্ষমতাশালীরা বাহাবা পাইয়া উচ্চ বিবেচিত হইবেই। ক্ষমতাশালীদের বংশধরেরা যে নিশ্চিতই ক্ষমতাশালী হয় অথবা অক্ষমদের সন্তানেরা যে ক্ষমতাশালী হইতেই পারে না, ইহা ত কাহারও অভিজ্ঞতা নয়; তবে স্থায়ীভাবে বংশক্রমে পূর্বপুরুষদের ব্যবসায় প্রচলিত থাকে কেন, অর্থাৎ ব্যবসায়নিষ্ঠ এক-একটি জাতি জন্মে কেন, তাহা বিচারিত হওয়া চাই। ইউরোপের এক শ্রেণীর অবৈজ্ঞানিক লেখকদের কাছে কেহ-কেহ জাতিভেদের মূলে এই Division of Labour ও উহার economic reasons-এর হেতুবাদ শিখিয়াছেন। জাতিভেদটি যে, মানুষে বুদ্ধির কৌশলে গড়িয়া-পিটিয়া সৃষ্টি করে নাই, আর মানুষে যে, কাজবিশেষকে অপেক্ষাকৃত ছোট বা হেয় জানিয়াও উহা বংশবদ্ধ করিবার জন্য ধরিয়া নেয় নাই, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রমের বিভাগ করিয়া জাতি বাঁধিয়া দিলে এক ব্যবসায়ের ঘরের শিশুরা সহজে প্রতিদিনের অর্জিত জ্ঞানের ফলে ব্যবসায়টি শিখিয়া নিতে পারে বটে ও অন্য লোকে সে ব্যবসায় করিবার অধিকারী না হইলে প্রতিযোগিতার অভাবে নিজের ব্যবসায়ের লাভ বজায় রাখিতে পারে বটে, কিন্তু সকলেরই যখন সমাজে মান-মর্য্যাদা পাইবার প্রাকৃতিক ইচ্ছা আছে, তখন একটি ব্যবসায়নিষ্ঠ লোকেরা অন্য ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যবসায়-হিসাবের জাতিভেদ ভাঙে না কেন? অন্যপক্ষে আবার ভাবিয়া দেখ যে আমরা এখন দেখিতে পাই—কোনও শিল্প-কৌশলের ব্যবসায় যদি জাতিবদ্ধ হয়

তবে প্রতিযোগিতার তাড়না না থাকার দরুণ তাহাদের শিল্পের কাজ মোটামুটি পূর্বপুরুষের কাজের নকল করিয়াই চলিতে থাকে ও নূতন বুদ্ধি বা উদ্ভাবনীশক্তি জাগাইয়া সে শিল্পকে উন্নততর করিতে পারে না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে অতি প্রাচীনকালে গোটাকতক শিল্পের কাজ ঠিক যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে। এখন বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কোথাও-কোথাও বিদেশের শিল্পের অনুকরণ করিয়া শিল্পীরা নূতন-নূতন কিছু গড়িতেছে, কিন্তু আমাদের কাছে বিদেশীর আদর না থাকিলে শিল্পীরা বিদেশীর নকল করিবার জন্য মাথা ঘামাইত না। তাহা হইলেই দেখিতেছি যে, একদিকে মানুষের প্রবৃত্তি রহিয়াছে উচ্চতর সম্মান পাইবার জন্য, তবুও সে তাহার জাতি-ব্যবসায় ছাড়ে না বা ছাড়িতে পারে না। আর অন্যদিকে দেখিতেছি যে আমাদের এই বোধ জন্মিয়াছে—কোনও ব্যবসায়কে প্রতিযোগিতার মধ্যে না আনিয়া জাতিনিষ্ঠ রাখিলে কর্মীদের বুদ্ধি বাড়ে না ও শিল্পের উন্নতি হয় না। তবুও জাতি ভাঙ্গে না কেন ও জাতি ভাঙ্গিবার চেষ্টা গুরুতর বাধা পায় কেন? একালে পেটের দায়ে প্রতিযোগিতা বাড়িয়াছে ও উচ্চ জাতির লোকেরা নীচ জাতির ব্যবসা করিতেছেন ও নীচ ব্যবসায়ের লোকদের কেহ-কেহ নিজেদের ব্যবসায় ছাড়িয়া কলেজি পরীক্ষায় পাস্ করিয়া চাকুরি পাইতেছেন; তবুও মানুষের সামাজিক সম্মান পূর্বপুরুষদের বংশের দাগে চলিয়াছে। ব্রাহ্মণ বংশের লোকেরা চামড়ার কাজ করিতেছেন ও জুতা তৈরি করিতেছেন, তবুও তিনি পান্ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা আর অন্য জাতির লোকে হাকিমি করিলেও ছোট জাতি বলিয়া ঘৃণিত। এই মনের ভাবের মূল রহিয়াছে অজ্ঞাতে প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে। Heredity বা গুণাদির বংশ-সংক্রমণ সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে-ধরণের কুসংস্কার ছিল তাহা উত্তরা-

ধিকার বিষয়ের প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি। গুণ বা দোষ নামে অদ্ভুত-অদ্ভুত অশরীরী পদার্থ মানুষে ক্রমাগত উত্তরাধিকারিত্বে পাইতেছে—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস মানুষকে ছাড়ে নাই। পুরোহিত-সৃষ্টি ও ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টির যে বিবরণ দিয়াছি 'জুজুর ভয় ছাড়' প্রবন্ধে, তাহা যেন এই প্রসঙ্গে বিচারিত হয়।

যাহারা পূর্বপুরুষের ভূত নামাইয়া ভূতের কাছে দেশের কল্যাণের উপায় জানিতে পারিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, আর যাহাদের সাহস ছিল যে, ভূত তাহাদের ঘাড় মট্‌কাইবে না, তাহারাই হইত ওঝা, যাজক ও পুরোহিত; আবার তাহাদেরই বংশে ওঝা ও যাজকের জন্ম না হইলে যে, সমাজের হিত হইবে না ভাবিয়া মানুষেরা নিজের ইচ্ছায় পুরোহিতদল বা ব্রাহ্মণদল গড়িয়া বংশগত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। এইসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের অভিজ্ঞতায় ইহা নাই যে কেবল জাতি-মাত্রের গৌরবে কোনও ব্রাহ্মণ অন্যদের অপেক্ষা বুদ্ধিতে বা চরিত্রবলে শ্রেষ্ঠ। শিক্ষাশালার প্রতিযোগিতায় ও বড় চাক্‌রির প্রতিযোগিতায় ব্রাহ্মণেতরেরা কোথাও ব্রাহ্মণের নীচে পড়েন নাই। এইসঙ্গে সেকালের একটি কথাও বিচার করা ভাল। ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল পূজার মন্ত্রের গ্রন্থ বা শাস্ত্রের বই। যাঁহারা করিতেন খাঁটি ব্রাহ্মণের ব্যবসায় অর্থাৎ হইতেন গুরু-পুরোহিতের দল, তাঁহারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য ঐ শাস্ত্রেরই টীকা-টিপ্পনী করিয়াছেন, কিন্তু নূতন উদ্ভাবনী শক্তিতে নূতন-নূতন মত প্রচার করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণদের কাছে নূতন মত প্রচার করিয়াছেন ক্ষত্রিয় রাজারা—একথা উপনিষদ্‌গুলিতে পাই। আবার নূতন ধর্ম ও মতবাদের প্রচারকরূপে পাই মহাবীরকে, বুদ্ধকে ও শ্রীকৃষ্ণকে—যাঁহারা ক্ষত্রিয় বংশের লোক। যাঁহারা কেবল জাতি-

মাত্রে ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু গুরু-পুরোহিতের দলের লোক ছিলেন না, তাঁহাদের কাছেই দর্শন-কাব্য প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ যেগুণে ব্রাহ্মণ হইলেন বিশেষগুণে ব্রাহ্মণ, সেগুণের গুরু-পুরোহিতের দল সেকালে ও একালে গুণের মহিমার শ্রেষ্ঠত্বে অধিক পরিমাণে যশ অর্জন করেন নাই। একালে যেমন আইন-ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাঁহারা রোজ্‌গারের জন্য ওকালতি করেন, তাঁহারা বড়জোর আইনের কথার টীকা-টিপ্পনী লিখিতে পারেন, কিন্তু আইনের শ্রেষ্ঠ বই লিখিয়াছেন তাঁহারা যাঁহারা ব্যবসায় না চালাইয়া হইয়াছেন অধ্যাপক—Jurist. প্রাচীন প্রথা যাহাদের রোজ্‌গারের উপায়, তাঁহারা প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে নূতনকে উদ্ভাবন করিতে পারে না। কর্মের মাহাত্ম্যে ও স্বাধীন চিন্তায় মানুষের মনুষ্যত্ব বাড়ে,—একটি জাতিবদ্ধ হইয়া সেই জাতির গুণ উত্তরাধিকারে পাইয়া নয়।

তাহা হইলেই দেখিতে পাইতেছি যে এদেশে সারাদেশের লোকের এই বুদ্ধিতে কর্ম্মভেদের শ্রেণীগুলি স্থায়ী হইয়া আসিয়াছে যে, ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবসায়কারীদের সকল দোষ-গুণ চিরকাল তাহাদের বংশে সংক্রামিত হইতে বাধ্য। অল্পবিস্তর এই ধরণের বুদ্ধি সকল দেশেই ছিল ও গ্রীস্ প্রভৃতি বিদেশের সমাজেও জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল ; তবে অন্যদেশে ঐ জাতিভেদ পাকা না হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল কেন, আর এই ভারতবর্ষে বিশেষভাবে হিন্দুনামে পরিচিতদের মধ্যে এমন দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হইল কেন, ইহাই এখন বিচার্য্য। একথা সত্য নয় যে, খৃষ্টিয়ান ধর্মের সাম্যবাদ প্রচারিত হইবার পরেই ইউরোপীয়দের মধ্যে জাতিভেদ নষ্ট হইয়াছে। যে কারণে প্রাচীনকাল হইতেই ইউরোপে জাতিভেদ পাকা হইয়া চিরস্থায়ীরূপে বংশবদ্ধ হইতে পারে নাই, তাহা বলিতেছি।

ভারতবর্ষের ভূমি উর্বরা ; এদেশের লোকে বিদেশে নানা পণ্য

বিলাইয়াছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষের তাড়নায় আহার্য্য সংগ্রহের জন্য দল বাঁধিয়া অন্য দেশে ডাকাতি বা অন্যরকমের রোজ্‌গার করিতে যায় নাই। যাহারা প্রাচীনকালে বহির্ভারত প্রভৃতি বিদেশে গিয়াছিল, তাহারা সেই দেশে গিয়াই চিরকালের মত বাসা বাঁধিয়াছিল,—নিজেদের আগেকার দেশে ফেরে নাই। অর্থাৎ ভারতের কোন একটি জাতিবিশেষ আপনাদের জাতির লোক নিয়া দল বাঁধিয়া আহারের জন্য অথবা দেশ জয় করিয়া আপনাদের সমাজের প্রসারের জন্য স্থায়ী উদ্যোগ করে নাই। অন্য-পক্ষে ইউরোপের ভিন্ন-ভিন্ন দেশের লোকে আপনাদের ছোট-ছোট দেশগুলির স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিবার জন্য পাইরেট্ সাজিয়া (উন্নততর যুগে বণিক সাজিয়া) অন্যের দেশ হইতে আহার্য্য সংগ্রহের জন্য নিজের দেশের সকলের সহকারিতায় নিরন্তর দল বাঁধিয়া একসঙ্গে 'দেশের কাজ' করিতে বাধ্য হইয়াছে। দেশের লোকের সকলের সমান স্বার্থে এইভাবে নিরন্তর কাজ করিতে গেলে সকল শ্রেণীর লোককে নানা প্রভেদ ভুলিয়া একসঙ্গে মিলিতে হয় ও সেইভাবে মিলিত হইতে হইলে উচ্চ ও নীচ শ্রেণীগুলির যেসকল ঘৃণার ভাব থাকে তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। বদ্ধমূল ঘৃণার ভাব না থাকিলে, নীচ শ্রেণীর লোকে শিক্ষা প্রভৃতিতে উচ্চ শ্রেণীর সামাজিক সমতা পাইলে, উচ্চে-নীচে মিলনের বাধা ঘটে না।

আমাদের দেশে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে বটে, কিন্তু একটি ভৌগোলিক সীমার একটি 'জাতির' সকল লোকের সঙ্গে অন্য ভৌগোলিক সীমার জাতিসঙ্ঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্যোগে, সকলের স্বার্থের তাড়নায় কখনও দল বাঁধিতে হয় নাই। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারাঠারা যখন একসঙ্গে জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন মহারাষ্ট্র-দেশে সকল শ্রেণীর মধ্যে অনেকখানি সমতা আসিবার লক্ষণ দেখা

দয়াছিল। যেজাতির লোকই হোক না কেন, তাহারা যখন এক-সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবে, তখন আহারাদিতে জাতিভেদ থাকিবে না—রামদাস প্রভৃতি এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন। সকলে মিলিয়া কাজ করিবার সেই স্বার্থের তাড়না যেদিন চলিয়া গেল, সেইদিন হইতে আবার ভিন্ন-ভিন্ন জাতির মধ্যে পুরাতন পাকা পার্থক্য দেখা দিল!

ভারতবর্ষ অতি বিস্তৃত দেশ; রুস্‌দের দেশ বাদ দিলে বাকি সমগ্র ইউরোপ ভারতবর্ষ অপেক্ষা আয়তনে বড় নয়। এই বিস্তৃত ভারতবর্ষে বহু জাতির লোক আপনাদের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকিয়া অন্যের সঙ্গে বিনা বিবাদে বাঁচিয়া থাকিবার মত আহার্য্য পাইয়া আসিয়াছে। এদেশে ইউরোপীয় ধরণের দেশজয়ের অভিনয় হয় নাই। পালি সাহিত্যে এমন অনেক গল্প পাওয়া যায়, যাহাতে দেখা যায় যে, অন্নের অভাব না থাকায় একদেশের সঙ্গে অপর দেশের বিবাদ ঘটে নাই। বিমাতা-দের কুচক্রে অনেক যুবরাজ রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া বনে গেলেন, আর সেই বনপ্রদেশে তাঁহারা ছোটখাট নূতন রাজ্য রচনা করিলেন; রাজাদের মৃত্যুর পর বনপ্রদেশের লোকে যখন নির্বাসিত যুবরাজদিগকে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিবার জন্য উত্তেজনা দিতে গেল, তখন যুব-রাজেরা উত্তর দিল যে, অরণ্যভূমির নূতন রাজ্যই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। দেশময় সকল লোকের স্বার্থে উদ্দীপ্ত হইয়া একটি দেশবিশেষের 'একটি জাতির' লোকে একলক্ষ্যে দল বাঁধিয়া কখনও 'জাতীয় গৌরব' প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয় নাই; কাজেই নীচ জাতির লোকের মূল্য ও আদর বাড়িয়া উচ্চ ও নীচের মধ্যে প্রভেদ ভাঙ্গিবার পথ হয় নাই।

জাতিভেদের মূলে যে স্থায়ী ও দৃঢ় প্রভেদের ভাব থাকে, তাহা দূর হইবার মত কোন নৈসর্গিক কারণ বা উদ্যোগ এখনও দেখা দেয় নাই। প্রাচীন সংস্কারের অনুরূপ জাতি বজায় রাখিলে সরকারি চাকুরি

পাওয়ার পক্ষে বাধা হয় না, বিদেশীয়দের হাটে পণ্য বেচিবার পথে বাধা হয় না, অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিবার স্বার্থে বাধা ঘটে না।

এদেশে যাহারা পূরামাত্রায় আর্য্য-সভ্যতার দাবি করে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ষোল কোটি; উহাদের মধ্যে কেবল হাজার-কতক একালের শিক্ষিতেরা জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়ার দল গড়িয়াছেন; তাঁহারা যেরূপ বিচারে এই পন্থা ধরিয়াছেন সে বিচার দেশের সাধারণ লোকের বদ্ধমূল সংস্কারের মধ্যে উপস্থিত হয় না। এই দলের লোক ছাড়া কয়েকশত লোক নিজেদের উপার্জ্জনের ও পদগৌরবের স্বার্থে ইউরোপ যাত্রা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে জাতিভেদ ভাঙ্গিয়াছেন; ইঁহাদের মধ্যেও আবার অনেকে দেশে ফিরিবার পর দেশের আবহাওয়ার গুণে নিজেদের হাড়ে-বদ্ধ প্রাচীন সংস্কারকে জাগাইয়া তোলেন। কোন একটা সাধারণ জাতীয় লক্ষ্যে ঘনিষ্ঠভাবে দলবদ্ধ হইবার প্রয়োজন না থাকায়, প্রাচীন সংস্কারের মূল শিথিল হইতে পারে নাই। দেশের কোথাও-কোথাও নীচের স্তরের লোকে উচ্চজাতীয়দের অধিকার পাইবার জন্য যে আন্দোলন করিতেছে, তাহা ঠিক দেশবদ্ধ জাতি-ভেদের বিরোধী বলা একটু শক্ত। যেসকল শ্রেণীর লোকে মূলে হিন্দু সমাজের লোক ছিল না, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের অঙ্গ ছিল না, নূতন যুগের ভাবের প্রভাবে তাহারাই বেশির ভাগ আন্দোলন করিতেছে। যাহারা মূলে অন্য দল বা জাতির লোক ছিল, ও বিশেষ অবস্থায় হিন্দুসমাজের আশ্রয়ে ও আওতায় পড়িয়াছিল, তাহারা কখন স্পর্শ্য জাতি হয় নাই ও হিন্দুর মন্দিরে যাওয়ার বা ব্রাহ্মণ পুরোহিত পাওয়ার অধিকার পায় নাই; এই শ্রেণীর লোকে যখন ব্রাহ্মণ্য-প্রথার বিরোধী হয়, তখন ব্রাহ্মণ্য-সমাজে প্রতিষ্ঠিত সংস্কারের সঙ্গে লড়াই করে। এই বিরোধীদের মধ্যে কখন খাঁটি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার দৃঢ়মূল হয়

নাই,—হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। যাহারা ব্রাহ্মণ্য-সমাজের অন্তর্গত, তাহাদের মধ্যে জাতিগৌরবের নামে যেসকল আন্দোলন হয়, তাহাতে মূল সংস্কারের বিরুদ্ধাচার থাকে না; এ আন্দোলনে ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা হয়,—কেবল নীচের স্তরের জাতিদের মধ্যে কে-বড় বা কে-ছোট, তাহা নিয়া বিচার ওঠে। এরূপ বিচারে ও আন্দোলনে এরূপ কথা ওঠে না যে, এক জাতি অন্য জাতির সঙ্গে মিলিয়া যাইবে। জাতিভেদ সংস্কারের যাহা খাঁটি মূল, তাহা দৃঢ় আছে ও সেই মূলের জোরে নানাপ্রকার জটিল সংস্কার জন্মিয়াছে। কাজেই কেবল সাম্য-বাদের বক্তৃতায় জাতিভেদ উঠিবে না।

জাতিভেদ

৩

জাতিভেদের ভবিষ্যৎ

বিধাতার ইঙ্গিত পৌঁছিয়াছে—জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে। এই ইঙ্গিত দিন-দিন প্রস্ফুটিত হইতেছে পৃথিবীর বহু জাতির বহু কর্মে ও বহু বিবাদে। মানুষের আদিমযুগে ক্ষুধার তাড়না আসিয়াছিল—অন্য প্রয়োজনের তাড়না আসিয়াছিল, যাহাতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মানুষে দলে-দলে পৃথিবীর সকল দেশে বাসা বাঁধিয়াছিল, আর সকল দলের লোক পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ লোপ করিয়া, আর কোথাও-কোথাও পরের শত্রু হইয়া স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রাধান্য বাড়াইয়াছিল; অর্থাৎ ভিন্ন-ভিন্নভাবে নানা ধরণের সভ্যতা ও স্থিতির উপায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এবারে কিন্তু সকল জাতির একসঙ্গে মিলিবার ও সকলের বিশিষ্টতায় অভূতপূর্ব নূতন বিশেষত্ব স্থাপন করিবার দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আসিয়াছে।

মানুষ-পরিবারের লোকে একদিন বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রায় ভিন্ন-ভিন্ন ছাঁচে গড়িয়া উঠিবার মত বিভিন্ন হইয়াছিল; কেহ কাহারও খোঁজ-খবর রাখিত না, তবে আর্য্যদের মত সভ্য উন্নত জাতির বিশেষ বিকাশের ইতিহাসে পাই যে, প্রথমে বিদ্রোহ করিয়া ও পরে শান্তি স্থাপন করিয়া নানা জাতি একসঙ্গে মিলিয়া জ্ঞানে, সম্পদে ও প্রভুতায় বাড়িয়া

উঠিয়াছিল। আবার অন্যদিকে দেখিতে পাই—বাণ্টু-বুশ্‌মান্‌দের মত অনেক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জাতি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে গিয়া ও অন্যের সঙ্গে রক্তমিশ্রণ বন্ধ করিতে গিয়া, অর্থাৎ আপনাদের ইচ্ছায় আপনারা 'একঘরে' হইয়া এমন দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে যে, যথার্থ কাজ করিবার সময়ে অর্থাৎ যৌবন-বিকাশের সময়ে তাহাদের মাথার হাড়গুলির যোগ এমনভাবে গ্রথিত হইয়া যায় যে তাহাদের পক্ষে জ্ঞান বাড়াইয়া ও শক্তিশালী হইয়া থাকিবার আর উপায় নাই; তাহারা একেবারে ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

এখন স্বার্থের তাড়নায় ও আপনাদের প্রভাব পৃথিবীতে বিস্তার করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের অধিবাসীরা পৃথিবীর নানা রাজ্য দখল করিয়াছে ও করিতেছে, আর তাহার ফলে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যায় ও বিদ্বেষে অনেক যুদ্ধ করিতেছে ও সন্ধি করিতেছে। বাণিজ্যের প্রভাবে এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, বিজয়ীদের দেশে হোক্, অথবা বিজিতদের দেশেই হোক্, সর্বত্রই পৃথিবীর সকল জাতি আসিয়া দেখা দিয়াছে; আর ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সাধ্য নাই—কোনও দেশের লোকের সাধ্য নাই, আপনাদের দেশ হইতে পৃথিবীর অন্য দেশের লোককে তাড়াইয়া দিবে। আমরা যদি আজ এই মুহূর্ত্তে স্বরাজ্য পাই, তাহা হইলেও আমাদের সাধ্য থাকিবে না যে, বিদেশের কোন জাতিকে এদেশ হইতে তাড়াইতে পারি; অন্য স্বাধীন দেশের লোকের মত সকল দেশের সভ্যতার সংঘর্ষে বাড়িয়া উঠিতে হইবে।

এই উদ্যোগের প্রথম অধ্যায়ে পাইতেছি স্বার্থের বিবাদ ও মারাত্মক যুদ্ধ। ইহা দেখিয়া ভয় পাইবার কিছু নাই, কারণ বিধাতা মানুষকে বড় করিতেছেন তাহার আপনার আকাঙ্ক্ষার কর্মের দিকে প্রবল ঝোঁক

বাড়াইয়া। মানুষ স্বার্থের প্ররোচনায় বহু জাতির সঙ্গে মিলিতেছে ও বিবাদ করিতেছে। অন্য কোনরূপে সেকালের বিচ্ছিন্ন জাতিদের মধ্যে পরস্পরের পরিচয় হওয়া অসম্ভব ছিল। পরিচয় পাইবার পর যে-যাহার আপনার প্রাধান্য ও গৌরবের কথাই বলে,—পরের কাছে কিছু শিখিবার আছে, তাহা আত্মদম্ভে স্বীকার করে না। স্বার্থের টানে কিন্তু দীর্ঘবাসের পর নিজেদের স্বার্থের বুদ্ধিতেই একে অপরের মাহাত্ম্য বুঝিতে শিখিবে ও মহামিলনের পথ প্রস্তুত করিবে। মনের গ্লানি ও বিদ্বেষ উপিয়া যায় না—দূর হয় না, যদি যুদ্ধ বিবাদে তাহা না উড়ায়। ভারতবর্ষের হিন্দুরা ও ইউরোপের Nordic উৎপত্তির গৌরববিশিষ্টেরা, যে-যাহার আপনার সামাজিক প্রথা ও জ্ঞানের গৌরবের বড়াই করিতে থাকিবে, কিন্তু বহু বিবাদের পর সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন জাতির মধ্যেই বিশিষ্ট রকমের উন্নতিপ্রদ অবস্থার অভাব নাই, আর সকলের সকল বিশিষ্টতার সামঞ্জস্যে হইবে যথার্থ উন্নতি।

আমরা এখন আত্মসম্মানবোধে আপনাদের বিশিষ্টতা রাখিয়া বাঁচিবার জন্য যে উদ্যোগ করিতেছি, সে উদ্যোগে যদি উন্নতিবিধানের এমন কল গড়িতে না পারি, যে কল প্রসারলাভ করিয়া অন্য জাতীয়দের কলের সঙ্গে মিলিয়া এক কলে পরিণত হইতে না পারে, তবে আমাদের উন্নতির কল বিকল হইয়া পড়িবে। মনে কর, একজাতি গড়িতেছে উন্নতির কলের চাকা, আর একজাতি উন্নতির এঞ্জিনের পিষ্টন্‌, আর অন্য জাতির অন্যজন অন্য কিছু। যদি সমগ্র মিলনের কলে এ-সকল-গুলিকে খাপ খাওয়াইতে না পারা যায়, তবে যেগুলি কলের কাজে লাগিবে না, সেগুলি দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে, অর্থাৎ যে জাতি আপনাদের মধ্যে সেই উপযোগিতা বাড়াইতে পারিবে না যাহাতে ভবিষ্যতে সকল জাতির সঙ্গে সামঞ্জস্য আঁটিয়া বাড়িতে না পারা যায়, তবে সেই

অনুপযোগী জাতি বাণ্টু, বুশ্‌মান্‌দের মত ধ্বংসের গর্তে পড়িয়া মরিবে; নিজেদের ঘর গুছাইয়া বিশিষ্টতার জোরে বাড়িবার প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ জাতীয়ত্ব বা Nationalism-এর প্রয়োজন আছে, কিন্তু এই জাতীয়ত্বের ভাব যদি বিশেষ বিশিষ্টতার সঙ্কীর্ণতায় চাপা পড়ে ও অন্যদের মধ্যে প্রসার পাইয়া বাড়িবার মত প্রকৃতি না গড়ে, তবে ঐ জাতীয়ত্বের ভাব আমাদের ক্ষয়সাধন করিবে। আজ বহু জাতির সম্মিলনে এই বাণী ফুটিয়া উঠিতেছে—প্রাচীনকালের বিচ্ছিন্নতা দূর করিয়া সকলকেই বিশ্ব-মানবতার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইতে হইবে। বিধাতার নিশ্চিত ইঙ্গিত আসিয়াছে—জাতিবিদ্বেষ ও জাতিভেদ পরিহার করিতে হইবে।

বিবাহ-বিধি

১

যে নিয়মে চন্দ্র-সূর্য্য দেখা দেয়, বাতাস বয়, গাছে ফুল ফোটে, সেই নিয়মের শাসনেই মানুষের কাজ ও সমাজের গতি শাসিত হয়, ইহা বেশির ভাগ লোকে মানে না। আমাদের বিবাহ হয় নিজের ইচ্ছায়, না-হয় বড়জোর অভিভাবকদের ইচ্ছায়, আর স্বেচ্ছায় কত লোক অবিবাহিত থাকে; এ অবস্থা দেখিয়া অনেকে ভাবে—এই যে চলিয়াছে সামাজিক বিধি যে, মেয়ে-পুরুষকে নির্দিষ্ট নিয়মে স্থায়ী জোড় বাঁধিতে হইবে আর সেই বৈধ নিয়মে জোড় না বাঁধিলে সন্তানেরা সমাজে আদৃত হইবে না, সে নিয়ম ইচ্ছা করিলেই উল্টাইয়া বা উঠাইয়া দিয়া সমাজকে কুশলে চালাইতে পারা যায়।

বিবাহ প্রথা যে এক সময়ে সুবিধার খাতিরে মানুষে চালাইয়াছিল, এই প্রবাদ অনেক দেশেই পাওয়া যায়। আমাদের প্রাচীন প্রবাদে পাই যে একদিন একজন ঋষি অস্থায়ী যৌন আকর্ষণে শ্বেতকেতুর মাকে শ্বেতকেতুর চোখের সাম্‌নেই ডাকিয়া নিলেন; শ্বেতকেতুর হইল লজ্জা ও ক্রোধ, আর তিনি তৎক্ষণাৎ এই অমোঘ বচন উচ্চারণ করিলেন যে, সমাজ ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে আর চলিবে না,—সকলকে বিবাহের আইন মানিতে হইবে। বিবাহটা নাকি সেইদিন হইতে চলিত হইয়াছে। ইহারই অনুরূপ প্রবাদ পাই প্রাচীন মিসরে ও প্রাচীন চীনদেশে। গোড়ায় ছিল উচ্ছৃঙ্খলা বা স্বেচ্ছাচারিতা, তার পরে সামাজিক অবস্থার

ফলে নানা দেশে নানা ধরণের বিবাহ-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল, এই কথা ষাট-সত্তর বছর আগে ইউরোপের কয়েকজন সমাজতত্ত্বজ্ঞেরাও বলিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতদের মতের সমালোচনার আগে একটা প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার ইতিহাস দিতেছি, যে ভ্রান্ত ধারণায় মানুষে ভাবে যে, বিশ্বের সুসম্বদ্ধ সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বের উপাদানগুলি ছিল অতি বিশৃঙ্খল বা এলোমেলো অবস্থায় বা chaos রূপে ; এই অবৈজ্ঞানিক ধারণা জন্মিবার কারণ দেখাইতেছি।

মানুষে যখন ঘর বাঁধে তখন এখানকার কাঠ সেখানকার পাথর-মাটি বহু চেষ্টায় ও শ্রমে কুড়াইয়া আনে ; প্রায় সকল প্রয়োজনের কাজেই মানুষকে অনেক জোড়া-তালি দিয়া কাজ গুছাইয়া নিতে হয়। নিজেদের কাজ বা সৃষ্টিকে উপমেয় ভাবিয়া লোকে মনে করে—এলোমেলো উপাদান জুড়িয়াই বিধাতাকে সুসম্বদ্ধ বিশ্ব গড়িতে হইয়াছিল। যাঁহারা অল্পাধিক পরিমাণে বিশ্বের উপাদানের প্রকৃতি জানেন তাঁহাদের পক্ষে chaos কল্পনা করা অসম্ভব। ইথর বল বা শূন্যসাগর বল বা যে নামেই নামকরণ কর, দেখিতে পাইবে যে তাহারই মধ্যে অবিরাম কম্পন বা তরঙ্গ চলিয়াছে, আর তাহার নির্দিষ্ট বাঁধা গতিতে ফুটিয়া উঠিতেছে বিদ্যুৎ-গর্ভ কুঁড়ি, যে কুঁড়ির বিকাশে জন্মিতেছে পরমাণু। এই পরমাণুর অতি সূক্ষ্ম অণুতে-অণুতে সেই ধর্ম আজন্ম জড়াইয়া আছে, যাহার ফলে পরমাণুগুলিকে নিরন্তর বিশ্ব গড়িয়াই চলিতে হইবে,—অতি ক্ষুদ্র কাল্পনিক মুহূর্তেও সে তাহার অঙ্গের নিয়ম বা ধর্ম এড়াইয়া এলোমেলো অবস্থায় থাকিতে পারে না। আলো হোক, জল হোক, হুকুমের অপেক্ষা না করিয়াই আদি অথবা অনাদিকাল হইতে আকর্ষণাদি নানা নিয়মে সুশৃঙ্খল সৃষ্টি উদ্ভাবিত করিয়া চলিয়াছে। ঐ যে পরমাণু নিত্য আপনার ধর্ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে উহাদেরই

এক ধরণের যোগে যে আমাদের উৎপত্তি, আমাদের আপন-পর বুঝিবার চৈতন্তের উৎপত্তি ও জীবনের সকল শ্রেণীর কর্ম করিবার প্রবৃত্তির উৎপত্তি, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ 'মরণ ভোল' প্রবন্ধে দিয়াছি। উহার পুনরুক্তিতে পুঁথি বাড়াইব না।

এমন অনেক জীব আছে যাহাদের মধ্যে বিকাশের অল্পতার দরুণ সেই ধরণের চেতনা জাগে নাই যাহাতে আত্মবোধ জন্মিতে পারে; কিন্তু তাহারা বাঁচিয়া চলিয়াছে খাইয়া ও আত্মবংশ বাড়াইয়া চলিয়াছে আপনাদের শারীর উপাদানের টানে। শরীরে নানারকমের টান বা প্রবৃত্তি আছে আর সেই টান বা প্রবৃত্তির ফলেই তাহারা কাজ করে; কিন্তু সেই প্রবৃত্তির টান আত্মজ্ঞানরূপে বিকশিত চেতনার আওতায় ঘটে না বলিয়া সেই ভাবের জন্ম হয় নাই, আমরা যে-ভাবের নাম দিয়াছি ইচ্ছা, সঙ্কল্প প্রভৃতি। উহারা ক্ষয়ের বা মরণের অবস্থার স্পর্শে আসিলে উপাদানের ধর্মেই কোঁচ্কাইয়া দূরে যায়, আর স্থিতির অনুকূল অবস্থার স্পর্শে শরীর ফোলাইয়া অগ্রসর হয়; কিন্তু আমাদের মত ইচ্ছা বা সঙ্কল্প অনুভব করে না। এইজন্যই অন্য জীবের আলোচনা করিয়া খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিতে হইবে যে আমাদের যাহা বাঞ্ছনীয় ও কর্ত্তব্য, তাহার অচ্ছেদ্য শিকড় কিভাবে রহিয়াছে আমাদের অপরিবর্ত্তনীয় উপাদান-ধর্মে জড়াইয়া। অর্থাৎ বুঝিয়া নিতে হইবে যে আমাদের কোন্ শ্রেণীর ব্যবস্থাকে শরীর ও সমাজ ধ্বংস না করিয়া বদ্লাইতে পারা যায়, আর অন্যদিকে কিরূপ মৌলিক ব্যবস্থাকে বদ্লাইতে গেলে আমাদের ঝাড়ে-বংশে নিপাত হয়। তত্ত্বের খোঁজের গোড়ার কথায় সক্রেটিসের উপদেশ ছিল—Know thyself, আপনাকে জান। এখানেও সেই কথা; জীবনের ও সমাজের কর্ত্তব্য বুঝিবার গোড়ায় আপনার উপাদানকে চিনিয়া ন'ও, আপনাকে চিনিয়া ন'ও।

জীব-শ্রেণীর অতি নীচের স্তরে এমন অনেক জীব আছে যাহারা সারা শরীর দিয়া খায় ও পুষ্ট হয়, আর উপযুক্ত সময়ে তাহাদের শরীর ভাঙ্গিয়া দুখানা হয় ও সেইরূপে দুইটি জীবের উৎপত্তি হয়। এই প্রথায় ঐ জীবদের বংশ বাড়িয়া চলে। এই জীবদের মধ্যে একের সঙ্গে অন্যের কোনও রকমের সহযোগিতার প্রয়োজন নাই ; তবু উহারা এক-দলে এক-সঙ্গে বাস করে। নীচের দিকের এমন অন্য একটু উচ্চতর জীব আছে যাহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে আর বংশবৃদ্ধির জন্য স্ত্রী-পুরুষেরা নির্দিষ্ট কালে জোড় বাঁধে। আত্মজ্ঞানের চেতনাশূন্য এই জীবেরা কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জোড় বাঁধে কি-না, তাহা এখনও পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট ধরা যায় নাই ; তবে যতটুকু জানা গিয়াছে, পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি। একে ত এই জীবগুলি বড় ক্ষুদ্র ও চেহারা দেখিয়া একটিকে অপরটি হইতে আলাদা করিয়া চিনিয়া রাখা কষ্ট ; তাহার উপর আবার মানুষে যখন উহাদের গতি-বিধি পরীক্ষা করিতে বসে, তখন উহাদের স্বাভাবিক স্থিতির পদ্ধতি উল্টাইয়া যায়। মানুষেরা প্রায় জোর করিয়াই একটি পুরুষ-জীবকে অন্য স্ত্রী-জীবের সঙ্গে মিলায় ; কিন্তু যদি ঐ জীবেরা মানুষের হস্তক্ষেপ না পাইত, তবে তাহাদের প্রাকৃতিক টানে কিভাবে একটি অন্যটির সঙ্গে জুটিত, তাহা ধরা যায় না। একথাটি কিজন্য বলিলাম, তাহা বুঝাইতেছি। এমন অনেক বড়-বড় জীব আছে, যাহারা বন্য থাকিবার সময়ে একটি নির্দিষ্ট প্রথায় জোড় বাঁধে, কিন্তু মানুষে যখন তাহাদিগকে গৃহপালিত করে, তখন আর সে নিয়ম পালিত হয় না। আমরা জোর করিয়া ঘোড়া, গরু প্রভৃতির পক্ষে প্রাকৃতিকভাবে দল বাঁধিয়া থাকার সুবিধা উড়াইয়া দিয়াছি আর উহাদের বংশ-বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রয়োজনে যেমন খুসি তেমন করিয়া জোড় বাঁধিয়া দিই, আর ঐ জন্তুরাও যৌন

আকর্ষণে পরস্পরে মেলে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ঠিকই বলিয়াছেন —মানুষের শাসনে যাহারা প্রাকৃতিক অবস্থায় নাই ও যাহারা হইয়াছে degraded বা অধঃপতিত, তাহাদের দৃষ্টান্তে জীবের জোড় বাঁধিবার আইন ধরা কঠিন। তবুও গৃহপালিত পশুদের প্রাকৃতিক টান কিরূপ, তাহা যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা বলিব। মানুষ জাতির মধ্যেও কোন্-কোন জাতি এমনভাবে কোণ-ঠেসা হইয়াছে যাহাতে তাহাদের নিজের দলের পুষ্টি ও প্রসার নষ্ট হইয়াছে। ইহারা দায়ে ঠেকিয়া যৌন আকর্ষণের টানে আপনাদের ক্ষুদ্র দলের মধ্যে এমনভাবে জোড় বাঁধে, যাহা আমাদের দৃষ্টিতে মানুষের বেলায় অস্বাভাবিক। ইহারা যে এই দায়ে-পড়া অবস্থার জন্য ধ্বংসের পথে চলিতেছে সে দৃষ্টান্ত পরে দিব। এই-সকল দৃষ্টান্তের অল্প উল্লেখের পর অন্যান্য জীবের মধ্যে লক্ষিত সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

প্রথম দৃষ্টান্ত দিতেছি সেই নীচের স্তরের জীবের—যাহাদের আত্ম-জ্ঞান অস্পষ্ট, আর যাহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ জন্মিয়াছে। পণ্ডিত Maupas এই শ্রেণীর জীবদের কয়েকটি বংশে ঠিক লক্ষ্য করিয়াছেন যে যদি উহাদের এক স্থানের দলের জীবেরা অন্য স্থানের দলের জীবদের কাছে যাইতে না পায়, আর যদি এক স্থানের স্ত্রী-জীবদের সঙ্গে দূরের অন্য পুরুষ-জীবদের জোড় বাঁধা না ঘটিতে পায় তবে ঐ জীবেরা ক্ষয়ের পথে বা মরণের পথে অতি শীঘ্র অগ্রসর হয়। এই জীবদের অপেক্ষা খানিকটা উন্নত মৌমাছিদের সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত লক্ষ্য করিয়াছেন—এক চাকের মাছিরা অন্য চাকের মাছিদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখে, যদিও অন্য চাকের মাছিদের সঙ্গে জোড় বাঁধিয়া বাস করে না। নিজের দল ছাড়িয়া অপরিচিত অন্য দলের জীবদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন

করাই যে জীব-সাধারণের মধ্যে সাধারণ নিয়ম, তাহাই অনুসন্ধানের ফলে নিত্য-নিত্য আবিষ্কৃত হইতেছে।

গৃহপালিত পশুদের অধঃপতিত অবস্থার কথা ও মানুষের ইচ্ছায় তাহাদের ক্ষণিক যৌনসম্বন্ধ-স্থাপনের কথা বলিয়াছি। যে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই পশুদের শরীরের ও গুণের উন্নতিসাধনে বিশেষভাবে ব্রতী তাঁহাদের মধ্যে এবিষয়ে কোনও মতভেদ নাই যে, যেখানেই যত কাছাকাছি রক্ত-সম্পর্কে পশুদের যৌন সম্পর্ক হয় সেখানেই পশুদের বংশে তত পরিমাণে ক্ষয় দেখা দেয়। আবার ইহাও সযত্নে লক্ষ্য করিবার জিনিস যে কাছাকাছি রক্ত-সম্পর্ক না থাকিলেও এক পালের পশুরা আপনাদের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ ঘটাইতে না পারিলেই অধিক সুখী হয়, আর অপরিচিত সমজাতীয় পশুদের প্রতি যৌন আকর্ষণ অধিক হয়। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ Heape লিখিয়াছেন—All breeders will agree that animals when brought into contact with strangers experience increased sexual stimulation. অনুবাদের প্রয়োজন নাই।

এবারে দিব পক্ষী জাতির মধ্যে জোড়-বাঁধার দৃষ্টান্ত বা স্থায়ী বিবাহের দৃষ্টান্ত। যেসকল পণ্ডিত অতি নিপুণভাবে পক্ষী-জাতির আচরণ-বিধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে Marquis de Brisay, Brehm ও Hermann Muller-এর পাকা অভিজ্ঞতার বিবরণ শোনাইব। আমরা সকলেই লক্ষ্য করি—পাখীরা তাহাদের জাতি অনুসারে দল বাঁধে আর একসঙ্গে ঝাঁকে-ঝাঁকে ও এক গাছে রাত্রি কাটায়। যাহাকে বলে কাজের বেলায় সহযোগিতা পাওয়া, ইহাদের মধ্যে তাহার ত কোন প্রয়োজন নাই; কারণ উড়িতে শিখিবার পর যে-যাহার নিজের খাদ্য

সংগ্রহ করে ও বিপদে পড়িলে নিজের চেষ্টাতেই মুক্তির পথ খোঁজে। যৌন আকর্ষণে যে এক-এক জোড়া পাখীকে কাছাকাছি থাকিতে হয়, তাহাও ত বছরের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট কালে ঘটে। তবুও পক্ষী-জাতিদের বেশির ভাগ একসঙ্গে দল বাঁধিয়া থাকে ও ঝাঁক বাঁধিয়া ওড়ে। আমরা এক জাতির এক পাখীকে অন্য পাখী হইতে আলাদা করিয়া চিনিয়া রাখিতে পারি না, তাই কি-নিয়মে কে-কাহার সঙ্গে জোড় বাঁধে, তাহা ধরিতে পারি না। আন্দাজে ভুল করিয়া ভাবি—এক জোড়া পাখী এক বাসায় যে এক জোড়া ডিম পাড়িল, তাহারই পুরুষ ও মেয়ে ছানা বড় হইবার পর বুঝি একসঙ্গে স্ত্রী-পুরুষরূপে জোড় বাঁধে। যে সকল পণ্ডিতদের নাম করিয়াছি তাঁহারা নিপুণ পরিদর্শনে দেখিয়াছেন যে মুরগী জাতীয় ও আর দু-একটি জাতীয় পাখী ছাড়া পাখীদের মধ্যে ভাই-বোনে জোড় বাঁধা নাই। পাখীরা বড় হইয়া যখন দল বাঁধিয়া উড়িয়া বেড়ায় তখন এক বাসার পাখীরা অপরিচিত অন্য বাসার পাখীদের সঙ্গে জোড় বাঁধে। একবার জোড় বাঁধিবার পর বা বিবাহ হইবার পর ইহাদের বিবাহ ভঙ্গ হয় না ও আশ্চর্য্য এই, জোড়ার একটা মরিয়া গেলে অপরটি অনেক সময়েই সারা জীবন বিবাহ করে না। Captain Forsyth একবার সম্বলপুরের পশ্চিমভাগে এক জোড়া চখা-চখী দেখিয়া গুলি করিয়াছিলেন ও তাঁহার গুলিতে একটি মরিয়াছিল। অপরটির দুঃখ-যাতনা দেখিয়া সেটিকে মারিয়া ফেলিবার জন্য একুশ দিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পারেন নাই। তিনি ঘুরিয়া দেখিয়াছিলেন —বিপত্নীক বা বিধবা পাখীটি নদীর চড়ায় চখা-চখীদের দলের কাছে অথচ দল হইতে দূরে একা বসিয়া থাকিত। ঘুঘুদের ও পায়রাদের জোড় বাঁধা ও প্রেমের কথা আমাদের দেশে অনেকে আন্দাজে খানিকটা লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রেমের একনিষ্ঠ আকর্ষণে যে একা মানুষেরাই ধন্য

নয়, তাহা এক পণ্ডিতের ইংরেজী উক্তিতে এইভাবে আছে—This absorbing passion for one is not confined to the human race. পক্ষীজাতির মধ্যে অসম্পর্কিত বিবাহ ও দাম্পত্য প্রেমের গভীরতা অত্যন্ত অধিক দেখিয়া পণ্ডিত Brehm বিস্ময়ে বলিয়াছেন যে যথার্থ একনিষ্ঠ বিবাহ (monogamy) পক্ষী জাতিতেই সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার উক্তিটি ইংরেজীতে এইরূপ আছে—Real genuine marriage can only be found among birds.

শরীরের স্বাভাবিক টানের আগ্রহকে চেতনার মধ্যে ইচ্ছারূপে সাজাইয়া হোক আর নাই হোক, জীবদের মধ্যে এই যে বিবাহের গতি ও পদ্ধতি চলিয়াছে তাহার অচ্ছেদ্য মূল শরীরের সেই উপাদানের ধর্মে চলিয়াছে, যে উপাদানের নাম জৈবনিক বা germplasm। এই জৈবনিক নিম্নতম হইতে উচ্চতম জীব পর্য্যন্ত সকলের জীবনে সর্ববিধ কর্মের ভিত্তি; ঐ ভিত্তিকে না বদ্‌লাইলে অর্থাৎ শরীরকে না মারিয়া ফেলিলে ঐ টান ও টানের পদ্ধতিকে কাহারও বদ্‌লাইবার সাধ্য নাই। জৈবনিকের এই লীলা নানা ইতর জন্তুর মধ্যে লক্ষ্য করা গেল; এখন দেখিব সেই জীবদের আচার যাহারা মানুষদের পূর্বপুরুষদের একটু দূর সম্পর্কে পিতৃব্য ও ভ্রাতৃব্য-স্থানীয় অর্থাৎ শিম্পাঞ্জী, গরিলা প্রভৃতি কিম্পুরুষ বা বনমানুষদের আচারের উল্লেখ করিব। শিম্পাঞ্জী, গরিলা প্রভৃতি যে, জীবনে স্থায়ী জোড় বাঁধে ও এক-এক পরিবার সন্তান-সন্ততি নিয়া একসঙ্গে বাসা বাঁধিয়া থাকে ও নানাস্থানে বিচরণের সময়েও বয়স্ক স্ত্রী পুরুষেরা বড়-বড় সন্তানগুলিকে সঙ্গে করিয়া বেড়ায়, ইহা সকল পরিদর্শকেরাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। যে সংস্কার নীচ জীব হইতে কিম্পুরুষ পর্য্যন্ত সকলের শরীরে ও মনে বদ্ধমূল, তাহা যে কিম্পুরুষদের কিঞ্চিৎ দূর সম্পর্কিত আদি মানবের সহজজ্ঞান বা সংস্কারে

রূপে স্থায়ী ছিল, তাহা স্বীকার না করিবার যুক্তি পাওয়া যায় না। আদিম কালের মানুষের খাঁটি আদিম সমাজ আর নাই,—তাহাদের উত্তরাধিকারীদেরও সমাজ অনেক লক্ষ বছর আগে শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের আচার প্রভৃতিও পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত সমাজে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয়; তবে যে-ধারা জৈবনিকের ধর্মে সারা জীবশ্রেণীতে বহিয়া আসিয়াছে তাহা যে জৈবনিকে গড়া মানুষের উত্তরাধিকারক্রমে চলিয়া আসে নাই, একথা কিছুতেই বলা চলে না।

মনুষ্যেতর প্রায় সকল জন্তুর মধ্যেই সন্তান-সঞ্চার করাইবার এক-একটা নির্দিষ্ট কাল বা ঋতু আছে; কিন্তু মানুষের মধ্যে এই কাল বা ঋতু সারা বছর ধরিয়াই চলে, বলিতে পারা যায়। অন্য জন্তুর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে যে কেবল নির্দিষ্ট কালে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইলেই চলে, কিন্তু মানুষের বেলায় একেবারেই তাহা নয়। তবুও দেখা যায় যে অন্য জীবেরা নির্দিষ্ট কালে মিলিবার সম্ভাবনার উপরে নির্ভর করিয়া আলাদা-আলাদা থাকে না; একেবারেই যৌবনে স্থায়ী জোড় বাঁধিয়া চলে ও প্রয়োজনের বেলায় সেই জোড়-বাঁধা জীবেরাই বংশ বৃদ্ধি করে, আর অনিশ্চিতভাবে উপযোগী ভবিষ্যৎ মিলনের পথ চাহিয়া থাকে না। সন্তান-পালনের কাজের সময়টুকু পর্য্যন্ত নীচের শ্রেণীর সকল জীব জোড় বাঁধিয়া বসিয়া থাকে না—সারা ভবিষ্যতের জন্য জোড়-বাঁধা বজায় রাখে। কাজেই মানুষের বেলায় বিশেষ করিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে যাহারা প্রতিনিয়ত যৌন আকর্ষণের টান অনুভব করে ও যাহাদের পক্ষে অনেক বছর ধরিয়া সন্তান-পালনের কাজ চালাইতে হয় তাহারা ভবিষ্যতের অনিশ্চিত উপযোগী মিলনের অনিশ্চিত আশায় না থাকিয়া যৌবনেই পাকা জোড় বাঁধে বা স্থায়ী বিবাহ করে। যে-কোন স্থানে যে-কোন সময়ে প্রাণের টান বা আকাঙ্ক্ষার অনুরূপে মানুষে

স্ত্রী বা পুরুষ সঙ্গী পাইতে পারে না বা সন্তানদের রক্ষক পাইতে পারে না।

পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই অনুন্নত ও উন্নত মানব-সমাজ পরিদর্শন করিয়া সমাজের ক্রমবিকাশের যে আইন বা নিয়ম কিছুদূর পর্যন্ত ধরা গিয়াছে, সেই নিয়মের আলোকে মানুষের বিবাহ-পদ্ধতির বিকাশ ও বিচিত্রতার আলোচনা করিতেছি। বিবাহের সংস্কার ও পরিবার-পালনের সংস্কার যে আদিম মানুষ পাইয়াছিল উত্তরাধিকারসূত্রে, অর্থাৎ সুবিধার বিচার করিয়া কোন এক সময়ে নূতন প্রথা গড়ে নাই—তাহা স্বীকার করিবার অনুকূলে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এবারে প্রথমে মানুষের যৌন আকর্ষণের প্রবৃত্তির বিশিষ্টতার কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আগেকার কালে মানুষেরা যখন বনে-পাহাড়ে স্বচ্ছন্দজাত সামগ্রির উপর নির্ভর করিত অথবা অল্পপরিমাণে চাষের কাজ করিতে শিখিয়াছিল, তখন এক-একটি পরিবারের পোষণের জন্য অতি অধিক স্থানের প্রয়োজন হইত। একটা বড় জেলার মত আয়তনের স্থান অল্প কয়েকটি আলাদা-আলাদা পরিবারের পক্ষে হয়ত যথেষ্ট হইত না ; কাজেই একটি পরিবার হইতে অন্য পরিবার অনেক দূরে-দূরে বাস করিতে বাধ্য হইত। কোন একটা বিশেষ বড় বনে শিকারের কাজে সফল হইবার জন্য যখন অনেক লোকের প্রয়োজন হইত, তখন অনেক স্থানের অনেক মানুষকে এক সঙ্গে জুটিতে হইত ও শিকারের পরে আপনাদের ভাগ নিয়া যে-যাহার দূর স্থানে চলিয়া যাইত। ঠিক এই রকমে দূরে-দূরে বাস করা ও সময়ে-সময়ে মেলার প্রথা এখনও ওড়িষার জঙ্গলের পাবুদিয়া ভুইঞাদের মধ্যে আছে ও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জুয়াঙ্ প্রভৃতি ক্ষয়শীল জাতির মধ্যে ছিল। ইহা আমার নিজের দেখা ঘটনা। কি-

ভাবে এক-একটি গ্রামে কেবল একটি পরিবারের এক-দল মানুষকে বাস করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা ১৮৮৫ অব্দে তখনকার ‘পতাকা’ নামক পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। অতি প্রাচীনকালে এই ধরণের স্থিতির সময়ে তরুণ-তরুণীরা যৌন আকর্ষণে পড়িত তখন, যখন দৈবে অপরিচিত স্থানের তরুণী-তরুণদের সঙ্গে দেখা-শোনা হইবার সম্ভাবনা হইত। মনের প্রকৃতির কিরূপ মৌলিক অবস্থার ফলে, দূরের অপরিচিতদের সঙ্গে দেখা হওয়ার উপর যৌন-অনুরাগের বিকাশ নির্ভর করিত, তাহা বুঝিয়া নিতে হইবে।

শিশুরা মা-বাপের আশ্রয়ে যখন বাড়ে, তখন মা-বাপের মনে যে-শ্রেণীর দয়া-মিশ্রিত স্নেহ জন্মে তাহা যে অন্য সম্পর্কের স্নেহ-মমতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর সেই ধাতুর স্নেহের সহিত যে অন্য ধাতুর মমতার আকর্ষণ জুড়িতে পারে না তাহা সকল বৈজ্ঞানিকেরাই স্বীকার করেন ও সাধারণ সকল লোকেই স্বীকার করিবে। অন্যদিকে অসহায় অবস্থায় যে-ধরণের স্নেহ-মমতায় শিশুরা বাড়িয়া উঠিবার সময় মা-বাপের প্রতি প্রাণের গভীর টান বাড়াইয়া চলে, সেই টানের বা আকর্ষণের ধাত্‌ বা ধাতু অন্য যে-কোন ধরণের আকর্ষণের প্রকৃতি হইতে এত স্বতন্ত্র যে, স্বাভাবিক নিয়মে সে আকর্ষণের গায়ে অন্যবিধ আকর্ষণ লাগিতেই পারে না। এই কথাটিও সর্ববাদিসম্মত ও মনস্তত্ত্বের পরীক্ষায় সম্পূর্ণ স্বীকৃত। তবুও ইহার উল্লেখ করিতে হইল এই জন্য যে, ফ্রয়েড্‌ ও তাঁহার দুই-একজন চেলা ইহার বিরুদ্ধে একটি কুপরীক্ষিত কথা বলিয়াছেন। এখানে সে তর্ক তুলিব না; তবে এইটুকু বলিয়া রাখি যে অনেক বড়-বড় দক্ষ পণ্ডিতেরা ঐ মতের অসারতা ও ভুল ভালভাবেই দেখাইয়াছেন। বাপ-মায়ের প্রতি মনের যে-ভাব সৃষ্টি করিয়া ও পুষিয়া শিশুরা যৌবনের সীমা পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছে, সেই ভাবের গায়ে (আর কিছু না হোক,

কেবল অধিক পরিমাণে বয়োধিকদের প্রতি) এমন ভাব আনিয়া জোড়া লাগিতে পারে না, যে-ভাবের প্রথম অঙ্কুর হয় যৌবনের বিকাশে। ফ্রয়েড পরীক্ষা করিয়াছেন বিকৃত মস্তিষ্কদের মনের অবস্থা, আর সে পরীক্ষাও হইয়াছে অতি কুপরীক্ষিত। অন্যান্য অনুরাগের প্রাকৃতিক বিকাশের ইতিহাসে পাঠকেরা এই মতবাদের অসারতা পরিপূর্ণভাবে দেখিতে পাইবেন।

পূর্বেই অনেক নীচ শ্রেণীর জীবদের জোড়-বাঁধার প্রকৃতির আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি যে, যৌন আকর্ষণ বাড়ে অপরিচিত বা stranger-কে দেখিয়া, ও নিজের দল বা বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াই বহু শ্রেণীর জীবকে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। যদিও পৃথিবীময় সকল জাতির সকল সমাজেই এই অভিজ্ঞতা ও সংস্কার আছে যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে কখনও ভাই-বোনে প্রেমের আকর্ষণ জন্মে না, তবুও Westermarck প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদেরা বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় দেখাইয়াছেন—ভাই-বোন ত অতি দূরের কথা, স্বাভাবিক অবস্থায় শিশুরা যাহাদের সঙ্গে অতি পরিচিত, যাহাদের সঙ্গে একত্র খেলা করিয়া বাড়িয়াছে তাহাদের প্রতিও যৌন আকর্ষণ জন্মে না। যৌন আকর্ষণ যে যৌবনে অপরিচিতের নূতন মুখ দেখিয়া প্রথম জন্মে, আর ঐ ভাব যে সঙ্গীদের প্রতি সঞ্চারিত স্নেহ-সৌহার্দ প্রভৃতির সম্পূর্ণ অননুরূপ, তাহা বোঝাইবার জন্য তাঁহার বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় Havelock Ellis এইরূপ লিখিয়াছেন—Between those who have been brought up together from childhood all the sensory stimuli of vision, hearing and touch have been dulled by use, trained to the calm level of affection, and deprived of their potency to arouse erethistic excitement

which produces sexual tumescence। এইসকল কারণেই যাহাকে বলে incest বা অবৈধ যোগ তাহার প্রতি মানুষের আছে স্বাভাবিক গভীর ঘৃণা, যাহাকে পণ্ডিতেরা ইংরেজীতে বলিয়াছেন deep-seated natural aversion।

যৌবনের প্রথম বিকাশে প্রেমের নূতন ভাব বাড়ে নূতন মুখ দেখিয়া। যুবকের চোখে নূতন যুবতী রক্ত-মাংসে গড়া জীবের কিছু উপরে; she is a phantom of delight—সে আনন্দের মানস-প্রতিমা। একসঙ্গে বাসের প্রয়োজনে এই আকর্ষণের কথা বাপ-মাকে জানাইতে হয়, কিন্তু প্রেমের ধর্ম এই যে একথা নিয়া তরুণ-তরুণীরা দশজনের সঙ্গে আলোচনা করিতে পারে না; নিজেদের কথা গোপনে রাখে। যেযুগে এদেশে প্রেমে-পড়ার প্রকৃতি সামাজিক অবস্থার দরুণ জানা ছিল না, সেই যুগের কবিতাতেই রাধাকে 'সখি রে, সখি রে' বলিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিতে দেখি। মানুষের প্রকৃতিতে যে এই ব্রীড়া স্বাভাবিক, তাহা এ প্রসঙ্গে অন্য কথা বুঝিবার সময়ে প্রয়োজন হইবে। Companionate Marriage-এর অবৈজ্ঞানিক জজ্ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—মেয়েরা তাহাদের একাধিক পুরুষ-সেবার গোপন প্রেম-লীলার কথা অসঙ্কোচে তাঁহাকে বলিয়াছে। এই মেয়েরা যে প্রকৃতির স্বাভাবিকতা আত্মব্যবহারে ধ্বংস করিয়া লজ্জা ছাড়িয়াছে তাহা প্রেমের ভাবের বিশ্লেষণে দেখিতে পাইব। জজ্ গ্রন্থকার যৌন সম্পর্কে লজ্জার ভাবকে তুচ্ছ করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি অনায়াসে যে-কোন মুহূর্ত্তে যে-কোন লেখকের সম্মুখে নগ্ন হইতে পারেন। এই উক্তিটুকুই প্রমাণ করিতেছে যে তিনি স্বাভাবিক প্রেম-বিকাশের ও লজ্জার উৎপত্তির ইতিহাস একবিন্দুও জানেন না। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতি নিভৃত জঙ্গলেও অসভ্য জুয়াঙ্গেরা গাছের পাতা

গাঁথিয়া পরিয়া চিরকাল লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। বিবাহের ইতিহাসের প্রসঙ্গে এবিষয়ের পূর্ণ বিচার এখন না করিলেও চলে, তবে মনে রাখিতে হইবে—প্রেমের আকাঙ্ক্ষার বিকাশে, যে নূতনত্বটুকু হয় প্রেমিকদের প্রার্থনীয় ও আকর্ষণের বস্তু, তাহার সঙ্গে এই লজ্জার ভাবও অনেকখানি জড়াইয়া আছে। *

আমাদের সমাজে বিবাহ হইত প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবার পূর্বেই—শৈশবে; 'বিবাহ হইত' লিখিয়াছি এইজন্য যে এখন সর্দা আইন পাস্ হইয়াছে। শৈশবে বিবাহ হইবার পর বৌকে আসিয়া থাকিতে হইত স্বামীর বাড়ীতে বা শ্বশুর-বাড়ীতে; যে কারণেই হোক নিয়ম ছিল ও আছে যে, বৌকে সর্বদাই ঘোমটা দিয়া চলিতে হইবে। পরোক্ষভাবে ইহাতে এই উপকার হইত যে স্বামীটি বাড়ীর বোনেদের মত বাল্যেই তাহার স্ত্রীকে সর্বদা কাছাকাছি পাইয়া তাহার প্রতি যৌন আকর্ষণের ভাবটুকু নির্মূল করিতে পারিত না; ঘোমটায় নূতনত্ব রক্ষা করিত। নূতনত্বে আকর্ষণ জন্মে, ইহা প্রায় সকলেই বুঝি; কাজেই এ বিষয়ের অতিরিক্ত আলোচনা করিব না।

অল্প পূর্বে লিখিয়াছি যে আদিমকালের সমাজে যখন এক-এক পরিবারের লোক আপনাদের দলের অন্যান্য পরিবারের বাসস্থান হইতে দূরে বাস করিত, তখন তরুণ-তরুণীরা কোন-কোন প্রয়োজনে আপনার বাসগৃহ হইতে দূরে গিয়াই প্রেমে পড়িবার সুবিধা পাইত। আকর্ষণ পাকা হইলে যখন বিবাহ হইত তখন বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পরিবারের অবস্থা ও সুবিধা অনুসারে বরকে বা তরুণ পতিকে হয় তাহার মা-বাপের ঘরে পত্নীকে আনিয়া বাস করিতে হইত, না হয় শ্বশুরের ঘরে

---

* প্রবন্ধের শেষভাগে এবিষয়ের আলোচনায় 'লজ্জা ও জুগুপ্সা' দ্রষ্টব্য।

গিয়া থাকিতে হইত, আর না হয়ত নিজে একখানি নূতন গ্রাম বসাইবার মত নিজের বাসভবনের কিছু দূরে পত্নীকে নিয়া নূতন ঘর-সংসার পাতিতে হইত। যে-যে বিভিন্ন অবস্থায় এই ভিন্ন-ভিন্ন রকমের ব্যবস্থা হইত, তাহা এখানে খুঁটাইয়া না বলিলে চলে। এই যুগের তরুণ-তরুণীরা এমনভাবে আপনাদের ঘর-সংসারের কাজে লাগিত, যাহাতে দূরের অন্যান্য পরিবারের যুবক-যুবতীদের সঙ্গে (কালে-ভদ্রে ছাড়া) মিলিয়া-মিশিয়া আলস্যে সময় কাটাইবার বা দীর্ঘ সময় ধরিয়া গল্প-গাছা করিবার সময় পাইত না। যেখানে তরুণ-তরুণীরা আলাদা নূতন সংসার পাতিত সেখানে ও দিন-রাত্রি নিজেদের কাজে সময় কাটাইত। তাহার পর ঘাড়ে পড়িত শিশু-সন্তান পালনের ভার। না ছিল তখন একালের মত যখন-তখন অপরিচিতদের সঙ্গে বৈঠক বসাইবার সুবিধা, আর না ছিল কাজকর্মে ব্যাপৃতদের মধ্যে অস্বাভাবিক রকমে যৌনভাবের নূতন-নূতন উত্তেজনা পাইবার সুবিধা। সময়ে-সময়ে আনন্দের উৎসবে নানা দলের লোকে মিলিত বটে, কিন্তু এই সকল নানা-বয়সী লোকের দঙ্গলে উপরে লিখিত ঘটনাগুলি ঘটিতে পারিত না। ঐ উৎসবের সময়ে নূতন তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হইলে তাহারা সুবিধামত দেখা-শোনা করিয়া প্রেম বাড়াইত, কিন্তু যাহারা বিবাহিত হইয়া নিজেদের নূতন দায়িত্বের কাজে লাগিত তাহারা কাজ-কর্ম ফেলিয়া নূতন প্রেম বাধাইবার প্রবৃত্তি ও সুবিধা পাইত না। অতি সেকালের এইসকল অবস্থার চাপে (স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেও বটে) সমাজের প্রথম যুগে একনিষ্ঠ বিবাহ প্রথাই (monogamy) বিকসিত হইয়াছিল। বেরার প্রদেশের সীমান্তে সাতপুরা পাহাড়ের কুর্কু সম্প্রদায়ের লোকেরা ও সম্বলপুর-রাঁচী পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রদেশে ঐ কুর্কুদের জ্ঞাতি মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির লোকেরা

সর্বদাই একনিষ্ঠ বিবাহ-রীতি চালাইয়া আসিয়াছে; কেবল খাঁটী অঞ্চলে হিন্দুদের প্রভাবে কচিৎ-কচিৎ ঐ প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এই জাতির লোকদের বিবরণ আমি যে গ্রন্থে লিখিয়াছি তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; উহাতে আদিম জাতির গতি-বিধির অনেক কথা আছে।

একালের উন্নত ও জটিল সমাজে স্ত্রী-পুরুষে যেভাবে ঘরে বসিয়াই সুড়সুড়ি-দেওয়া সাহিত্য পড়িয়া ও অন্য দশরকমে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে পারে, সে অবস্থা যখন ছিল না তখনও প্রবল জাতির পীড়ন প্রভৃতিতে অনেক স্থানের অসভ্য জাতির লোকেরা নিতান্ত কোণ-ঠেসা হইয়া পড়িয়া স্বাভাবিক বিকাশের সুবিধা হারাইয়া যৌনসম্বন্ধে অনেক স্বৈরাচারের ও দুরাচারের হাতে পড়িয়াছে। এবিষয়ে মেলানেসিয়ার দৃষ্টান্ত অতি উপযোগী। বিখ্যাত পণ্ডিত মালিনওস্কি উহাদের স্বৈরাচারের বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; কিন্তু ঐ মনীষী গভীরভাবে সকল অবস্থা বুঝিয়া লিখিয়াছেন যে এখনও উহারা স্থায়ী বিবাহকেই জীবনের আদর্শ মনে করে ও অনেক দুরাচারের মধ্যেও একনিষ্ঠ বিবাহের আদর্শকে যথার্থ আদর্শ মনে করে। প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আদিম যুগে স্বাভাবিকভাবে একনিষ্ঠ বিবাহই জন্মিয়াছিল আর ঐ প্রথাই মানুষের মনে সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে আদর্শরূপে রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ হরবর্ট্ স্পেন্সর সমাজতত্ত্ব লিখিবার সময়ে ভুলভাবে সংগৃহীত স্বেচ্ছাচারের বিবরণই বেশি পাইয়াছিলেন; তবুও গভীরভাবে সকল অবস্থার বিচার করিয়া প্রায় ৬৫ বৎসর আগে লিখিয়াছিলেন যে, মানব সমাজের গতি একনিষ্ঠ বিবাহের দিকে ও মানুষেরা ভবিষ্যতে ঐ বিবাহপ্রথা পাইয়াই ধন্য হইবে।

সমাজের কি-কি অবস্থায় প্রাচীনকাল হইতেই নানাস্থানে একনিষ্ঠ

বিবাহের বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল তাহার আলোচনাতেও একনিষ্ঠ বিবাহের স্বাভাবিকতা আরও সুস্পষ্ট হইবে। কোথাও দেখা দিয়াছিল ও এখনও চলিয়াছে বহুপত্নীগ্রহণের বহুবিবাহ, আর কোথাও চলিয়াছিল ও চলিতেছে বহুপতিত্ব। এইসকল প্রথার উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করিয়া আলোচনা করিতে হইবে যে, সামাজিক উন্নতির জন্য একনিষ্ঠ বিবাহই শ্রেষ্ঠতম কি-না ও একালের কোন-কোন সভ্য সম্প্রদায়ের মতের অনুসারে বিবাহ-প্রথা উড়াইয়া দিয়া বা শিথিলতর করিয়া মানুষের সমাজ রক্ষা করা চলে কি-না।

বিবাহ-বিধি

২

বলিয়াছি—জীবমাত্রের শরীর যে উপাদানে গড়া, তাহারই ফলে কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, কিম্পুরুষ, বানর ও মানুষ এই ধাত্ ও প্রবৃত্তি পাইয়াছে যে, বংশ বাড়াইবার জন্য সকলে জোড় বাঁধিতে চায়, আর সেই জোড়-বাঁধা বা বিবাহ স্থায়িত্ব পাইতেছে জীবদেব ক্রমবিকাশের ক্রমোন্নতিতে। বলিয়াছি—বুদ্ধির বিনা চালনায় প্রকৃতিদত্ত গভীর আকর্ষণে মানুষ স্থায়ী বিবাহ ঘটাইয়া আপনাদের পরিবার ও সমাজ বাঁধিয়াছে। অন্য অনেক ইতর জীবে যাহা সূচিত, তাহা আদিম মানুষের বিবাহ-প্রথায় অতি সুস্পষ্ট; মানুষ তাহার ধাতের গুণে চাহিয়াছে নিজের বংশের বাহিরের নারীর সঙ্গে জোড় বাঁধিতে আর সেই জোড়-বাঁধাকে স্থায়ী একনিষ্ঠ বিবাহে নিয়মিত করিয়া সুখী হইতে। এই যদি হইল মানুষের প্রকৃতি-বদ্ধ প্রবৃত্তি, তবে বহুবিবাহ দেখা দিল কেন, আর স্থানে-স্থানে সামাজিক প্রথায় নারীর বহুপতিত্ব দেখা যায় কেন? কি-কি অবস্থায় নানা স্থানের নানা ছাঁচের সমাজ-বিকাশের ফলে বহুপত্নীত্ব ও বহুপতিত্ব দেখা দিতে পারিয়াছিল, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি।

যৌবনে অপরিচিতের সম্পর্কেই যৌনপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশের কথা বলিয়াছি। এই অপরিচিতেরা দূরে থাকিত বটে; তবে কত দূরে? একটি ভৌগোলিক সীমার মানুষ যখন বাড়িতে লাগিল, তখন তাহারা অল্পবিস্তর 'দূরে-দূরে আপনাদের প্রসারের ভূমি খুঁজিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছিল। একদলের লোকেরা যখন নানাভাগে বিভক্ত হইয়া নূতন-

নূতন স্থানে বাসা বাঁধিয়াছিল, তখন সেই স্থানগুলির বিশিষ্ট পরিচয়ের জন্য উপনিবেশগুলির বা গ্রামগুলির নাম দিতে হইয়াছিল। গ্রামের নামের জন্মের প্রাচীন ইতিহাসে পাই যে, ভিন্ন-ভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক লক্ষণ ধরিয়াই নাম দেওয়ার প্রথা ছিল; একটি স্থান পাহাড়ে ঘেরা, আর একটি স্থান বাঁশের বনে ঘেরা, আর একটি স্থান নদীর কূলে, আর একটি স্থানে হয় সাপের উপদ্রব বা বাঘের উপদ্রব বেশি,—এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, পাহাড়তলী, বাঁশবেড়ে, নৈহাটি, নাগপুর ও বাঘমারি নাম জানা-শোনা অবস্থায় অনেক পাওয়া যায়। আদিম অধিবাসীদের গ্রামে-গ্রামে এখনও ওড়িষায় ও মধ্যপ্রদেশে দেখিতে পাই, একজন লোক যদি অপর গ্রামে গেল তবে তাহার নাম জানা থাকিলেও লোকে তাহার বাসভূমির নামে চিহ্নিত করিয়া ডাকে—'নাগপুরিয়া কোথায় গেল, 'ওহে সোনপুরিয়া, এখানে এস', 'বাঘুটিয়া বড় ভাল লোক', ইত্যাদিভাবে ভিন্ন গ্রামের লোকের কথা উল্লিখিত হয়। এইরূপেই মানুষের দলের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানের উপদলের লোকেরা বাসস্থানের নামেই চিহ্নিত হইয়াছিল—বলিতে পারি, আর ঐ অবস্থা হইতেই যে একই দলের লোকদের মধ্যে বহুপরিমাণে গোত্রভেদ হইয়াছিল, ইহাই আমার নিজের সিদ্ধান্ত।

নৃতত্ত্ববিদেরা যেখানেই দেখিয়াছেন যে, মানুষের দলের ও গোত্রের নামের সঙ্গে জীব-জন্তুর বা গাছ-পাহাড়ের নাম সম্পর্কিত আছে, সেই-খানেই এই একমাত্র স্থির সিদ্ধান্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, সেই দলের বা গোত্রের লোকেরা, কোন একটা জীব বা পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইবার বিশ্বাসে আপনাদের দল প্রভৃতির নামকরণ করিয়াছিল, আর ঐসকল দলের লোকেরা উৎপাদক জীব প্রভৃতিকে সেইজন্য বিশেষভাবে সম্মান করে। আমি এই উপপত্তিটিকে অস্বীকার করি না, কিন্তু মনে করি যে

গোড়ায় সোজা বুদ্ধির প্রাকৃতিক অবস্থায় বিশেষ-বিশেষ ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থাসূচক গ্রামের নাম হইতে লোকদের বংশ ও গোত্রের নাম হইয়াছিল, পরে অন্য গোটাকতক কারণে তাহারা মানুষেতর পদার্থ হইতে তাহাদের উৎপত্তি স্থির করিয়াছিল। ধর, কোন গ্রামে পাহাড় বা বনের দুর্ভেদ্য অবস্থার কৃপায় শত্রুকে হারাইয়া গ্রামের লোকেরা সুখ ও স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারিয়াছিল ; সেই সূত্রে সেই গ্রামের প্রাকৃতিক অবস্থার আত্মা বা দেবতাকে তাহাদের রক্ষক মনে করিয়া তাহাকে বিশেষভাবে পূজা করিয়াছিল ও রক্ষক দেবতাকে আপনাদের পিতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। এখানে পদার্থবিশেষ হইতে উৎপত্তি ও তাহাকে totem খাড়া করা হইয়াছিল বিশেষ অবস্থার ফলে,—একেবারে গোড়ার কোন সংস্কারে নয়। মিসর প্রভৃতি অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যে, যখন এক গ্রামের লোক অপর গ্রামে স্থায়ী বাস রচনা করিয়াছে, তখন আদিগ্রামের একটি গাছের চারা আনিয়া পুঁতিয়া পূজা করিয়াছে, আর না-হয় বিশেষ শ্রেণীর পাথরের নুড়িটি আনিয়া পূজা করিয়াছে। এই ধরণের নানা দৃষ্টান্তে দেখাইতে পারা যায় যে গোড়াগুড়িই সকল স্থানে মানুষেতর পদার্থকে মানুষের বংশ প্রবর্তক বলিয়া লোকে ভাবে নাই। যাহাই হোক, ভিন্ন-ভিন্ন দলের লোকেরা মূল দল হইতে আলাদা হইবার পর নানা নামের চিহ্নে যে আপনাদিগকে চিহ্নিত করিয়াছিল ও ভিন্ন বংশের বা গোত্রের ধারণাকে স্থায়ী করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। এখন দেখ, একটু দূরের বাহিরের দলের মেয়ে পুরুষের বিবাহ প্রাকৃতিক টানে ঘটিবার পর যখন ঐ প্রথা সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তখন প্রত্যেক বিবাহ বহির্বিবাহের নিয়মে হইতেছে কি-না, তাহা সমাজের লোকে সজাগ হইয়া দেখিত ও উহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দিত না। যখন দূরে এদল-সেদলের লোকের সঙ্গে বিবাহ

চলিতেছিল তখন প্রতিদলের গোত্র-নাম ধরিয়া স্থির করা হইত যে কোন্ গোত্রের লোকের মাতৃকুলের, আর কোন্ গোত্রের লোকেরা নিজেদের কুলের মেয়েদের বৈবাহ্যকুল। এগোত্রে-সেগোত্রে বিবাহ হওয়া বা না-হওয়া যখন পাকা প্রথায় দাঁড়াইয়াছিল, তখন বর ও কন্যা খুঁজিতে হইত অনেক দূরে-দূরে। ইহাতে অতি আদিম সমাজের মধ্যে যেভাবে সহজে প্রাকৃতিক প্রেমের মিলন ঘটিত তাহা সম্ভব হইতে পারে নাই; সামাজিক প্রথা-রক্ষার প্রহরী অভিভাবকদের বাছনিতে বিবাহ-চলা হইয়াছিল অধিক প্রচলিত। Heredityর নিয়ম ও ফল বিচারের সময় 'জন্ম, কর্ম ও পরিবেষ" প্রভৃতি প্রবন্ধ কয়েকটিতে যেসকল কথা লিখিয়াছি তাহাতে এই অবস্থাটি সূচিত আছে যে, প্রেমে-পড়া বিবাহ যত কম হয়, ততই প্রেমের আকর্ষণে প্রেমের পাত্রীকে চিরস্থায়ী অনুরাগের পাত্রী করার পক্ষে বাধা ঘটে, অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়মে জাত পবিত্রতা, যৌন সম্পর্কে ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। তাহার পর আর একটি অবস্থার বিচার করিতে হইবে। বহুদূর হইতে যখন পাত্রী সংগ্রহ করা হইত, তখন পাত্রীর সম্বন্ধে এইটি ঘটিত যে তাহাকে স্বামীর পরিবারে ও গ্রামে অপরিচিতদের মধ্যে বাস করিতে হইত; কাজেই কাহারও সঙ্গে বসিয়া তাহার বাল্যস্মৃতির গল্প করিয়া বা মনের কথা খুলিয়া বলিয়া সুখী হইবার ব্যাঘাত ঘটিত, কেন-না স্বামীর সঙ্গই একমাত্র বিনোদের বস্তু হইতে পারে না। অনেকখানি এই অসুবিধার দিকে চাহিয়া ও অনেক সময়ে বৈবাহ্যকুলের পাত্র অধিক না পাওয়ার অসুবিধায় একবাড়ীর কয়েকটি বোন্‌কে একঘরে সম্প্রদান করা হইত। এই শ্রেণীর বিবাহ নৃতত্ত্বের গ্রন্থে Sorrorate নাম পাইয়াছে। বিবাহ হইবার পর মেয়েরা যে কালে-ভদ্রে বাপের বাড়ী ফিরিত, অথবা একেবারেই পারিত না, তাহা ওড়িষা প্রদেশের অনেকেরই

জানা আছে। ওড়িবার অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার সময় তাহার কয়েকজন অনূঢ়া একবয়সী দাসী বা সখীকে (পইলি) তাহার সঙ্গে পাঠাইতে হয়। এই পইলিরা পত্নী না হইলেও বরের ভার্য্যা বা ভরণ-পোষণে রক্ষিতা স্ত্রী হইয়া থাকিত ও থাকে। যখন সমাজের অবস্থার গুণে প্রেমের আদিম ভাবের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়, তখন পুরুষের পক্ষে পত্নীবাহুল্য বাধে না; বরং এক পত্নীর অসুখ-বিসুখে বা শারীরিক অসুবিধার সময় ইচ্ছামত অন্য স্ত্রী পাইয়া পুরুষেরা সুখে থাকে। সমাজে এইভাব বাড়িবার পর দেখা যায় যে একজন সম্পত্তিপন্ন লোক যদি যুবতীবহুল সমাজে বহু স্ত্রীর স্বামী না হয় তবে তাহার হয় নিন্দা। আফ্রিকার অনেক স্থানে এক বা অল্পসংখ্যক স্ত্রীর ধনী স্বামীকে লোকে এই বলিয়া তিরস্কার করে যে, লোকটি এত কৃপণ ও স্বার্থপর যে তাহার অনেককে পালিবার ক্ষমতা থাকিতেও সে অনেক নিরাশ্রয় যুবতীকে বিবাহ করিতেছে না। অতি দরিদ্র সমাজেও দেখিয়াছি যে, সংসারের আর্থিক অবস্থার সুবিধার জন্যই দরিদ্র ব্যক্তি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। মধ্য-প্রদেশের একটি স্ত্রীলোক আমার বাসায় শাক-সব্‌জি বেচিতে আসিত, আর সে একদিন যখন প্রফুল্লমনে আমাকে জানাইল যে শীঘ্রই তাহার ঘরে সতীন আসিবে, তখন আমি বিস্ময়ে তাহার আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; সে বলিয়াছিল—সে একা ঘরের খুঁটিনাটি দেখিয়া এত সময় পায় না যে, স্বামীকে চাষের কাজে সাহায্য করিতে মাঠে যাইতে পারে, কাজেই সতীন আসিলে ঘরের কাজ চলিবে ভাল। এই প্রসঙ্গে সেই দেশ-পরিচিত দৃষ্টান্ত দিলাম না

একটি উচ্চ-বংশের লোককে উচ্চ বংশের বা কুলীন বংশের মান-মর্য্যাদা রাখিবার জন্য অনেক বিবাহ করিতে হয়। এযুগে আর ইহার

উল্লেখের প্রয়োজন নাই যে, স্ত্রীলোকেরা যেখানে শিক্ষিত হইতেছে আত্মমর্য্যাদা বুঝিতেছে, ও অনেক বিষয়ে জীবনকে স্বাধীন করিতেছে সেখানে স্বামীদের পক্ষে বহু পত্নী গ্রহণ চলিতে পারিবে না ও কাজেই স্পেন্সর্ প্রভৃতি প্রেমের যে প্রাকৃতিক আঠার কথা লিখিয়াছেন তাহা প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখা দিবে। এবিষয়ে আর কয়েকটি কথা শেষের দিকে লিখিতেছি।

বহুপতিত্ব—এই যে আছে অনুমান—সমাজ বিকাশের গোড়ায় নারীর বহুপতিত্ব সর্বত্র আগে দেখা দিয়াছিল, উহা যে সুপরীক্ষিত নয়, তাহা আদিম সমাজের বিবাহের উৎপত্তির বিবরণে সূচিত করিয়াছি। কিরূপ বিশেষ অবস্থার ফলে ঐ বিশেষ প্রথার জন্ম, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব। পৃথিবীর একোনায়-সেকোনায় অতি অল্প গোটা-কতক স্থানেই এই প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশের উত্তরে তিব্বতে এই প্রথা আছে, মাদ্রাজ অঞ্চলে নায়ারদের মধ্যে ও তাহাদের প্রতিবেশী দু-একটি ক্ষুদ্র জাতির মধ্যে এই প্রথার পরিচয় পাই। আসামের পার্বত্যপ্রদেশের খাসিয়াদের মধ্যে নারীদের যে-শ্রেণীর সামাজিক প্রভুতা দেখিতে পাই, উহার উৎপত্তি বহুপতিত্ব প্রথা হইতে কি-না তাহার সযত্ন অনুসন্ধান হয় নাই। মাদ্রাজের নায়ারেরা ও নাম্বুথেরি ব্রাহ্মণেরা কোথা হইতে অগ্রসর হইয়া মলবর প্রদেশে আসিয়াছিল, তাহার ইতিহাস জানা নাই। তবে দেখিতে পাই যে তাহাদের অল্পসংখ্যক লোকের সমাজের চারিদিকে দ্রবিড়দের যে বহুবিস্তৃত সমাজ আছে, তাহার মধ্যে কোথাও এই প্রথার প্রচলন নাই। এই যে উপপত্তি আছে যে, নারী যেখানে হইয়াছে সমাজের প্রধান ও নারীর হাতে আছে অনেক প্রভুতা, সেইখানেই যে ধরিতে হইবে —ঐ প্রথা বহু-পতিত্বমূলক, সে উপপত্তি নিখুঁৎ মনে করিতে পারি

নাই ; মনে হইয়াছে—হয়ত-বা ঐ উপপত্তি রচনার সময়ে এই প্রাকৃতিক অবস্থাটি মনে রাখিতে ভুল হইয়াছে যে, মানুষের প্রথম আবির্ভাবের সময় হইতে এ-পর্য্যন্ত পুরুষকেই পাওয়া গিয়াছে সর্বত্র অধিকতর বলিষ্ঠ ও কঠিন কর্মের উপযোগী ও গুরুতর দায়িত্বের অধিকারী। শারীরিক বলে পুরুষের এই প্রাধান্য সকল ইতর জন্তুদের মধ্যেও আমরা নির্ভুল-ভাবে দেখিতে পাই। আর আমাদের সামাজিক বিকাশের ইতিহাসে এই শারীরিক বলের মূল্য অতি অধিক। উত্তর আমেরিকার দিকে যেখানে আদিম জাতিদের মধ্যে নারীদের দখলে আছে রাজ-গদি, সেখানেও যে সকল গুরু দায়িত্বের কাজে পুরুষের প্রাধান্যই চলিয়া আসিয়াছে, তাহা আমেরিকার বড়-বড় নৃতত্ত্ববিদ্-দের অনুসন্ধানে স্থির হইয়াছে। ঐসকল সমাজে বা আসামের খাসিয়াদের সমাজে স্ত্রীলোকদের হাতে যেসকল কর্তৃত্ব আছে তাহাতে স্ত্রীজাতির ক্ষমতার প্রাধান্য সূচিত হয় কি-না, তাহা সাবধানে বিচারিত হওয়া চাই। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি সামাজিক অবস্থার বিশেষত্বের বিচার করিতেছি।

একটি নির্দিষ্ট স্বাধীন জাতির রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশ যদি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত না থাকে, যদি সীমান্তের পাহাড় প্রভৃতি ভেদ করিয়া অলক্ষ্যে শত্রু জাতির লোকের পক্ষে রাজ্যটি আক্রমণ করা সম্ভবপর হয়, তবে দেশের সীমান্তে নিরন্তর সজাগ দৃষ্টিতে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে হয় ও গোপন আক্রমণ বন্ধ করিতে হয়। এই কাজ যে, ঐ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্বের কাজ, আর উহার তুলনায় যে দেশের অভ্যন্তরে নিরুদ্বিগ্ন মনে ঘর-সংসারের কাজ চালান সহজ, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারি। যাহারা বলিষ্ঠ অর্থাৎ বয়স্ক পুরুষ তাহাদের পক্ষে নিয়ত সীমান্তপ্রদেশে যোদ্ধা সাজিয়া ঘুরিতে ফিরিতে হয় ও তাহাদের পক্ষে ঘন-ঘন দেশের অভ্যন্তরে আসা চলে না। অভ্যন্তরপ্রদেশে নিরুদ্বেগে

উপার্জ্জনের কাজ চলে ও শিশুদের পালনের কাজ চলে। এ অবস্থায় শান্তিতে দেশ চালাইয়া ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থায় ভার স্ত্রীলোকদের হাতে সঁপিতে হয়। সাধারণ অবস্থায় ঘর-সংসার চালাইবার কর্তৃত্ব, উপার্জ্জন বিষয়ের কর্তৃত্ব, চাষ প্রভৃতি চালাইবার কঠিন কাজ যাহাদের হাতে থাকে তাহাদিগকেই আমরা গৃহের ও সমাজের মালিক ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, কিন্তু যেখানে দেশের স্থিতি-রক্ষার উচ্চতম কর্তব্যে বলিষ্ঠ পুরুষেরা নিয়ত নিয়োজিত, সেখানে আপাত দৃষ্টির কর্তাগিরির কাজ নারীদের হাতে দেখিয়া, সমাজকে নারী-প্রধান বলা চলে না। ঘর গোছাইয়া, ঘরের মালিক সাজিয়া বসিতে হইলে যে, নারীদের শান্তিময় আশ্রয়ে বয়স্ক পুরুষদিগকে পালা করিয়া আসিতে হইত, তাহা নির্ভুল সমাজে আবার তখন প্রয়োজন ছিল যে, লোকসংখ্যা বাড়াইয়া দেশরক্ষার উপায় চিরস্থায়ী করা। এ অবস্থায় এক-বংশের একটি তরুণ দল (সুপরিচয়ের হিসাবে ভাই সম্পর্কে সম্পর্কিত দল) যদি এক-একঘরের এক-একটি তরুণীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখিত, তাহা হইলেই পালা করিয়া ঘরে ফিরিবার সময়ে যৌন সম্পর্কের বিচারে কয়েকজন তরুণ-বয়স্ককে এক-একজন তরুণীর পতি হইতে হইত, আর তাহাদের আবাস হইত পত্নীর গৃহে। একজন নির্দিষ্ট পুরুষের সহবাসে যে একটি নির্দিষ্ট সন্তানের জন্ম, তাহা সকল সময়ে স্থির করা কঠিন হইত, আর বংশের সমস্ত সম্পত্তি থাকিত এক-একজন নারীর হাতে। এ অবস্থায় নারীদের নাম ধরিয়াই সন্তানদের উত্তরাধিকার নির্ণয় করা সহজ হইত। কয়েক পুরুষ ধরিয়া কোন প্রথা সমাজে চলিলেই তাহা পাকা সামাজিক প্রথায় দাঁড়ায়; সীমান্ত-রক্ষা প্রভৃতির কাজ যখন উঠিয়া যায়, মানুষেরা শান্তিতে বাস করে, তখনও বহু-পুরুষের প্রতিষ্ঠিত প্রথা পরিবর্তিত হয় না, বরং বিনাপ্রশ্নে সনাতন প্রথা পালিত হইতে

থাকে। নারীর প্রভাবের (Matriarchateএর) উৎপত্তির একটি অবস্থা বর্ণিত হইল ; এই প্রথার উৎপত্তির অন্যবিধ কারণ যে ছিল না, বলিতেছি না।

যে শ্রেণীর সামাজিক অবস্থার দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, সে অবস্থায় সমাজে পুরুষ-সন্তানের প্রয়োজন হয় অধিক ; জীবন-বিজ্ঞানের নিয়মে উহাতে পুরুষের সংখ্যা যথার্থই বৃদ্ধি পায় ও কাজেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত বহুপতিত্ব প্রথার অনুকূল অবস্থা জন্মে। এক নারীকে কেন্দ্র করিয়া সহযোগে উপার্জনের উপায় করিবার পক্ষে কয়েকজন ভাইকে (অর্থাৎ অতি পরিচিত ও সৌহার্দে মিলিত ব্যক্তিকে) পালা করিয়া নানা স্থানে ঘোরা অনেক অনুর্ব্বর দেশে খুব সহজে সম্ভব হয়। সেসকল স্থলেও নারীকে হইতে হয় গৃহকর্ত্রী ও সকল পতির উপার্জিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট দখলকার ; এইরূপ আরও নানা অবস্থার বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, নারী-প্রধান সমাজে কোথাও পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম দেখিয়া নারী-পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার চলে না।

প্রধানভাবে ইহাই আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য—যৌন-সম্বন্ধে যে মানসিক ভাব আমাদের প্রকৃতি-বদ্ধ ও যাহার ফলে হয় স্বাভাবিকভাবে একনিষ্ঠ বিবাহ, সেই ভাবের বিকৃতি ঘটে সামাজিক বিশেষ অবস্থায় ও সেই বিকৃতির ফলেই কখনও-কখনও বহুপতিত্ব দেখা দিয়াছিল আরও অধিক পরিমাণে। সকল বিষয়ে পুরুষের পূর্ণ অধিকারের সমাজে বহুপতিত্ব প্রথা চলন হইয়াছিল ; বিবাহ-প্রথার প্রকৃতি ও তাহার সকল রকমের বিকৃতির মধ্যেই কিন্তু এই নৈসর্গিক নিয়ম দেখিতে পাই যে, বিবাহ একের সঙ্গে হোক, বা বহুর সঙ্গে হোক, সে বিবাহ নির্দিষ্ট পুরুষের সঙ্গেই নির্দ্ধারিত হয়। এইরূপ নির্দিষ্টতা না থাকিলে যে, সমাজের বাঁধন টিকিতে পারে না ও জীবনে ব্যক্তিনিষ্ঠ সুখ বাড়িতে

পারে না, তাহা কয়েকটি অবস্থার আলোচনায় পরিস্ফুট হইবে মনে করি।

পূর্বেই যৌনসম্পর্ক-স্থাপনের প্রবৃত্তির মৌলিক প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছি; উহার একটুখানি পুনরুল্লেখ করিতেছি। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, বয়সের একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিবার পূর্বে, অর্থাৎ শরীরে একটি নূতন রসের সঞ্চারের পূর্বে, শিশুদের মনে সেই ভাবের আকর্ষণ জন্মা অসম্ভব, যাহার ফলে জন্মে বিবাহের প্রবৃত্তি। যাহার সে অঙ্গ নাই তাহার সেই অঙ্গের ক্রিয়ার কথা কল্পনা করা চলে না; এই অবস্থায় শিশুর মনের কোন প্রচ্ছন্ন স্বপ্ন যৌন-মিলনের কামনায় নিজের পরিবারের কোন বর্ষিয়সীর দিকে বা খেলার সঙ্গীদের দিকে উদ্দীপ্ত হওয়া একটি কচ্ছপের উড়িবার স্বপ্নের মত সম্পূর্ণ অসম্ভব। অসাবধানে বৰ্দ্ধিত পরিবারে নানা কথার উপন্যাসে শিশুদের মনের কৌতুহলে বিবাহ সম্বন্ধে কল্পনা জন্মিতে পারে, আর সেই কল্পনায় বহুস্থানে বিবাহের কৃত্রিম অভিনয় শিশুদের খেলায় হইয়া থাকে; কিন্তু এ খেলায় যাহাকে যৌন আকর্ষণের টান বলে তাহা থাকে না ও থাকা অসম্ভব। তাহার পর মনে রাখিতে হইবে—যৌন আকর্ষণের সেই প্রকৃতি বা স্বাভাবিক গতির কথা যাহাতে আপনাদের বয়সের অনুরূপ পাত্র-পাত্রীতেই যৌন আকর্ষণ জন্মে। এ অবস্থায় বর্ষিয়সীদের স্বপ্ন শিশু বালকদের মনে জাগা প্রকৃতিতে অসম্ভব। এই কথাটির একটু উল্লেখ করিলাম ফ্রয়েডের একটি কুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়া, যাহা কেবল অবিচারে ও নামের দোহাই-এ এদেশের কোন-কোন তরুণ ব্যক্তি সত্য মনে করিয়াছে।

ইহার পরে বলিতেছি—মনে নানাধরণের কোমল ভাবের উৎপত্তির কথা। প্রফুল্লমনে নানাদিকের কর্মে পটু হইবার পক্ষে, অর্থাৎ

মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে মানুষকে নানাগুণে ভূষিত হওয়া চাই ; যেমন হাত-পায়ের বল বাড়াইবার প্রয়োজন, খাদ্য হজম করিবার শক্তি বাড়াইবার প্রয়োজন, তেমনই নানাদিকে মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ পাতিয়া বিভিন্ন কর্মের উপযোগী হইয়া মানুষকে বাড়িতে হয়। যদি সঙ্কীর্ণতায় নীচ স্বার্থপরতা বাড়ে, যদি দশজনের সঙ্গে মিলিয়া দশের মন রাখিয়া কাজ করিবার অনভ্যাসে ক্রোধ ও হিংসার বৃদ্ধি হয়, তবে মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। নানাধরণের কোমল অনুরাগ যদি আপন-আপন সীমায় বাড়িতে না পারে তবে বাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। মা-বাপের কোলে বাড়িয়া তাহাদের প্রতি যে ভক্তির ভাব জন্মে, একসঙ্গে বাড়িয়া ও খেলা করিয়া যে মধুর সখ্যভাবের বিকাশ হয়, তাহার সঙ্গে যে যৌন আকর্ষণের ভাবের একটি পরমাণুও সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে যুক্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ যৌনভাব হয় ঐ অন্যবিধ ভাবের সঙ্গে মিলিবার incompatible element বা প্রতিবাদী অবস্থা তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। যেখানে ঐ স্বাভাবিকতার ধ্বংস হয় সেখানে হয় মনুষ্যত্বের ধ্বংস,—জীবনের উদ্দেশ্যের ধ্বংস। যাঁহারা মনে করেন যে মা-বাপের ঘাড়ের বোঝা হাল্কা করিয়া সন্তানের পালনের ভার দিবেন কোন আশ্রমে বা আড্ডায়, যেখানে আপনাদের মা-বাপের কাছে ও আপনাদের মা-বাপের আওতায় আপনার বলিয়া আপনাদের ভাই-বোনকে চিনিতে পারা যায় না, ও এক পরিবারের হইয়া একত্ব-বোধ জন্মাইতে পারা যায় না, সেখানে শিশুদের মনে ভক্তি, স্নেহ, প্রভৃতি ভাবের জন্ম হইতে পারে না ; সে অবস্থায় মনুষ্যত্ব হইবে সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ,—গুণের হিসাবে মানুষেরা হইবে অন্ধ, খঞ্জ ও বধির। আড্ডায়-আড্ডায় কর্মঠ চোয়াড় গড়িয়া উপার্জনের কল ও যুদ্ধ চালাইতে পারা যায়, কিন্তু মনুষ্যত্ব পাওয়া যায় না, যাহার অভাবে সকল কল বিকল

হইয়া সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য। যৌন আকর্ষণের নূতন মধুরতা যদি একনিষ্ঠ হইয়া নিয়ত একসঙ্গে থাকিয়া বাড়াইতে না পারা যায়—তবে নিশ্চয়ই অসংযম আসিয়া মানুষকে চপল করিবে, ও মানুষের সমাজ ক্ষয়ের পথে চলিবে। জীবন-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে মানুষ—গরু-পাখা নয়।

জীবনের এই নীতি যাঁহারা মানেন, তাঁহাদের কাহারও-কাহারও মুখে গুপ্ত আলোচনায় শুনিয়াছি যে কেহ-কেহ মনে করেন—একটু-খানি ডুব দিয়া জল খাইলে ক্ষতি হয় না, অথবা অবস্থা-বিশেষে ব্যভিচারে দোষ ঘটে না। প্রাকৃতিক ক্রিয়ার যে বাঁধা নিয়ম আছে, প্রকৃতি সে নিয়মের ব্যতিক্রম সহিতে পারে না। এই কথা ভুলিলে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হয়। যত ছোট হোক, আমাদের কাজ হয় মনের গতির প্রকৃতিতে; ছোট কাজে মনের গতি দূষিত হয় না,—আমাদের বিকৃতি জন্মে না, এ বড় ভ্রান্ত ধারণা। কর্তব্যনিষ্ঠায় এমন করিয়া বাড়িতে হইবে যাহাতে মাছের পক্ষে যেমন হয় জল-ছাড়িয়া-বাঁচা অসম্ভব, মানুষের প্রকৃতিতে জন্মা চাই তেমন ভাব যে, সন্নীতির গণ্ডির বাহিরে গেলে তাহাকে দুঃস্থ হইতে হইবে। কোনও একটি সমাজদ্রোহী লোকের দল যেমন বলে যে Nature does not care for chastity, তাহা যদি সত্য হইত তবে তর্কই উঠিত না; আমরা দেখিয়াছি—প্রকৃতির বিধানে আমাদের জীবনে বিদ্রোহীদের ঐ বাণী অসত্য। সকল সময়ে সংযম রাখা কষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু সেই কষ্টসাধ্য সংযম-লাভই প্রতিজনের জীবনের বাঞ্ছিত ও সমাজের কল্যাণকর। কাহারও সাধ্য নাই বলিতে পারে যে, অসংযমের তৃপ্তি খুঁজিলে তাহাদের চিন্তাশক্তি বাড়ে বা স্বাধীনতার বুদ্ধি জাগে বা কঠোর কর্ম করিবার পটুতা জন্মে; উহাতে যে চপলতা আনে ও প্রাণকে টানে অমঙ্গলের দিকে তাহা কোনও চালাকির তর্কে ঢাকা যায় না।

যাহারা ডুব দিয়া জল খাওয়ার দলে নয়, কিন্তু যৌন-ব্যবহারের নীতি না মানিয়া চলে তাহারা তাহাদের পথকে ঠিক মনে করিয়া সেইরূপ করে। ইহাদের পক্ষে ভাল দিক্‌টি এই যে তাহারা যখন সত্য মনে করিয়াই একটি কাজ করে তখন সে কাজ অমঙ্গলজনক বুঝিলেই, মনে সত্য-পথে-চলার অভ্যাসে তৎক্ষণাৎ অহিতের পথ ছাড়িবে। চুপ্-শয়তানকে কিন্তু ঠিক পথে টানা দুঃসাধ্য।

একনিষ্ঠ বিবাহের পর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে প্রেমের বৈচিত্র্যে মনে নূতন-নূতন ভাবের আঠা না জন্মে, তখনও যদি 'ছাড়া-ছাড়ির' পন্থা না ধরিয়া নূতনত্বহীন অবস্থার মধ্যে সংযম ও প্রতিজ্ঞার বলে অল্প দিন-কতক টিকিয়া থাকে, তাহা হইলেই প্রত্যক্ষ করিবে—সংযমে জীবনকে কত উন্নত ও দৃঢ় করে। সংযমীরা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে যে, প্রেমপাত্রী যখন হয় রোমান্স্-শূন্য তখন একশ্রেণীর রোমাঞ্চ না জাগিলেও প্রকৃতিতে যে ধীরতা আসে তাহা চপলতাকে প্রশ্রয় দেয় না।

আমাদের ব্যবহারে ও সামাজিক নানা অবস্থার ফলে বিবাহ বিষয়ে জীবনের মৌলিক গতিতে অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছে,—যে প্রেমে পড়া বিবাহ দম্পতীকে পরস্পরের কাছে একনিষ্ঠ করে তাহা বিরল হইয়াছে ও বিবাহ-প্রথা এমনভাবে দাঁড়াইয়াছে যাহাতে ঐ প্রথা সমাজকে উন্নত না করিয়া বহুশ্রেণীর সামাজিক ব্যাধির জন্ম দিয়াছে। বিবাহ-প্রথায় বিকৃতি আসিয়াছে ও অমার্জনীয় দোষ দেখা দিয়াছে বলিয়া বিবাহ-প্রথাটিকেই যাহারা উড়াইয়া দিয়া স্বৈরাচার আনিতে চায়—তাহারা আস্ত মূর্খ, তাহা আহাম্মক ও সমাজ-দ্রোহী।

লজ্জা ও জুগুপ্সা

ইংরেজি বচনে আছে—God made man and tailor made him a gentleman; উহার কথার লালিকা বজায় রাখিয়া বলা চলে—'ঈশ্বরের সৃষ্টি নরলোক আর দরজির সৃষ্টি ভদ্রলোক'। মরণকালে Job-এর মত বলিতে পারা যায়—আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম নগ্নশরীরে, এখন চলিয়া যাই নগ্নশরীরে। মানুষ কাপড় পরিয়া জন্মে না বটে, আর মরণকালেও কাপড় ছাড়িয়া ওপারে যাত্রা করা চলে বটে, তবে শৈশবের পর হইতে পৃথিবীর সভ্য-অসভ্য কাহারও পক্ষে নগ্ন থাকা হয়ত চলে না। ওড়িষা প্রদেশের জুয়াঙ্ জাতির লোক পাহাড়ের আড়ালের বনে-বনে যখন বাস করিত তখন অন্য অসভ্য জাতিদের সঙ্গেও তাহাদের দেখা হইত না আর উহারা এখনও অন্য কোনও জাতির লোকদের মত কাপড় বুনিতে শেখে নাই। নানাকারণে জাতির ক্ষয় হইতেছে; এখন উহারা কেওঞ্ঝর ও পাললহড়ার ছোট-ছোট বনে নীচ শ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে বাস করে আর তাহাদের মত কাপড় পরে ও চাষ করিয়া খাইতে শিখিতেছে। উহাদের নামের ব্যুৎপত্তি হয়ত 'জঃ +জম্, হইতে, যাহাতে সূচিত হয় যে উহারা ফল খাইয়া অথবা বেশির ভাগ ফলমূল খাইয়া থাকিত। গত শতকের নবম দশকে উহারা গভীর বনেই থাকিত আর কাপড় পরিত না, কিন্তু লজ্জা নিবারণ করিত গাছের পাতা পরিয়া। বাহিরের লোক উহাদের গ্রামের কাছে গেলেই মেয়েরা দূরে লুকাইয়া থাকিত, তবে পরিচয় হইলে কাছে বসিয়া কথা কহিত। ঠিক লক্ষ্য করিয়াছি যে সাধারণভাবে নানাবিষয়ে তাহাদের

সঙ্গে কথা কহিলে অসঙ্কোচে কথা কহিত, কিন্তু কেহ যদি উহাদের শরীরের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিত তবে উহারা সঙ্কোচে জড়সড় হইত, কারণ মানুষের বিভিন্ন ধরণের নজরের মানে সকল মানুষেই বুঝিতে পারে।

এই যে অন্যের সঙ্গে অসম্পর্কিত জুয়াঙ্-এরা আপনাদের দলে ও ঘরে লজ্জানিবারণের গুরু প্রয়োজন বুঝিয়া পাতার মালা পরিত আর বিশিষ্ট ধরণের নজরে সঙ্কুচিত হইত, ইহাকে ত সভ্যতার পীড়ন বা ঐরূপ কিছু বলা চলে না! এই যে লজ্জাশীলতার ভাব ও জুগুপ্সা, ইহার কারণ খোঁজা চাই শরীরের প্রকৃতির অনুসন্ধান করিয়া। নারী ও পুরুষ যৌবন সীমায় পৌঁছে যে বয়সে, তাহার আগে অর্থাৎ ভালভাবে বুদ্ধি-বিকাশের আগে শৈশবে নগ্ন থাকিতে কাহারও লজ্জা হয় না, কিন্তু বহুস্থানে দেখা গিয়াছে যে যখন শারীরিক কোন-কোন বিকৃতির ফলে অর্থাৎ রোগ-বিশেষের ফলে লজ্জাবোধহীন চার-পাঁচ বৎসর বয়সের মেয়েদের অস্বাভাবিক রকমে যৌবন-বিকাশের লক্ষণ দেখা দেয়, তখন তাহারা লজ্জায় ঘরে লুকায় ও কাপড় পরাইয়া না দিলে ঘরের বাহিরে আনিতে গেলে কাঁদিয়া খুন হয়। শরীরের অবস্থা-বিশেষের ফলে এই যে লজ্জা ও জুগুপ্সা জন্মে, শরীর-যন্ত্রের মধ্যেই ইহার কারণ প্রচ্ছন্ন আছে।

এ প্রসঙ্গে শরীর-যন্ত্রের যে glandগুলির কথা বলিব তাহাদের হয়ত 'অন্তর্মুখী গণ্ড' নাম দিলে চলে, কেন না thyroid glandএর বিকৃতির ফলে গলায় যে রোগ দেখা দেয়, তাহাকে আমরা গলগণ্ড বলি। যাহাই হোক্, আমাদের মাথার পিছনের দিকে খুলির তলায় যে pineal gland আছে, আর বুকের মধ্যে যে thymus gland আছে উহাদের ক্রিয়ার দরুণ মানুষের মনে শিশুভাব বা বাল্যের

সরলভাব বজায় থাকে ও মনে যৌন-সম্পর্কের ভাব একেবারেই জাগে না। যৌবন-বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই ঐ gland দুইটি শরীরের অভ্যন্তরে মিলাইয়া যায়,—আর উহাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা কঠিন হয়। অতি অস্বাভাবিকভাবে যৌবন-বিকাশের বয়সের আগে যেখানে-যেখানে শিশুদের শরীরে যৌন-লক্ষণ দেখা দেয়, সেখানেও উহাদের মধ্যে যে শিশুর অকালমৃত্যু হয় তাহার শরীর পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, শরীরে pineal ও thymus, রোগ-বিশেষের ফলে লুপ্ত হইয়াছে। Freud পণ্ডিত শিশুদের মনের যে অস্বাভাবিক কুস্বপ্নের কথা রুগ্ন ও বিকৃত মস্তিষ্কদের পরীক্ষায় বা কুপরীক্ষায় বলিয়াছেন, তাহা যে কিরূপ অসম্ভব কথা, তাহা শরীরের এই অবস্থার জ্ঞানেই ধরা পড়ে, কারণ বাল্যে যৌন-স্বপ্ন জন্মিবার কোন ভিত্তিই নাই।

ইহার পরে বলিব adrenal (আড্রিনাল) glands ও gonadsএর কথা। আড্রিনাল gland আছে মানুষের তলপেটের দুইদিকে kidneyর কাছে, আর শরীরে উহার উৎপত্তি ঠিক সেই স্থানে, যেস্থান হইতে জননেন্দ্রিয়ের মূল gonadsএর উৎপত্তি। Thymus ও pineal gland শরীরে মিলাইয়া যাইবার পর অর্থাৎ যৌবন আসিবার পর adrenal glandsএর বহির্ভাগ হইতে যে-রসের সঞ্চার হয় তাহাতে নারী ও পুরুষদের আলাদা-আলাদা ধরণ-ধারণ ও লজ্জাশীলতা বজায় থাকে। দেখা যায়, যদি adrenalএর বহির্ভাগের বা cortexএর ক্রিয়ার বিকৃতি ঘটে তাহা হইলে sexual inversion প্রভৃতি অতি অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয়। যদি adrenalএর ভিতরদিকের অংশে বা medullaয় রস সঞ্চার হয় অধিক, তবে নারীদের মধ্যে পৌরুষ ভাব দেখা দেয়।

এই যে এতখানি বিজ্ঞানের বিশেষ কথা লেখা গেল, তাহার

উদ্দেশ্য এই—কল্পনাপ্রিয়েরা বুঝিয়া নিন্ যে, শুষ্ শুড়িপ্রিয় গল্প-লেখকদের গল্প পড়িয়া ও ভাবপ্রধান লেখকদের বিবাহ সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খল প্রস্তাব পড়িয়া পাগলামি করা চলে না। যাহা শরীরের প্রকৃতিতে আছে, তাহা কেহ লোপ করিতে পারে না। লজ্জার স্বাভাবিক উৎপত্তির হেতু কি, তাহা অতি অল্পে নির্দেশ করা গেল; তবু একটু বুঝাইয়া বলিতে হইবে—কেন মানুষে রাস্তার কুকুরের মত আচরণ করিতে পারে না, আর জুগুপ্সা রাখিয়া সমাজের স্থিতি বজায় রাখিয়াছে।

যৌবনের আরম্ভে নব যুবকেরা অধিকতর বয়স্কদের অপেক্ষা বেশি লজ্জাশীল থাকে, তবে নারীদের অপেক্ষা পুরুষেরা হয় অধিক প্রগল্ভ ও চঞ্চল; উহার কারণ হয়ত এই যে, পুরুষদের glandএর medulla শরীরে অধিকতর নির্য্যাস বিতরণ করে ও তাহাদের gonadsএর প্রকৃতিতেও অধিক চঞ্চলতার কারণ আছে। পুরুষ যখন বিবাহপ্রার্থী হইয়া কোন নারীকে আয়ত্ত করিতে চায়, তখন নারীর কাছে বিবাহ-প্রার্থী যুবক আকর্ষণের পাত্র হইলেও নারী লজ্জায় থাকে মূক ও ধীরে-ধীরে পুরুষকে তাহার আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ করাইয়া নিতে হয়। আমাদের মধ্যে এখন courtship বা মিলনচেষ্টা নাই; কিন্তু পূর্বে ছিল। বৈদিকযুগের 'বর' শব্দটির খাঁটি অর্থ woer। পুরুষ যখন তাহার প্রগল্ভতায় ও আপেক্ষিক অধিক চঞ্চলতায় তরুণীর প্রেমপ্রার্থী হয়, তখন তরুণীর মনে বরের প্রতি টান জন্মিলেও সে তাহার স্বাভাবিক অচঞ্চলতায় নির্বাক থাকে, কিন্তু অনুরাগের কয়েকটি লক্ষণ শরীরে দেখা দেয়। তরুণ ব্যক্তির মনের ভাবের স্পর্শে যখন কোমল আকর্ষণের ভাবের স্রোত স্নায়ুর মধ্য দিয়া বহিতে আরম্ভ হয়, তখন সেই নূতন অপ্রত্যাশিত ভাবের ধারা বুদ্ধিকে জাগাইবার জন্য মাথার দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না; কেন-না ঐভাব গোড়ায় তাহার ইচ্ছায় জাগে

নাই ; কাজেই ভাবের ধারা উপরে-উপরে অল্প সঞ্চারিত হয় হাত-পায়ে আর বেশির ভাগ ধাবিত হয় মুখের দিকে। এই জন্য প্রথমে জাগে nervousness অর্থাৎ অস্থির বুদ্ধির বিহ্বলতা ; সে বিহ্বলতায় তরুণী আঙুল মট্‌কায়, আঙুলে আঁচলের মুড়া পাকায় অথবা হাতে কিছু থাকিলে দৈবাৎ সেটা পড়িয়া যায়। তাহার পর মুখের অবস্থার কথা একটুখানি বলি। যখন কোন অতিপ্রিয় পরিচিত ব্যক্তি দৈবাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ঘরে ফেরে, তখন শরীরে যে স্নায়বিক ধারা বয়, তাহা একটুখানি বিভিন্ন ; কারণ সেখানে মন থাকে নিঃসঙ্কোচ। ঐরূপ প্রিয় ব্যক্তি ঘরে ফিরিলে চোখের পেশী প্রসারিত হয়, আর বিস্ফারিত চোখে অধিক আলো ঢোকে ; তাহার ফলে চোখ দিয়া জল পড়ে। গালের ও ঠোঁটের বাঁধনও একটু শিথিল হইয়া সেখানে রক্ত সঞ্চারিত হয় ও মুখ হয় হাসিমুখ। তরুণীর কাছে নূতন তরুণ ব্যক্তির উপস্থিতির বেলায় গালের রঙ্‌ হয় অধিক রক্তিম, আর এই রক্তিম গালের নাম তরুণীর ব্রীড়া, যাহা প্রেমিকের চোখে বড় সুন্দর। অন্যদিকে চোখের অবস্থা হয় একটু আলাদা, পরিচিতের কাছে হয় চোখের বিস্তার, কিন্তু প্রেমপ্রার্থীর কাছে সঙ্কোচে হয় ঈষৎ সঙ্কুচিত, যাহাতে ঘটে কবিদের আদরের বর্ণনার চোখের পাতা ঢলিয়া পড়া। দেখিতে পাইতেছি যে এই লজ্জাশীলতা, ব্রীড়া ও জুগুপ্সা, ও বাচাল না হইয়া মূক হইবার ধরণ যুবক প্রেমিকের মনে অধিক উদ্দীপনা ও আকর্ষণ জন্মায় আর তরুণীর ধীরে-ধীরে প্রেমের প্রকাশে পরস্পরের প্রেম গাঢ় হইয়া ওঠে ; কাজেই ফল হয় মঙ্গলময়।

এই আকর্ষণের প্রকৃতি হইতে নির্ভুল ধরা যায় যে, শরীরে বদ্ধ নৈসর্গিক নিয়ম চায় মানুষকে প্রেমে একনিষ্ঠ করাইতে। ঐযে বর্ণিত হইল যে, প্রেমের মৃদু কোমল ভাব ধীরে-ধীরে জাগিয়া ওঠে, উহা

একজন তরুণ যুবক ছাড়া নারীর মনে দুইজন যুবক আসিয়া জাগাইতে পারে না; ঐভাবের মধ্যে আছে যে লজ্জাশীলতা ও জুগুপ্সা তাহা যদি না থাকিত তবে একাধিক পুরুষের কাছে নারী তাহার আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত। কবি Meridith একটি বর্ণনায় চমৎকার লিখিয়াছেন যে, একজন তরুণ বা তরুণী অপর তরুণী বা তরুণের দিকে প্রেমের সঞ্চারের পর বহুলোকের মাঝে এমনভাবে দৃষ্টি ফেলে যাহাতে উদ্দিষ্ট তরুণ ও তরুণী সেই দৃষ্টির আলোকে আলোকিত হয়, কিন্তু সমবেত জনসংখ্যার সকলে সেই দৃষ্টির বাহিরে অন্ধকারে থাকে। ধীরে-ধীরে যে পরস্পরের প্রতি প্রেমের ভাব ফোটাইতে হয় তাহা সম্পূর্ণ নির্জনে অপরের নজর এড়াইলেই ফোটে ভাল। আকর্ষণের বাঁধাবাঁধির পর যে-প্রেমের আলাপে মন প্রাণ খুলিয়া যায় সেই প্রেমালাপ মানুষের সমাজে সর্বত্র অতি বিজনে অপরের দৃষ্টির অতীত স্থানে হইয়া থাকে; পুরুষ ও নারী কুকুরদের মত রাস্তায়-রাস্তায় প্রেমালাপ করে না। একজন নারী যখন পুরুষের তোয়াজে সেই পুরুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করে—তখন সেই পুরুষের প্রতি প্রেমের আকর্ষণ বজায় থাকিতে সে কিছুতেই অপর পুরুষকে প্রেমের পাত্র করিয়া নির্জনের সঙ্গী করিতে পারে না। যখন বিশিষ্ট কারণে লজ্জাশীলতা ও জুগুপ্সা উড়িয়া যায় তখনই যুগপৎ একাধিক পুরুষকে কেবল ক্ষণিক শারীরিক উত্তেজনায় বিজনে ও গোপনে সঙ্গী করা সম্ভব হয়। Companionate Marriage এর জজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে তিনি এমন কয়েকজন নারীকে দেখিয়াছেন যাহারা স্বামী থাকিতে অন্য প্রেমিকের সঙ্গ ভোগ করে অথচ স্বামীর প্রতি ভালবাসা বজায় রাখে, আর তাহাদের সকল গোপন প্রেমের কথা বিনা লজ্জায় তাঁহার মত অপরিচিতের কাছে খুলিয়া বলিতে পারে। নৃতত্ত্ব না

আমায় জজ মহাশয়ের পরীক্ষা হইয়াছে সম্পূর্ণ দোষদুষ্ট। জোর করিয়া বলিতে পারা যায় যে ঐ লজ্জাপরিহৃতা নারীরা ঠিক সেই শ্রেণীর মনের ভাব পাইয়াছে যাহা বেশ্যারা পায়। যাহারা কেবল শরীরের প্রবল উত্তেজনার চঞ্চলতায় ও নির্লজ্জতায় নারীকে খোঁজে তাহারা প্রেমের আকর্ষণে সেই মধুরতা পাইয়া প্রেমকে গভীর ও স্থায়ী করিতে পারেনা, যে মধুরতা জন্মে ব্রীড়া ও জুগুপ্সা দেখিয়া। তাহারা উদ্‌ভ্রান্ত, যাহারা ভাবে যে, নারীর ব্রীড়া ও জুগুপ্সা জন্মে তাহাদের সমাজের নিপীড়িত অবস্থা হইতে অর্থাৎ নারীরা পুরুষের দাসী—এই বুদ্ধিতে। ঐ ব্রীড়া প্রভৃতি নীচতাব্যঞ্জক ও নেকামি মনে করিয়া যাহারা উহা তাড়াইয়া সকল কথার স্পষ্টবাদিনী লজ্জাহীনা নারী সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিবে, তাহারা সৃষ্টি করিবে রাক্ষসী ও যাহা চরিত্রের মূল ও সমাজস্থিতির মূল তাহা ধ্বংস করিতে বসিবে। একটা উক্তি আছে যে যখন কোন ব্যক্তি সারা পৃথিবীকে বিশ্বাসের পাত্র করিতে পারে (can take into confidence) তখন নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে তাহার পক্ষে একজন যথার্থ বন্ধু পাওয়া অসম্ভব, আর তাহার জীবনে সংযত গাম্ভীর্য্য (seriousness) কিছুমাত্র নাই। প্রকৃতি যাহার সাধন করিতে ডাকিতেছে গোপনে তাহাকে যাহারা বাজারের সামগ্রি (vulgar) করিতে পারে আর প্রকৃতি যাহার প্রথম বিকাশের জন্য একজনমাত্র পাত্র-পাত্রীকে কাছাকাছি আসিতে বলে, তাহার সাধনা যদি প্রকৃতির নির্দেশকে অমান্য করিয়া করা হয় তবে ক্ষয়ের পথ হইবে প্রশস্ত।

দ্রষ্টব্য—অপ্রাকৃতিক উপায়ে সন্তান-জনন বন্ধ করা বিষয়ে অল্প-কিঞ্চিৎ যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা আলোচিত হইল না, কারণ সে বিষয়ে দীর্ঘভাবে আলাদা কিছু না লিখিলে চলে না।

ভারত তবু কই

হেমচন্দ্রের ভেরীতে যেদিন বাজিয়াছিল—

সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়,

সেদিন ব্রহ্মদেশ ছিল স্বাধীন, জাপান ছিল অসভ্য নামে পরিচিত। সেদিনের পর পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল কাটিয়া গেল, নানা বিপ্লবে ও প্রলয়ে পৃথিবীতে বহুজাতির ভাগ্য নূতনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল, কিন্তু ভারতের অবস্থা তেমন পরিবর্তিত হইল না। একালের জগদ্বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথের মধুর বংশীধ্বনিতে আবার সেই করুণ গীতি অধিকতর মধুর স্বরে বাজিয়াছে। জাগ্রত ভগবানের আহ্বানে পৃথিবীর সকল জাতির লোক জয়ের উল্লাসে ও উৎসাহে ভগবানের আসন ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু বিশ্বের সেই দরবারে ভারত নাই; কেন নাই, তাহা বুঝিতে পারিব ভারতের একটুখানি পরিচয় নেওয়ার পর।

সারা ভারতবর্ষের অধিবাসীকে একটা জাতিসঙ্ঘরূপে আমরা মর্মে-মর্মে অনুভব করিবার চেতনা পাইয়াছি কি-না,—কবিদের গীতি-ধ্বনির আহ্বান সেই বিপুল জাতিসঙ্ঘের কানে পৌঁছাইবার মত মন্ত্রে উচ্চারিত কি-না,—তাহার বিচারের প্রয়োজন আছে। দেশ সম্বন্ধে ও দেশের জাতিসঙ্ঘ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিরূপ, দেশের জাগরণ বা উন্নতি সাধনের নামে আমাদের চেষ্টা কতদূর প্রসারিত, কবিদের গানে তাহার কতক আভাস পাইব। কবি হেমচন্দ্র সারা ভারতের বিশ কোটি

লোকের নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভেরী বাজাইয়াছিলেন তাহাদেরই উদ্দেশে—যাহাদের উদ্ভব আর্য্যের বংশে, অথবা যাহারা আর্য্যসভ্যতা-শাসিত সমাজে বাস করে; যাহারা একদিন 'আর্য্যাবর্ত্ত ভূমে' 'দিক অন্ধকার করি তেজোধূমে' আসিয়াছিল, তাহাদের নিশ্চেষ্ট বংশধরদিগকেই চেতনা দিবার জন্য পূর্বস্মৃতি জাগাইয়া ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন—'আর্য্যাবর্ত্ত জয়ী পুরুষ যাহারা, সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?' তখনকার বিশ কোটি ও এখনকার গণনার ত্রিশ কোটি যে সকলেই আর্য্যবংশোদ্ভব নয়, আর্য্য-সভ্যতায় শাসিত নয়, আর্য্যের ঐতিহ্যের পূজক নয়—আর্য্য-গৌরবের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত নয়, তাহা এই দেশ সম্বন্ধে গভীর অনভিজ্ঞতায় কবি ভাবিতে পারেন নাই। এদেশে সাত কোটি মুসলমান আছে যাহারা উৎপত্তিতে যাহাই হোক, তিল-মাত্রেও ভারতের প্রাচীন গৌরবের ঐতিহ্য পোষণ করে না—তাহাদের কথা আমরা ভুলিয়া যাই; আমরা ভুলিয়া যাই সেই ছয় কোটি অধিবাসীকে—যাহারা অনার্য্য সমাজ হইতে স্থানচ্যুত হইয়া নীচ অস্পৃশ্য জাতিরূপে কোনপ্রকারে আর্য্যসভ্যতায় শাসিত সমাজের তলায় মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে,—ভুলিয়া যাই প্রায় চার কোটি অনার্য্য অধিবাসীদিগকে, যাহারা প্রায় দূরসম্পর্কেও ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজের সঙ্গে সংসৃষ্ট নয়। মুসলমান ও বিদেশের অধিবাসী বাদ দিয়া এখন যে বিশ কোটি অধিবাসী পাই, তাহাদের মধ্যে দশ কোটি লোক যে, আর্য্যকীর্তির গৌরবের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইতে পারে না তাহা অতি সুস্পষ্ট; বাকি দশ কোটির মধ্যে আর্য্য-গৌরবের দাবি করিতে অনধিকারীর সংখ্যা যে কত, তাহার সংখ্যা নির্ণয় না করিয়াই বলিতে পারি যে যাহারা মাথা তুলিয়া বুক ফুলাইয়া ভারতের প্রাচীন কীর্তির গৌরবের কথা বলিতে পারে, তাহারা সমগ্র অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যায়

অতি অল্প। প্রাচীন স্মৃতির উদ্দীপনা দিয়া কবি হেমচন্দ্র যাহাদিগকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন, আমাদের বিশ্ববিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ 'ভারত তবু কই' বলিয়া কেবল তাহাদিগকে খুঁজিয়াছেন, বলিতে পারি না; রবীন্দ্রনাথ যখন সেই ভারতবাসীদের দিকে তাকাইয়াছেন—যাহারা 'গত-গৌরব হৃত-আসন নত-মস্তক লাজে', তখন এদেশের মুসলমানেরা সম্পূর্ণরূপে সেই জাতিসঙ্ঘে পড়ে। তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সকল সামাজিক বিধির ও রাষ্ট্রীয় বিধির নেতার দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য জাগ্রত ভগবান্‌কে ডাকিয়াছেন; কিন্তু হেমচন্দ্র দেব-চিন্তা পরিহার করাইয়া কেবল যুদ্ধের অস্ত্রে সকলকে সজ্জিত হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র জাতিভেদ ভুলিতে বলিয়াছিলেন আর প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্ব-বিধানের মূলমন্ত্র উচ্চারণ করেন নাই। এ প্রবন্ধে জাগ্রত ভগবানের দিকে তাকাইবার কথা বিচারিত হইবে না বটে, তবুও উহার উল্লেখ করিলাম। বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি এই অবস্থাটি যে যাহারা আর্য্যেতর ও যাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক, তাহাদের কানে পৌঁছিবার মত বাণী হেমচন্দ্রে ছিল না, আর বিশ্বকবির মন্ত্রেও আছে বলিয়া মনে করিতে পারি না; কেন-না, আর্য্যের ঐতিহ্যের গৌরব বা প্রাচীন সৌভাগ্যের স্মৃতি যাহারা বিন্দুমাত্রেও পোষণ করে না, সংখ্যায় তাহারা অত্যধিক।

আমরা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই ভুলিয়া যাই যে আমাদের আর্য্যগৌরবে পরিপুষ্ট দেহের সঙ্গে আর্য্যেতর শরীর কিরূপ অচ্ছেদ্য ভাবে বাঁধা,—আমরা ভুলিয়া যাই যে, বিপুল আর্য্যেতর সঙ্ঘ না জাগিলে আমাদের ক্ষুদ্র শরীর চেতনা লাভ করিতে পারিবে না ও কর্মক্ষম হইতে পারিবে না। তাই আমাদের অনেক জাতীয় সঙ্গীত সারা ভারতের জাগরণের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইতে পারে না।

সারা ভারতের জাতিসঙ্ঘের কথা ছাড়িয়া যদি বঙ্গদেশের কাছে কেবল বঙ্গের অধিবাসীদের বিচিত্রতার পরিচয় দেওয়া যায়, তাহা হইলেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে আমরা কতখানি সীমাবদ্ধ দেশটিতে ও সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে জাতীয় জাগরণের জন্য চেষ্টা করি ও মন্ত্র রচনা করিয়া থাকি। বঙ্গের প্রায় পাঁচ কোটি অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা আড়াই কোটি, আর বাকি আড়াই কোটি অ-মুসলমানদের মধ্যে আর্য্যদের প্রাচীন কীর্তির গৌরবের ইতিহাসে যাঁহারা উদ্দীপনা পাইতে পারেন তাঁহাদের সংখ্যা অনেক টানিয়া-বুনিয়াও এক কোটি করা সম্ভবপর হয় না; অথচ অধিকাংশ স্থলেই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয় সারা বঙ্গের উন্নতি ও জাগরণের জন্য। যেসকল জাতির লোকের মনে সুস্পষ্ট ধারণা আছে—তাহারা আর্য্যবংশের কেহ নয়,—ব্রাহ্মণপ্রমুখেরা যাহাদের উৎপত্তি অতি নীচ বংশে বলিয়া প্রচার করেন, সেই সকল হাড়ি, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতির গণনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল যদি জল-চল জাতির লোকের সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লোকের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়, তবে দেখিতে পাই যে, খাঁটি হিন্দু নামে পরিচিতদের সংখ্যা আশী লক্ষের অধিক হয় না। ব্রাহ্মণদের সমাজে জল-চল না হইলেও এই গণনায় সুবর্ণ বণিক প্রভৃতিকে ধরা হইয়াছে, কেন-না, তাহারা আর্য্যসভ্যতায় পুষ্ট আর শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থায় উন্নত। যদি তর্কের খাতিরে ধরা যায় যে যাহারাই এদেশে হিন্দু নামে পরিচিত আছে, তাহাদের সকল শ্রেণীর লোককেই প্রাচীন আর্য্যবংশ-প্রবর্তকদের গৌরবের ইতিহাস শোনাইয়া জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারিব, তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে পাঁচ কোটির মধ্যে তিন কোটি লোকের প্রাণ আমাদের জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইবে না।

আর্য্যবংশের গৌরব স্মরণ করিবার পথে সর্বসাধারণের পক্ষে আর একটি বড় বাধা আছে। ব্রাহ্মণ-প্রমুখ দুই-তিনটি জাতির লোক হয়ত এই ধারণা পোষণ করিয়া গৌরব করিতে পারেন যে তাঁহাদের উৎপত্তি হয় বেদকর্তা ঋষিদের বংশে, না-হয় রামচন্দ্র-কৃষ্ণ-বুদ্ধ প্রভৃতিদের বংশে; কিন্তু বাদবাকি যাহারা রহিল সংখ্যায় অধিক পুরু, তাহাদের বংশকর্তা নামে কাহাকে খাড়া করিলে তাহারা তুষ্ট হইবে? আমরা আত্মদম্ভে যাহাদিগকে নীচ বলিয়া গণনা করি তাহাদের পূর্বপুরুষের নামে যদি পৌরাণিক কীর্তিতে গৌরবান্বিত হনুমান, বিভীষণ বা গুহক চণ্ডালকে খাড়া করি, তবে তাহারা সেই-সেই মহাপুরুষদের রক্তের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া দাঁড়াইবে কি? উদ্ভবের ইতিহাসের মাটি খুঁড়িতে গেলে কাহার কপালে যে কোন্ জীব বাহির হইবে তাহার স্থিরতা নাই। সেকথা ছাড়িয়া দিয়াও বলিতে পারি যে, কর্তব্যের উপাসনায় ও মনুষ্যত্ব বিকাশের চেষ্টায় প্রাচীন বংশ-গৌরব মানুষের পক্ষে বড় বিশেষ সহায় হয় না। হনুমানের বংশধর বলিয়া গর্ব করিলেই কেহ গন্ধমাদন তুলিতে পারিবে না,—একমণ ওজনের একখানা পাথরও তুলিতে পারিবে না।

কুলজীর ইতিহাস সত্য হইতে পারে, মিথ্যা হইতেও পারে—যে অমুক ব্যক্তি প্রাচীনকালেব অমুকের বংশধর; কিন্তু কাহারও উৎপত্তির ইতিহাসে বিন্দুমাত্র ভুল থাকিতে পারেনা যে তাহার উৎপত্তি সেই অনাদির নির্দিষ্ট বিধানে, যাহার ফলে সমাজের উচ্চতম হইতে নীচতমের উৎপত্তি। জন্মগত কৌলীন্য যে সকলের পক্ষেই এক, জীবন-ধারণের অধিকার যে সকলের পক্ষেই সমান, আত্ম-ক্ষমতায় অবাধ উন্নতিলাভের পথে যে সকলের দাবি সমান, কেহ যে কোনপ্রকার আভিজাত্যের ওজুহাতে অন্যকে তাহার গোলাম করিতে অধিকারী নয়, অথবা ঘৃণ্য

জীব মনে করিয়া অন্যকে উপেক্ষা করিবার অধিকারী নয়—এই অতি সহজ সরল সত্য জাতিনির্বিশেষে সকলের মনে জাগাইয়া তোলা অতি সোজা; অথচ আমরা অনেকে এই সোজা পথ ছাড়িয়া কল্পিত ইতিহাসের প্রশ্রয় দিয়া মিথ্যা গৌরবের নামে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই বর্ণিত সঙ্কীর্ণতা নাই, কিন্তু তাঁহার উক্ত সঙ্গীতে তাঁহার বিশ্ব-প্রসারিত মনের ভাব তেমন প্রতিফলিত হয় নাই। মানুষ যদি অসার ও অননুভূত 'হিং-টিং-ছট্'-এর কুয়াশা কাটাইয়া দাঁড়ায়, আর যাহা প্রাণে-প্রাণে অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে সেই সত্য অনুভব করিয়া আপনার মনুষ্যত্ব বাড়াইবার জন্য মাথা তোলে, তবে কর্মের পথ—স্বাধীনতার পথ—উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইতে পারে।

বড় দুঃখ হয় যে এদেশে অনেক জাতি বা সম্প্রদায়ের লোক আপনাদের জাতির বা সম্প্রদায়ের উন্নতির নামে এইরূপ উদ্যোগ করিয়া থাকে যে অমুক-অমুক জাতির লোকের পক্ষে উচিত যে তাহাদের জল বা অন্ন গ্রহণ করুক অথবা তাহাদের ধর্মমন্দিরে প্রবেশের অধিকার দিক্। এ উদ্যোগে যে, গোলামি বুদ্ধির পরিহার দেখা যায় না, বরং হীন দাসত্বকে আঁকড়াইয়া ধরাই সূচিত হয়, ইহা বহুদিনের দাসত্বের ফলে লোকে বুঝিতে পারে না। অমুক আমার হাতের জল যদি না ছুঁইতে চায়, নাই-ই ছুঁইল; আমি তাহার কাছে মাথা নীচু করিয়া গোলাম নামে স্বীকৃত হইবার উদ্যোগ করিব কেন? Man's a man for a' that—আমি মানুষ, আমি আপনার অধিকারে অধিকারী, এই কথা বলিয়া সে মাথা উঁচু করে না কেন? যে সম্প্রদায়কে নীচ বলিয়া তুচ্ছ করিয়া ও দূরে রাখিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লোকেরা আপনাদের দেব-মন্দির গড়িয়াছেন, সে মন্দিরে ঢুকিবার জন্য নীচ বলিয়া চিহ্নিত সম্প্রদায়ের মরণ-কামড় ও গোলামি-পণ কেন? গুজরাটের আমদানি

সত্যাগ্রহ অবলম্বনে কোলাহল না বাধাইয়া আত্ম-মর্য্যাদার বুদ্ধিতে কি মানুষ নিজের মন্দির নিজে গড়িতে পারে না ?—বলিতে পারেনা কি যে, তুচ্ছ করি তাহার আভিজাত্যের গৌরবকে যে, তাহাকে নীচ বলিয়া গণনা করে ? মনুষ্যত্বের বুদ্ধি না জাগাইয়া উল্টা পথে চলাতেই সমাজ-ক্ষয়কর কোলাহলের সৃষ্টি হইতেছে। নিপীড়িত নামে অভিহিত কোন-কোন জাতির লোকে এতই উল্টা বুদ্ধিতে আত্ম-সম্মান হারাইয়া আপনাদের উন্নতি চাহিতেছে যে তাহারা একদিকে ত পরের গোলামিতে ধন্য হইতে চায়, আবার অপর দিকে শ্রমের মাহাত্ম্য ও গৌরব ভুলিয়া ভদ্র-জাতি সাজিবার নামে আত্ম-ক্ষয়কর আলস্য লাভকেই উন্নতি মনে করিতেছে।

সমাজতত্ত্ববিদের কাছে প্রাচীন কালের সকল ইতিহাসের প্রয়োজন আছে। কিরূপ অবস্থায় প্রাচীনকালে কি জ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল, প্রাচীনের কি নীতিতে সমাজ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, আবার অন্যদিকে প্রাচীনকালের কি দোষে ভারতের প্রাচীন গৌরবের সৌধ অটুট রহিতে পারিল না, তাহা সমাজতত্ত্বজ্ঞেরা যত্ন করিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন ও দেশের লোককে শিখাইবেন। কিন্তু প্রাচীনকালের গৌরবের নামে খানিকটা রক্ত গরম করিলে অথবা আলস্যের শয্যায় শুইয়া উৎফুল্ল হইলে কর্তব্য সাধনের ক্ষমতা বাড়ে না। পূর্বপুরুষেরা মহৎ ছিলেন বা ছিলেন না, ইহার কোন কথাতেই নিজের অক্ষমতা বা ক্ষমতা বাড়িতে পারেনা বা কমিতে পারে না। যদিও প্রাচীনকালে কিছু ছিলনা, তবুও আমি তাহা চাই,—কেন-না আমি তাহা চাই মনুষ্যত্বের দাবিতে,—প্রাচীনকালের নজিরে নয়। ধ্রুবের মত বলিতে হইবে—ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম। এই বুদ্ধি জাগাইবার জন্য জাতীয় সঙ্গীত রচিত হোক্।

অন্ত আর একটি দিক্ দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব—ভারত তবু কই। ভারত-সমাজে যে-শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জ্ঞানের অধিকার লুপ্ত হয় নাই—সামাজিক সুবিধায় যাঁহারা শিক্ষালাভে ও পদগৌরব-লাভে বঞ্চিত ন'ন্ সেই শ্রেণীর লোকেরা একালের জগতের স্বাধীন জাতির সঙ্ঘে অচিহ্নিত ও অপরিচিত ন'ন্। কাব্য-রচনার প্রতিভায়, জ্ঞানের আলোচনার মহিমায়, রাষ্ট্রীয় কর্মকুশলতায় ও অন্যবিধ দক্ষতায় এই শ্রেণীর অনেক ব্যক্তি পৃথিবীতে যশস্বী হইতেছেন, আর ইউরোপে, আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ায় সসম্মানে আদৃত হইতেছেন ও আমাদের এইদেশে সরকারি চাকৃরিতে ও নানা অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ইঁহাদের কৃতিত্ব উজ্জ্বল হইতেছে; তাহা হইলেই দেখিতে পাইতেছি যে হেমচন্দ্র মুখ্যভাবে যাহাদিগকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন ও যাহাদের কথা বিশেষভাবে মনে রাখিয়া কবিসম্রাট ভারতকে খুঁজিয়াছেন, তাহারা সম্পূর্ণরূপে 'জনগণ-পশ্চাতে' নাই। তবে ইহা স্বীকৃত যে ইঁহারা পরাধীন ও বহুবিষয়েই পরমুখাপেক্ষী, আর সেই কারণে যথার্থই ইঁহারা 'নত-মস্তক লাজে।' এই অবস্থার কারণ অতি সহজেই ধরা যায়। যাহাদের কাছে উন্নতিলাভ করা সহজসাধ্য, ক্ষমতার দণ্ড হাতে নেওয়া দুরূহ নয়, তাহাদের সর্বশরীরকে টানিয়া ধরিয়া নীচু করিয়া রাখিয়াছে একটা বিস্তৃত জাতি-সঙ্ঘ, যাহাদের কথা আমরা আমাদের উন্নতির বিচারের বেলায় স্মরণ করি না। যে জন-সঙ্ঘের অটল বোঝা আমাদের গলায় ঝুলিতেছে আর যে বোঝার ফলে আমরা মাথা নীচু করিয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছি, সে বোঝার দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। কোল-সাঁওতাল. কন্দ-গণ্ড, পঞ্চম নামে চিহ্নিত দক্ষিণ প্রদেশের লোকেরা আমাদের রাষ্ট্রীয় শরীরের অচ্ছেদ্য অংশ। ইহাদের মধ্যে আর্য্যের ঐতিহ্যের মহিমা বা হিন্দু-পুরাণের

ভক্তি-উদ্রেককারী চিত্র কিছুতেই প্রাণস্পর্শী হইতে পারে না ; আমরা একেবারে তাহাদের কথা ভুলিয়া—দেশের অধিকাংশ লোকের কথা ভুলিয়া, প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিতে জাতীয় সঙ্গীত বা জাগরণের মন্ত্র রচনা করিতেছি,—মানুষের মনে মনুষ্যত্ব-বোধের চেতনা জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছি না ও মানুষকে জাগ্রত ভগবানের দিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছি না। এখানে পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে তাঁহারা যেন রবীন্দ্রনাথের গানের একটি ছত্রের আলোচনায় মনে না করেন যে তিনি অতি অল্পপরিমাণেও আমার বর্ণিত উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তিলমাত্রেও উদাসীন। যদিও তাঁহার গানে তাহাদেরই কথা আছে যাহারা 'নত-মস্তক লাজে', তবুও তাঁহার গানটি মনুষ্যত্ব জাগাইবার মন্ত্র বটে। তাঁহার আর একটি অতি উপাদেয় গানের কথা পরে বলিতেছি।

সমাজের নিম্নস্তরে যে জনসাধারণের কথা বলিয়াছি—যাহাদিগকে আমাদের গলায় বাঁধা বোঝা বলিয়া উপমার খাতিরে বলিয়াছি, তাহারা যে, সুযোগ ও সুবিধা পাইলে পূর্ণ উন্নতিলাভ করিয়া আমাদের বোঝা না হইয়া সহায় হইতে পারে, এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব না। যাঁহারা মনে করেন যে ঐ শ্রেণীর লোকসমূহ যদি যেখানেই আছে সেখানেই থাকে, তবুও স্বরাজ-লাভে বাধা হয় না, তাঁহাদের মনের ভাবকে অতি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিব। কেহ-কেহ বলিতে পারেন যে এই ভারতবর্ষ বিদেশীয়দের অধিকারে আসিবার পূর্বে যখন উচ্চশ্রেণীর রাজা প্রভৃতিদের পক্ষে বিনা বিঘ্নে স্বাধীন রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হইয়াছিল, তখন এইসময়ে উন্নত-রা নিজেদের হাতে স্বরাজ্য পাইলে নির্বিঘ্নে দেশ-শাসন করিতে পারিবেন না কেন। ইহার একটি উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত। বিদেশীয়েরা যখন ত্রয়োদশ

শতাব্দীতে অধিকার বিস্তার করে, তখন ঐ সংখ্যায় বহুল জাতি-সঙ্ঘ দেশরক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে নাই ও দেশরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে নাই বলিয়াই বিদেশীয়দের পক্ষে এদেশ অধিকার করা কঠিন হয় নাই। স্বদেশ বলিয়া সারা দেশকে ভাবিবার বুদ্ধি তখনও ছিল না—এখনও নাই।

দ্বিতীয় উত্তরটি অধিকতর প্রয়োজনের। আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষেরা বিরোধী অনার্য্যদের বিরুদ্ধে অল্প-বিস্তর যুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে উচ্ছন্ন করিয়া সমগ্র দেশকে আর্য্য-জাতির দেশ করিবার বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না। বহুবিস্তৃত ভারতে আর্য্যেতরেরা নির্বিঘ্নে আপনাদের রাজ্যের সীমায় বাস করিয়া আপনাদের মত উন্নতি লাভ করিতে বাধা পায় নাই; তাই এখন তাহারা অত্যধিক সংখ্যায় ভারতে রহিয়াছে। যে বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির প্রভাবে ইউরোপীয়েরা আমেরিকা প্রভৃতি উপনিবেশগুলিকে পূর্ণ মাত্রায় ইউরোপীয়দের দেশ করিয়াছেন ও টাস্মেনিয়া প্রভৃতি স্থানের আদিম অধিবাসীরা যে-প্রভাবে একেবারে ঝাড়ে বংশে নির্মূল হইয়াছে, ভারতের উচ্চজাতীয়দের মধ্যে সে বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির প্রভাব কখনও জাগে নাই। এইজন্য এখন ইংরেজের একচ্ছত্র রাজত্বের দিনে আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের গলার বোঝা হইয়াছে। পূর্বপুরুষেরা যে এই বোঝা ধ্বংস করেন নাই তাহার জন্য আমরা লজ্জিত বা দুঃখিত নই, বরং অসীম গৌরব অনুভব করি। এখন এই পরিবর্তিত সময়ে আমাদের অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য জাগিয়াছে যে, এই বোঝাকে আমরা আমাদের সহায় করিয়া তুলিব—সম্পদ করিয়া তুলিব।

আমরা প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর নিজেদের সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ আর সেই গণ্ডির ভিতরকার লোকের মনের ভাবের সহিত

পরিচিত, তাই স্বাভাবিকভাবে আমাদের চিন্তায় ও কাব্যের কল্পনায় সম্প্রদায়বিশেষের মনের ভাবই স্ফূর্তি পায়। আমরা অনভিজ্ঞতায় ও আত্মম্ভরিতায় মনে করি যে আমাদের সুমধুর ভাবের উচ্ছ্বাসে সারা জাতির লোকের প্রাণে ভাবের বন্যা বহিবে। বিশ্বপ্রেমের বাণী আমাদের প্রাণের ভাষা নয়—উহা আমাদের মুখে তোতাপাখীর পড়া বুলি। প্রাণে-প্রাণে অনুভব করি না যে, সারা ভারতের জন-সঙ্ঘ আমাদের শরীরে ও প্রাণে অচ্ছেদ্যভাবে গাঁথা আছে; তাই কষ্ট-কল্পনা করিয়া সারা জাতির কল্যাণের নামে কিছু বলিতে বা রচনা করিতে গেলে আমাদের উক্তি সতেজ ও সরস হয় না,—প্রাণস্পর্শী উদাস বাণী হয় না। আমরা যে বহুবিধ ধর্মমতের প্রভেদে ও সামাজিক রীতি ও ঐতিহ্যের প্রভেদে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, আর সেইরকম সম্প্রদায়ের সকল মতবাদ ও সস্নেহে পোষিত মনের ভাব যে আমাদিগকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। আমরা যদি আত্ম-শরীরের প্রকৃতি বুঝিতে ভুল না করিতাম, তবে আমাদের কল্পনা ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পড়িয়া সঙ্কীর্ণ হইত না—আমাদের দশ-প্রহরণ-ধারিণী দুর্গার মনোহর কল্পনা সারা জাতি-সঙ্ঘের কাছে মনোহর বলিয়া আদৃত হইবে মনে করিতাম না,—আমাদের জাতীয় সঙ্গীত অন্যরূপ ধারণ করিত।

হিতৈষী কবিরা বলিতে পারেন যে তাঁহারা সারা দেশকে মাতৃরূপে পূজা করিবার জন্য জনসঙ্ঘের কল্পনাকে জাগাইতেছেন, আর সেইরূপ কল্পনা করিবার পক্ষে কোন সম্প্রদায়ের দেশ-ভক্তের আপত্তি থাকিতে পারে না। এই উক্তির বিস্তৃত সমালোচনা না করিয়া এইটুকু দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে যে ঐরূপ কল্পনাকে আশ্রয় করিলেই মনে সেইরূপ স্থায়ী উৎসাহ ও আগ্রহ জন্মে না, যাহার প্ররোচনায় মানুষে

আপনার উন্নতির জন্য কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে পারে, অথবা দেশের অন্য দশজনকে যথার্থই আপনার উন্নতির সহায় মনে করিয়া তাহার সঙ্গে মিলিতে পারে। এই মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন নাই যে, খানিকটা মনের উত্তেজনা বাড়াইয়া আস্ত মাটির দেশটিকে মা বলিয়া ডাকিলেই দেশের প্রতি মাতৃস্নেহ জন্মিবে। এই সারা দেশ কেন প্রত্যেক মানুষের আপনার—সে জ্ঞান না জন্মিলে সারা দেশের দিকে কিছুতেই দৃষ্টি পড়িতে পারে না ; আর যদি যথার্থ স্বার্থ-জ্ঞানের সুবুদ্ধিতে সে আকর্ষণ জাগে, তবে মা বলিয়া ডাকিয়া সে আকর্ষণকে গভীর করার প্রয়োজন হয় না। খাঁটি স্বার্থবোধ না জন্মিলে কল্পনার কৃত্রিমতায় ও ভাবের ক্ষণিক উত্তেজনায় মনে-প্রাণে স্থায়ী সঙ্কল্প জাগাইতে পারা যায় না।

তাহা ছাড়া আর একটি কথা আছে, যাহা খুব বড়। লোকের মনে স্বদেশপ্রেম জন্মাইবার জন্য আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের লেখকেরা এই দেশকে সকল দেশ অপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করেন। এই ভারতের শিয়রের দিকে তাহার মাথার উপরে হিমালয়ের চূড়ার মুকুট আছে ও সেই মুকুট মণি-মুক্তার ঝলক দিয়া ঝলমল করিতেছে, দেশের পা-দুখানি দক্ষিণের সাগর চুম্বন করিতেছে, অথবা এদেশটি সুজলা, সুফলা ও শস্য-শ্যামলা, অথবা আমাদের ধানের ক্ষেতের উপর দিয়া বাতাসে যে ঢেউ খেলিয়া যায় তাহা অতি অপূর্ব, ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রথম কথা এই—পৃথিবীতে কি অন্য সুন্দর বা সুন্দরতর দেশ নাই ? উর্বরা ভূমি কি ভারতের একচেটিয়া ? আর অন্য কোন দেশের শস্যের ক্ষেতের উপরে কি বাতাসে ঢেউ খেলে না ? কতকগুলি কোমলকান্ত পদাবলীর আবরণে কি সত্যকে ঢাকা যায় ? প্রীতি ও স্নেহ বাড়াইবার উপায় কি এই যে, প্রীতি ও স্নেহের পাত্র শরীরের সৌন্দর্য্যে অন্য অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবায়? যে কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্যের খাতিরে স্ত্রীকে ভালবাসে, তাহার মনে কি প্রীতির আকর্ষণ আছে? অন্য দশটি নারীকে নিজের স্ত্রী অপেক্ষা সুন্দরী দেখিলে বা তাহারা নিজের স্ত্রী অপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া স্বীকৃত হইলে যদি নিজের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা উপিয়া যায় তবে দাম্পত্য প্রেম মিথ্যা কথায় দাঁড়ায়। তুমি যে তোমার ছেলে-মেয়েকে ভালবাস, সে কি এই মনে করিয়া যে তাহারা অপরের ছেলে-মেয়ের চেয়ে বেশি সুন্দর? পরের সুন্দর ছেলে দেখিয়া তোমার চোখ জুড়ায়, কিন্তু তবুও তুমি নিজের অপেক্ষাকৃত অসুন্দর অথবা কুৎসিৎ সন্তানকেই সর্বাধিক স্নেহে পালন কর। সৌন্দর্য্যের খাতিরে ভালবাসিতে হয়, এই শিক্ষাই কুশিক্ষা ও পাপ সৃষ্টির শিক্ষা। সুন্দর হোক্, অসুন্দর হোক্, উর্বরা হোক্, মরুভূমি হোক্, যে-দেশ আমার—সে আমার,—সে দেশের প্রতি মায়া আমার সর্বাধিক। তোমার আমার জন্মমাত্রেই অধিকার যে আমরা অবাধে সকল অত্যাচারীর অত্যাচারকে পরাভূত করিয়া নিজের মনুষ্যত্বকে বাড়াইব, নিজের অধিকারকে রক্ষা করিব,—নিজের দেশকে করায়ত্ত রাখিব। যেদিক দিয়া জাগাইলেই মনের ভাবকে জাগাইতে পারা যায় সেইদিক দিয়াই এইভাবকে জাগাইতে হইবে। আমরা অবিশ্রান্ত আধ্যাত্মিকতার কথার বড়াই করি, আর এই প্রাণ জাগাইবার মন্ত্রের বেলায় যাহা আত্মার আকর্ষণের বস্তু—যাহা স্থায়ী প্রেমের ভিত্তি, তাহাকে উপেক্ষা করিতেছি। জাতীয় সঙ্গীতের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের একটি গানের উদাহরণ দিব। ইংলণ্ড দ্বীপের লোককে ইউরোপ মহাদেশের একজন বিজয়ী বীর এই বলিয়া তুচ্ছ করিয়াছিলেন যে তিনি অনায়াসে উহাকে পরাভূত করিতে পারেন অথবা সাগরের প্রাচীর বা পরিখার মধ্যে উহাকে শুকাইয়া বা ভিজাইয়া

মারিতে পারেন। ইংরেজ কবিরা তখন দ্বীপটির শোভার বর্ণনায় হিতৈষণা জাগান্ নাই, খাদ্যের জন্য অন্যান্য দেশ হইতে পদার্থ সংগ্রহের চেষ্টা ভুলিয়া দেশকে সুজলা, সুফলা শস্য-শ্যামলা ভাবেন নাই; তাঁহারা ক্ষমতা ও মনুষ্যত্বের দিক দিয়া প্রেরণা পাইয়া লিখিয়াছিলেন যে তাঁহারা সাগরকে শাসন করিতে পারেন ও আপনাদের মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া গোলামিকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কবিতায় আছে—Rule Britannia, rule the waves, Britons never shall be slaves. একবার ইংলণ্ডের প্রভাবশালী ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা একদল লোকের ধর্মবুদ্ধিকে দাবাইতে চাহিয়াছিলেন; তখন সেই ক্ষুদ্র দলের লোকেরা নিজেদের ধর্মবুদ্ধির প্রেরণায় আপনাদের মনুষ্যত্বকে বাঁচাইবার জন্য দেশের মাটিকে তুচ্ছ করিয়া নূতন আমেরিকা দেশ সৃষ্টি করিয়াছিল। মনুষ্যত্ব আগে ও দেশের মাটি তাহার পরে; ঘরের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ঘরের সৃষ্টি। আমরা এদেশে পরাধীন; অন্য কোন দেশে গিয়া নিজেদের নূতন দেশ গড়িবার ক্ষমতা ও সুবিধা আমাদের নাই। এই দেশে থাকিয়াই—এই পূর্বপুরুষের ভিটায়, আমাদের অধিকার বজায় রাখিয়া মনুষ্যত্বকে বাড়াইয়া ধন্য হইতে হইবে। ভারতের সকল জাতি না জাগিলে ও প্রাণে-প্রাণে গাঁথা না পড়িলে আমাদের আত্ম-রক্ষা অসম্ভব। এই খাঁটি স্বার্থের কথা যে-শিক্ষায় সকলে মর্মে-মর্মে অনুভব করিতে পারে, যে-শিক্ষায় মনুষ্যত্বের আদর বাড়িতে পারে—যে-শিক্ষায় লোকে শিখিতে পারে যে, অত্যাচারী স্বদেশী হোক্ বা বিদেশী হোক্—কাহারও অধিকার নাই যে—কাহারও মনুষ্যত্বকে চাপিয়া রাখিবে বা রাষ্ট্রের নামে বা ধর্মের নামে কাহাকেও কোন প্রভাবশালী ধনীর বা পুরোহিত-শ্রেণীর গোলাম করিতে পারিবে, সেই শিক্ষার উদ্যোগ না করিলে সকল স্বরাজ-লাভের উদ্যোগ ফুৎকারে

উড়িয়া যাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন মনুষ্য. প্রত্যেক ব্যক্তির ভগবদ্দত্ত এই অধিকার আছে যে সে তাহার মনুষ্যত্বকে অক্ষুণ্ণভাবে বাড়াইতে পারিবে। যদি এই মন্ত্র অতি অল্প-পরিমাণেও মানুষের প্রাণকে অধিকার করে তবে ধীরে-ধীরে মানুষের নিজের উন্নতি, দেশের উন্নতি ও স্বরাজ্যলাভ সুলভ হইতে পারে।

এ প্রবন্ধে যদিও আলোচনা করি নাই, তবুও অন্যান্য প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা ধরিয়া বলিতে পারি যে—জাগ্রত ভগবান্‌কে না পাইলে আমরা জাতিনির্বিশেষে ভগবদ্দত্ত অধিকার পাইব না—সকলে একসঙ্গে মিলিয়া মনুষ্যত্বের দাবি হাসিল করিতে পারিব না।

এই সঙ্গে স্মরণ করাই বিশ্বকবির সেই গানটি যাহাতে তিনি এই মন্ত্রের সাধনা চাহিয়াছেন—যদি তোর ডাক শুনে' কেউ নাই আসে, একলা চল রে। হয় ভোটের লোভে, না-হয় কাপুরুষতায়, না-হয় কুচিন্তিত দুর্বুদ্ধিতে যাহারা নিজে অনেক কুসংস্কার না মানিয়াও অনুন্নত সমাজের কুসংস্কারের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ভারতকে খোঁজে, তাহারা ভারতকে পাইবে না। তুমি তোমার বিবেক-বুদ্ধিতে বা ধর্মবুদ্ধিতে যে বিশ্বাস পাইয়াছ—যে আলোক পাইয়াছ, তাহা ধরিয়াই তোমাকে চলিতে হইবে ; তাহাতে সত্যের গৌরব রক্ষা করার ফলে সত্য বিস্তৃত হইয়া জাগবে ও ভারতকে পাইবে,—গোঁজামিল দিয়া পাইবে না। কবির ভাষা স্মরণ করিয়া বলি, যদি তোমার পাঁজ্‌রা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তবুও বিধাতাদত্ত আলোকে একাকী পথ চলিতে হইবে ; এই পন্থা ধরিলেই ভারতকে বিশ্বের দরবারে পাইবে,—আপনার প্রাণের মধ্যে পাইবে। কবির প্রাণস্পর্শী ভাষা স্মরণ করিয়া পরিশেষে বলি—একলা চল রে।

আবার তোরা মানুষ হ

কিসের শোক করিস ভাই! আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়াছে দেশ, দুঃখ নাই,—আবার তোরা মানুষ হ।

—যে উত্তেজনায় ক্ষিপ্ততা নাই, বরং যাহা মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তোলে, সেই উত্তেজনা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি গানের প্রাণ। আমাদের আত্মাভিমানের মোহ এখনও কাটে নাই, তাই এখনও আপনাদের দোষ, পরের ঘাড়ে চাপাইয়া পর-বিদ্বেষে আপনাদের চিত্ত নিরন্তর কলুষিত করিতেছি। আমার কপালে যে সাংসারিক উন্নতি ঘটিল না, সে কি কেবল 'ফেল্লাম বলে জন্মে ভুলে বিষ্যুৎ বারের বার বেলায়?' আত্মপ্রতারিতেরা মনে করে যে, তাহাদের ঘরের ছেলেরা পাড়ার দশজনের দোষেই বয়ে যায়; অধম কাপুরুষেরা মনে করে যে, চক্ষুশূন্য একটা গ্রহের দৃষ্টিতে, অথবা পূর্বজন্মের কর্মদোষেই তাহাদের যত অধোগতি। এই মোহে, ভ্রান্তিতে, কুসংস্কারে, আমরা নিজের দোষ দেখিতে পাই না। শিশু আছাড় খাইয়া পড়িলে মাটিতে পদাঘাত করিয়া ব্যথা ভোলে; শিশুর পিতা-পিতামহেরাও সেই পদ্ধতিতে পরকে গালি দিয়া আর্য্য-গৌরব-সুখ অনুভব করেন। কবি এই আত্ম-প্রতারিতদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

পরের পরে কেন এ রোষ,—নিজেরাই যদি শত্রু হোস্?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ; আবার তোরা মানুষ হ।

ভারতবর্ষ যে একদিন ভারি বড় ছিল, সে কথা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু আমাদের দেশের যে সাধারণ বিশ্বাস—আমাদের জাতির মত জাতি নাই, সে কি কোন প্রাচীন কালের যথার্থ গৌরবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত? অরণ্যচারী লোকেরাও বলে যে, তাহাদের মত শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীতে নাই; তাহারা যে কেন শ্রেষ্ঠ, সে কথা তাহারা বুঝাইতে পারে না। প্রাণের প্রতি মমতার মত, আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের এই অভিমান, সকল জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বরং যে জাতি বা লোক-সাধারণ যত বেশি মূর্খ, তাহাদের মধ্যে এই বিশ্বাস তত অধিক। আমাদের দেশের যে-শ্রেণীর লোক বিদেশের সাহিত্য ও অবস্থার সহিত অত্যন্ত অপরিচিত, তাহারাই আপনাদের অত্যন্ত গৌরবে বেশি বিশ্বাস করে। যেকারণে আমাদের যথার্থ গৌরব করিবার কথা, প্রাচীনের সে কাহিনী ত সেদিন পর্য্যন্তও এদেশে অনেকের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। যে সাহিত্যে অতি প্রাচীন কালের স্বাধীন চিন্তা, সুশিক্ষা ও চরিত্রনিষ্ঠার ইতিহাস পাই, তাহা ত এখনও রোমান্ অক্ষরে ছাপা হইয়া ইউরোপেই পড়িয়া আছে। মৌর্য্যকুলের গৌরব ত বিদেশের যত্নে সেই সেদিন প্রকাশিত হইয়াছে; গুপ্ত সম্রাটদের মহিমাও এখনও ফ্লীট সাহেবের খোদিত লিপিগ্রন্থে ডুবিয়া আছে। বৃথা বচন-দম্ভে কেহ কখনও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না; 'আমাদের সব ভাল' বলিয়া কেহ কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারে না। যাহা যথার্থ মাহাত্ম্যের জিনিস, তাহা বুঝিয়া নিতে পারিলে স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গে মাহাত্ম্য জিনিসটার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। যেকারণে এই প্রাচীন মাহাত্ম্য ডুবিয়া গেল, তাহাও সযত্নে বুঝিয়া নিতে পারিলে 'সব ভালোর' অন্ধতা চলিয়া যায়, আর উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়। কবির গানের একটি ছত্রে এই দোষের কথার পরিস্ফুট আভাস আছে—

ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই হতাশাময় বর্ত্তমান,
হৃদয়ে তোর জাগায়ে তোল্ ভায়ের প্রতি ভায়ের টান্।

আমরা বড় ছিলাম, সেত ভাল কথা, কিন্তু এখন যে কত দিক্ দিয়া কত ছোট হইয়া পড়িয়াছি, সে কথা ভাবিতে কুণ্ঠিত হই কেন? সত্যের ভিত্তিতে হোক, মিথ্যার ভিত্তিতে হোক, আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই স্বদেশ-হিতৈষণা জাগিয়া উঠিবে, ও মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে, এ কথায় কোন সমাজ-তত্ত্ববিদ্ বিশ্বাস করিতে পারেন না। ধর্ম্ম-তত্ত্বের কথায়ও শুনিতে পাই (সেটা আমার মত লোকের শোনা কথা বৈ নয়) যে, পূর্ণমাত্রায় পাপ ও অপরাধ-বোধ না জন্মিলে, কোন ব্যক্তি মুক্তি-পথের প্রয়াসী হইতে পারে না। যাহা সর্বত্র নিয়ম, তাহা কেবল স্বদেশ-হিতৈষণার বেলায় অনিয়ম, এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

কবির 'রাণা প্রতাপ' নাটকের নায়ক আদর্শ ক্ষত্রিয়; প্রতাপের শৌর্য্য, তিতিক্ষা, বীর্য্য, ক্ষমা, স্বদেশ-ভক্তি, এসকল অতি অধিক, অতি গভীর। কিন্তু মেওয়ার পতনের যাহা মূল কারণ, যে বিষ-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পরে সকল দেশকে জর্জ্জর করিল, তাহাও যে প্রতাপ-চরিত্রে নিহিত ছিল, কবি সুকৌশলে তাহা তাঁহার নাটকে দেখাইয়াছেন। শক্ত সিংহ প্রতাপের দক্ষিণ হস্ত; যাহা শক্তের শৌর্য্যে ও বুদ্ধিমত্তায় আয়ত্ত হইতেছিল, তাহা প্রতাপের কাছে অমূল্য,—স্বদেশের লাভের বিবেচনায় অমূল্য। তবুও প্রতাপ, শক্ত সিংহকে পরিত্যাগ করিলেন, কেন-না শক্ত সিংহ মুসলমানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রতাপ যখন বলিলেন, তিনি এতদিন 'বংশ-গৌরব' রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তখন বুঝিতে পারা গেল যে, এ দেশের কপাল পুড়িয়াছে। কোথায় জাতির সর্ব-ব্যাপী স্বার্থ, আর কোথায় ক্ষুদ্র বংশ-গৌরব! এত

নিঃস্বার্থতা, এত ত্যাগ, এত মাহাত্ম্য, ঐ সঙ্কীর্ণতায় গ্রাস করিল। আমাদের সঙ্কীর্ণতা ও আত্ম-কলহ, কবিকে বড়ই ব্যথিত করিয়াছিল। গানে তিনি গভীর দুঃখে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

ভুলিয়ে যারে আত্ম-পর, পরকে নিয়ে আপন কর ;
বিশ্ব তোর নিজেরই ঘর,—আবার তোরা মানুষ হ।

"মা সত্যবতী, মেওয়ারের পতন কি আজ আরম্ভ হোল? তার পতন, যেদিন থেকে সে নিজের চোখ্ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলেছে, —যেদিন থেকে সে ভাব্‌তে ভুলে গিয়েছে। যতদিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে ; কিন্তু সে স্রোত যখন বন্ধ হয়, তখনই তাহাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃ-দ্রোহিতা, বিজাতি-বিদ্বেষ জন্মেছে। সেই উদার অতি উদার হিন্দু-ধর্ম, আজ প্রাণ-হীন একখানি আচারের কঙ্কাল। জাতি যে পাপে ভরে গেল, তা দেখবার কেউ অবসর পায় না। মেওয়ার গেল বলে ক্রন্দন কল্লে কি হবে মা?"

মহাবৎ খাঁ মহৎ, মহাবৎ খাঁ বীর। সে জাতিতে হিন্দু, ধর্মে মুসলমান। একজনের যদি আন্তরিক বিশ্বাস জন্মিল, সে অমুক ধর্ম সেবা না করিলে মুক্তি নাই, তখন সে তাহা করিতে পারিবে না কেন? ধর্ম্মমতের বিষয় যখন পরলোকের কথা নিয়া, তখন সে যাহা ভাল বুঝিল, তাহার অনুসরণ করিলে তোমার আমার ক্ষতি কি? ঈশ্বর বলিতে আমি যাহা বুঝি, দেব-পূজার পদ্ধতি আমি যেটা মানিয়া থাকি, সেইটি যদি অপর ব্যক্তি না মানিয়া নেয়, তবে সে কি দূর হইয়া চলিয়া যাইবে?' যদি কোন লোক দেশ-প্রচলিত দেব-পূজা পরিত্যাগ করে, তখন, সগর সিংহ মহাবৎকে যাহা বলিয়াছিলেন, অবিকল সেই কথাই

আমরা বলিয়া থাকি। আমরা বলি,—তুমি কি দুপাতা পড়েই এত বড় শাস্ত্র অগ্রাহ্য কর? হিন্দু-ধর্মের মত সনাতন ধর্ম আর আছে? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এগুলি কি একটা দম্ভ ও অহঙ্কারের কথা মাত্র নয়? ধর্ম কি দম্ভ ও অহঙ্কার? আর না হয়, তোমার মতই পরম সত্য, আর তুমিই অগাধ পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান। কিন্তু সকলে তোমার মতে মত দিবে, আর তুমি যেমন করিয়া ভাব, তেমনি করিয়া ভাবিবে, এত বড় আস্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার তোমার জন্মিল কেন? মতবিরোধের জন্য মহাবৎকে যদি তাড়াইয়া দাও, তবে সে একটা আশ্রয় গ্রহণ করিবেই ত! মনে কর যে সে না বুঝিয়াই মুসলমান হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাহার পাপ হইল কি? সে যদি হিন্দু হইতে চায়, তুমি তাহাকে হিন্দু করিয়া নিতে পার? যে শরীরে ক্ষয়ের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বৃদ্ধির পথ নাই, বিনাশই যে তাহার একমাত্র ভাগ্য, তাহাও কি তর্ক করিয়া বুঝাইতে হইবে? যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে কি প্রতিভা ফুটিতে পারে? হায় স্বদেশ!

আমরা এত মূর্খ যে, একথাও দম্ভ করিয়া বলি যে, নানা ধর্ম, নানা মতের স্রোত বহিয়া গেল, কিন্তু হিন্দু তাহাতে হিন্দুয়ানি ছাড়ে নাই। সত্যসত্যই কি আমাদের সমাজ, ক্ষয়ের সেই শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন জড়তার কঠিন অবস্থায় কোন নূতন ভাব সংক্রামিত হইতে পারে না, পরিবর্তন অসম্ভব হয়, আর বিনাশই একমাত্র পরিণামে অবশিষ্ট থাকে? যাহারা মৃত আচারের কঙ্কালকেই পূজা করে, তাহারা মহাবৎকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলে; আর কোঁটা কাটিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করিলে (ও না করিলেও) গজসিংহের মত মহা-

পাপিষ্ঠকে সমাজের একজন বলিয়া সন্তুষ্ট থাকে। স্বদেশবাসি, একবার কবির কথা শোন—

শত্রু হয় হোক না,—যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভাল বাসিতে শেখ্ তাহারে কর হৃদয় দান ;
মিত্র হোক্ ভণ্ড যে,—তাহারে দূর করিয়া দে ;
সবার বাড়া শত্রু সে !—আবার তোরা মানুষ হ।

মহাবৎ খাঁ ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান মেওয়ারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেন না। কিন্তু মেওয়ার পতনের পূর্বাহ্নে যেদিন সগর সিংহ উদার হিন্দু ধর্মের চরম মাহাত্ম্য বর্ণনার পর মহাবৎকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার হিন্দু-পত্নী তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করে বলিয়া তিনি পিতার গৃহ হইতে তাড়িতা হইয়াছেন, তখন তিনি মেওয়ারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। মহাবৎ খাঁর প্রতিজ্ঞা যে বিশুদ্ধ যুক্তি অনুমোদিত নয়, একথা তাঁহার হিন্দু-পত্নী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া লজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মহাবৎ রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। নারীর প্রতি অত কঠোর অবিচারের কথা শুনিলে নিঃসম্পর্কীয়েরও রক্ত গরম হইয়া ওঠে। আমাদের প্রতিবেশী মুসলমানদের মধ্যে যাহারা অশিক্ষিত বলিয়াই গোঁয়ার, তাহারা যেসকল অনাচার-অত্যাচারের সৃষ্টি করে, তাহা অত্যন্ত গর্হিত ও পাপ দুষ্ট। কিন্তু তাহারা যে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়, তাহার মূলে কি আমাদের বহু-কাল সঞ্চিত বিদ্বেষ আর পাপ নাই ? হিন্দু-মুসলমানের বিবাদে উভয় পক্ষই, যাহা পরম কল্যাণ-প্রদ, তাহা পায়ে দলিতেছে'। ভ্রাতৃ-বিরোধে 'কল্যাণী'ই একা পিষিয়া মরিল।

এই ভ্রাতৃ-বিরোধ রহিত করিতে গিয়া, কি করিয়া মানুষ হইতে

হয় তাহা মানসী, রাণাকে বলিয়াছিলেন। মানুষ হইতে হয়, 'বিদ্বেষ বর্জন করে, নিজের কালিমা, দেশের কালিমা, বিশ্ব-প্রেমে ধৌত করে নিয়ে।' একি বড় আসমানি রকমের কথা? বিশ্ব-প্রেম বিকসিত হইলে কি স্বদেশ-প্রেমের প্রগাঢ়তা থাকিবে? ধর্ম্মের কথায়ও ঠিক এইরকম সন্দেহই উপস্থিত হয়। যদি সর্বান্তঃকরণে জগদীশ্বরকে ভাল-বাসিতে যাই, তাহা হইলে আমার সাধের সংসারটি কোথায় পড়িয়া থাকিবে? সংসারকে ভাল বাসিতে না পারিলে যে, সংসারের পরপ্রান্তে জগদীশ্বরের চরণে আমাদের ভালবাসা পৌঁছায় না, আর অন্যদিকে তাঁহাকে পাইলেই যে, সব পাওয়া যায়, একথা আমরা ভোগাসক্তিতে বুঝিতে পারি না।

বিশ্বপ্রেম একটা লোকাতীত পদার্থ নয়। যে নিজের পরিবারকে ভালবাসিতে পারেনা, স্বদেশকে ভালবাসিতে শেখে নাই, তাহার মনে বিশ্ব-প্রেম জাগিবে কেমন করিয়া? জগদীশ্বরের প্রতি প্রীতির অনুবৃত্তিতে এখানেও এই কথা খাটে যে, বিশ্ব-প্রেম জন্মিলে স্বদেশ-প্রীতি ও আত্ম-প্রীতি বিশুদ্ধ হয়। যাঁহাদের অল্পমাত্রও বিশ্ব-প্রীতি আছে, তাঁহারা আট্‌লাণ্টিকের পরপারেও দাসত্ব-প্রথার অত্যাচার দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন্। যদি কোন-প্রকারে নিজের দোষে কিম্বা পরের অত্যাচারে কোন জাতি মাথা তুলিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে না পারে, তবে কি সেই জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি বিশ্ব-প্রেমিক, তিনিই সর্বাগ্রে সে বাধা তিরোহিত করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন না? উদাসীন শ্রেণীর ফকিরি, ধর্ম্মক্ষেত্রেও মহাপাপ, সংসারক্ষেত্রেও মহাপাপ। পবিত্রতার অর্থ ফকিরি নয়; পবিত্রতা জ্ঞানকে মাজিয়া উজ্জ্বল করে, ভক্তিকে সরস করে, আর শক্তিকে সবল করে। কবি যথার্থই লিখিয়াছেন—

জগৎ-জুড়ে দুইটি সেনা, পরস্পরে রাঙায় চোখ্;
পুণ্য সেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রু হোক্।
ধর্ম্ম যেথা সেদিকে থাক, ঈশ্বরকে মাথায় রাখ্;
স্বজন দেশ ডুবিয়ে যাক্, আবার তোরা মানুষ হ।

কবির যেওয়ার পতনের মূল মন্ত্রটি মানসীর ঐ গানে। সেই জন্য জাতীয় সাহিত্যের ঐ অমূল্য গানটির সমালোচনা করিলাম। ঈশ্বরকে মাথার উপরে আসন দিয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া, স্বদেশ সেবা করিতে গেলে যদি পদে-পদে বাধা পড়ে, তবে নিশ্চয় জানিও, তুমি পাপের কুহকে পড়িয়া অপূজ্যকে পূজা করিতে বসিয়াছ; স্বদেশের চরণপ্রান্তে তোমার পূজার অঞ্জলি পড়িতেছে না। ক্ষুদ্র স্বার্থ ও নীচ সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া ফেলিয়া দাও; বিধাতার আশীর্বাদে সুদিন আসিবে। শুধু—

আবার তোরা মানুষ হ।

'আর্য্য' নামের দাবি

বেদের মন্ত্র যাঁহাদের রচনা, তাঁহাদের জাতি-পরিচয়ের নাম দাঁড়াইয়াছে 'আর্য্য'। আর্য্য শব্দে ঠিক একটা জাতি বা সম্প্রদায় বুঝাইত কি না, আর এখন ঐ শব্দ কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের নামে চালান যায় কি না, সে বিচার করিব না; বিচার করিব—যাঁহারা বেদমন্ত্র রচিয়াছিলেন ও বৈদিক যুগের আচার-ব্যবহার যাঁহাদের জাতিনিষ্ঠ ছিল, একালে তাঁহাদের বংশধর কাহারা?

যাঁহারা নিজে অথবা যাঁহাদের জানা-শোনা পিতৃপুরুষেরা বেদকে আপনাদের আদিম ধর্মশাস্ত্র বলিয়া মানেন বা মানিতেন, আপনাদের সকল ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান বেদের দোহাই দিয়া চালান বা চালাইতেন, ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত পুরোহিত দিয়া পূজা-আর্চা ও পারিবারিক অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন বা করাইতেন, অথবা যাঁহাদের বংশে প্রাচীন ঋষিদের গোত্রের নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা বেদ-রচয়িতাদের দলের লোকের বংশধর কি না, তাহাই বিচার্য্য।

একালের ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান বৈদিক কি-না, তাহার বিচারে অতিভৌতিক বা অনুশাস্ত্রিক বা আধ্যাত্মিক তর্কের ঝড় তুলিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, খাঁটি ঋষিবংশের লোকেরাও নানা প্রভাবে প্রাচীন রীতি বদলাইতে পারেন। গায়ত্রী ছন্দে মন্ত্র পড়া ও পৈতা পরা হইতে মালা-তিলক ধারণ ও গৌর-গৌর বলা পর্য্যন্ত সকল ব্যবহারই বংশ-নিরপেক্ষভাবে ঘটিতে পারে। গায়ের বর্ণ দেখিয়া বর্ণবিচার বা জাতিবিচার চলে না; কাল বামুন ও কটা শূদ্র, জাতির

পরিচয়ের সাক্ষী নয়। মাথার খুলির লম্বা-চওড়ার মাপেও লম্বা-চওড়া কথা বলা চলে না; কারণ, বেদ-রচয়িতাদের দলের লোকদের মাথার মাপ কেহ রাখিয়া যায় নাই, ও আদিম 'আর্য্যেরা' দেখিতে কেমন ছিলেন তাহা এ পর্য্যন্ত কাহারও বলিবার সাধ্য হয় নাই। কাজেই সেকালের শরীরের সঙ্গে একালের শরীরের তুলনায় বিচার করা অসম্ভব। 'আর্য্যবর্ণ' বলিতে কতখানি ফর্সা রং বুঝাইত, আর শ্যাম বলিতেই বা কতটুকু ঘোরাল ছায়া পড়িত, তাহা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। অন্যদিকে আবার মানুষ-মাত্রেরই রক্ত, মানুষের রক্ত,—অন্য জীবের নয়; কাজেই রক্তের পরীক্ষায় বংশ ধরা এখনও অসম্ভব রহিয়াছে। বর্ণসঙ্করতার অনেক ইতিহাস ও উপন্যাস আছে বটে, কিন্তু তাহা দিয়া ধরা যায় না যে কোন্ জাতির বা কোন্ ব্যক্তির শরীরে আর্য্যের ভাগ বা অনার্য্যের ভাগ কতটুকু।

যাঁহারা আর্য্য বংশের দাবি রাখেন তাঁহাদের এমন কতকগুলি বদ্ধমূল সামাজিক সংস্কারের হিসাব নিব, যেগুলি উচ্চ বংশের আর্য্যের পক্ষে নীচ বংশের অনার্য্যের সমাজ হইতে ধার করিয়া নেওয়া অথবা দৈবাৎ কুড়াইয়া নেওয়া সম্ভব নয়। এই সংস্কারগুলি কি-কি, তাহা উল্লেখ করিবার আগে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইব যে, কিরূপ ধরণের বদ্ধমূল সংস্কার দেখিয়া মানুষের জাতি ও সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়।

কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা যে জব্ চার্ণকের নামে চানক গ্রামের (বারাকপুরের) নাম, সেই ইউরোপীয় সমাজের খ্রিষ্টিয়ান, একটি হিন্দু মেয়েকে সতীদাহের মরণ হইতে বাঁচাইয়া নিজের স্ত্রীরূপে রাখিয়াছিলেন। চার্ণক হিন্দু সমাজের রীতি-নীতি জানিতেন না, আর সেই মেয়েটিও খ্রিষ্টিয়ানের ধর্ম্ম ও সমাজের সঙ্গে অপরিচিত ছিল।

মেয়েটি যখন মরিয়া গেল, জব্ চার্ণক তখন সেই মেয়েটির প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য তাহার ধর্ম-বিশ্বাসের অনুরূপ মনে করিয়া যেরূপে মৃত সৎকার করিলেন, তাহা বলিতেছি। জব্ চার্ণক মেয়েটিকে কবর দিয়া সেই কবরের উপরে একটা কালী মূর্তি বসাইলেন, আর মাঝে মাঝে সেই কালী মূর্তির কাছে এক-একটা মুরগী বলি দিতেন। এই হিন্দুয়ানি হইতে জব চার্ণকের খাঁটি পরিচয় পাওয়া বড় সহজ। আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের সরোজিনী নাটকে আছে যে, হিন্দুর রাজ্যে হিন্দু সাজিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মুসলমান সমাজে বর্দ্ধিত একজন খাঁটি মুসলমান মাথায় টিকি রাখিয়া ছদ্মবেশে ফিরিতেছিল। আর যখন হিন্দুরা তাহাকে সন্দেহ করিয়া পাকড়াইল, তখন সে ছদ্মবেশধারী শপথ করিরা বলিল —'আল্লার কিরে, মুই হেঁদু।' ব্রাহ্মণ-সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত না হইয়া যেসকল অন্য জাতির লোকেরা ব্রাহ্মণ্য প্রথার নকল করিয়া অদ্ভুত রীতির সৃষ্টি করে, তাহাদের অনেক কথাই অনেকের কাছে পরিচিত। বাহ্যিকভাবে গোটাকতক ইউরোপীয় ধরণ-ধাঁচার নকল করিয়া যাঁহারা এদেশে ইউরোপীয় সাজেন, তাঁহারা প্রতি পদেই আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকেন।

এবারে এমন কতকগুলি সামাজিক শিষ্টাচারের ও প্রথা-পদ্ধতির উল্লেখ করিব, যেগুলি একদিকে বেদ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি রচয়িতাদের দলে বা সমাজে আদপে প্রচলিত ছিল না,—ইউরোপে যাহারা আর্য্য-ভাষা ব্যবহার করে তাহাদের মধ্যে ছিল না, কিন্তু যেগুলি অন্য দিকে ভারতের অনেক অনার্য্য সম্প্রদায়ে ছিল ও আছে, আর পৃথিবীর সর্বত্র বহু শ্রেণীর অসভ্য ও বর্বর সমাজে ছিল ও আছে। সেইসকল অনার্য্য শিষ্টাচার ও প্রথা-পদ্ধতি যদি গভীরভাবে ও বিস্তৃতরূপে আর্য্যবংশের

দাবিওয়ালাদের ঘরে-ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বড় সন্দেহ জন্মে। সেগুলি গর্বিত আর্য্যেরা অনার্য্য প্রতিবেশীর কাছে ধার করিয়া নিয়াছিল কি-না, অথবা মৌলিকভাবে যাহাদের সমাজে সেই শিষ্টাচার ও প্রথা-পদ্ধতি বদ্ধমূল ছিল, তাহারাই সেইগুলি ধার করিয়া আর্য্যের পোষাক পরিয়া আর্য্য সাজিয়াছে কি-না—সে বিচার সংস্কারগুলির প্রকৃতি দেখিয়া করিতে হইবে। এক-দুই করিয়া প্রথাগুলির উল্লেখ করিতেছি।

বেদ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে ও উহার অনেক পরবর্তী গৃহ্যসূত্র প্রভৃতিতে কোনপ্রকার নিষেধ-বিধি নাই যে, (১) শাশুড়ী জামাইকে দেখিয়া মুখ ঢাকিবেন ও শাশুড়ী-জামাইএ কথা কওয়া চলিবে না; (২) এমন বিধিও নাই যে, বউ শ্বশুর-শাশুড়ীর—বিশেষ ভাবে মামা-শ্বশুর ও ভাশুরের সম্মুখে মুখ ঢাকিয়া থাকিবে, ও ঐ বর্গের মধ্যে কেবল কদাচিৎ শাশুড়ীর কাছে ইঙ্গিতে (কথা কহিয়া নয়) মনের ভাব জানাইবে; ঘোম্‌টার ভিতর হইতেও, যে ভাশুর ও মামা-শ্বশুরেরর মুখ দেখা পর্য্যন্ত বউ-এর পক্ষে নিষেধ, সে ভাশুর ও মামা-শ্বশুরের নাম পর্য্যন্ত প্রাচীন কালের বইএ পাওয়া যায় না। (৩) সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোন গুরুজনের নাম ধরিয়া না ডাকা এক কথা, আর কোন গুরুজনের নাম মুখে উচ্চারণ না করার প্রথা আর এক কথা; স্বামী, ভাশুর ও শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতির নাম করা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষেধ, আর কোন জড় পদার্থ বা জীব-জন্তুর নাম উঁহাদের নামের প্রায় কাছাকাছি হইলে, সে নামগুলি ঘোরাইয়া-পেঁচাইয়া বলিতে হইবে, এমন বিধিও পাওয়া যায় না। উল্টা পক্ষে উক্ত সম্পর্কের সকলেই সকলের সঙ্গে কথা কহিতেছে ও প্রয়োজনের সময়ে স্ত্রী স্বামীর নাম ধরিতেছে, এমন দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্যে ভূরি-ভূরি পাওয়া যায়।

'জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী,—'

এ দৃষ্টান্ত প্রাচীনের কোথাও নাই। প্রাচীনে পাই যে, স্বামীর ছোট-বড় সকল সহোদরেরাই দেবর অর্থাৎ দেবর বর্গে; নিয়োগ প্রথা যখন চলিত ছিল, তখন একালের হিসাবের ভাশুর ব্যাস ভাদ্রবধূর সন্তানের পিতা হইয়াছিলেন। শ্বশুরের মত মায়ের ভাইকে ভ্রাতৃ-শ্বশুর নাম দেওয়া হইয়াছে অতি অর্বাচীন যুগে, আর সেই শব্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে ভাশুর নাম। এ সকল প্রথা আর্য্য নামের দাবিদারদের সমাজের হাড়ে-মাসে জড়াইয়া আছে, আর উহার কোন-কোন বিধি না মানা ভারি পাতক, ও সে পাতকের জন্য প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত করিতে হয়। প্রথাগুলি যেখান হইতেই আসিয়া থাক্, উহা সমাজে চিরন্তন রকমে বনিয়াদি।

যেসকল রীতি ও শিষ্টাচারের কথা লেখা গেল, সেগুলি প্রাচীন আর্য্যসমাজে আদপে ছিল না, কিন্তু এদেশের অনেক অনার্য্য সম্প্রদায়ে ছিল ও আছে, আর ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের অসভ্য বর্বর সমাজে আছে। হুবহু এইসকল প্রথা ও শিষ্টাচার আফ্রিকার বাণ্টু, হটেণ্টট্ প্রভৃতির মধ্যে আছে, সাইবিরিয়ার অনেক অনুন্নত জাতির মধ্যে আছে, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে আছে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আছে, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে আছে। ভারতের অনার্য্যের দৃষ্টান্ত দিলে পাঠকদের মনে হইতে পারে যে হয়ত-বা আর্য্যের কাছেই অনার্য্যেরা অন্য অনেক রীতির মত এই রীতিগুলি ধার করিয়াছিল; সেইজন্য বিদেশের অনার্য্যসমাজের দৃষ্টান্তই দিব।

সাইবিরিয়ার 'য়ুকাঘির' (Yukaghir) সমাজের বউএর পক্ষে তাহার শ্বশুরের মুখ ও স্বামীর বড় ভাইএর মুখ দেখা নিষিদ্ধ; জামাইও শ্বশুর ও শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকাইতে পারে না; বউকে যদি শাশুড়ীর

সঙ্গে কথা কহিতে হয়, তবে হয় পরোক্ষভাবে শোনাইয়া-শোনাইয়া কথা কহিতে হয়, আর না-হয় মুখে 'চুক্-চুক্' 'তু-তু' শব্দ করিয়া ইঙ্গিত করিয়া জানাইতে হয়। যদি হঠাৎ কোন পুরুষের চোখে পড়ে যে তাহার শাশুড়ী বা স্ত্রী হাতে খাইবার গ্রাস তুলিয়া মুখে দিতে যাইতেছে, তবে সে নিজে মুখ ফিরাইয়া পালাইবে, আর স্ত্রীলোকেরা হাতের গ্রাস ফেলিয়া দিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিবে। এই রীতি আর যেসকল জাতির মধ্যে আছে তাহাদের নাম—অষ্টিয়াক. কাল্‌মুক্, আল্‌তাইয়ান্ প্রভৃতি, আফ্রিকার বাণ্টু প্রভৃতি জাতির মধ্যে, আমেরিকার অনেক জাতির মধ্যে ও অষ্ট্রেলিয়ায় হুবহু এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রমে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রায়শ্চিত্ত করাইবার ব্যবস্থা আছে; ওসেনিয়ার কয়েকটি জাতির মধ্যে রীতি আছে যে, শ্বশুর যদি দৈবাৎ জামাইকে দেখিতে পায়, তবে সে তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকিয়া ফেলে।

যেসকল জাতির নাম করিলাম, তাহাদের অনেকের মধ্যেই স্বামী, ভাশুর, শ্বশুর প্রভৃতির নাম মেয়েরা মুখে উচ্চারণ করিলে পাপ হয়। অন্য পদার্থ বা জীবের নাম স্বামী-প্রভৃতির নামের মত উচ্চারিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, অতি কৌশলে—by a makeshift, সে পদার্থ বা জীবের নাম করিতে হয়। আমাদের দেশে যেমন মেয়েরা ঐরূপ নাম উচ্চারণ করা নিষেধ থাকিলে কালীকে ফালী বা আনন্দকে আলন্দ বলে, ঐ 'makeshift' সেই ধরণের। একখানি নৃতত্ত্বের বই হইতে একটি দৃষ্টান্তের অবিকল তর্জমা দিতেছি। একটি মেয়ের উচ্চারণে নিষিদ্ধ কয়েকটা নামের সঙ্গে ভেড়া, নেকড়ে বাঘ, জঙ্গল ও জলাশয়ের নামের মিল ছিল; কেমন করিয়া নেকড়ে বাঘ জঙ্গলের পথে তাহাদের ভেড়া টানিয়া জলাশয় পার হইয়া গিয়াছিল, তাহার বর্ণনায় সে বলিয়াছিল—একটা হালুম (howling one) আসিয়া ভে-ভেকে

(bleating tone) মড়্‌মড়ের (rustling thing) ভিতর দিয়া নিয়া তক্‌-তক্‌ (glistening) পার হইয়া গিয়াছে। এখানে মনে পড়িতেছে সেই গোঁসাইএর শিষ্যের কথা, যে শাক্তদের পূজ্য পদার্থের ও হিংসাসূচক জিনিসের নাম করা এড়াইয়া, তাহার প্রভুর ডাকাতের হাতে মরার বর্ণনা করিয়াছিল। গোঁসাইকে দুর্গাপুরের মাঠে বেলতলায় ডাকাতেরা কাটিয়া রক্তে ভাসাইয়াছিল, আর সেই কথা পলাতক শিষ্য এই ভাবে বলিয়াছিল—হাতীশুঁড়ার মার মাঠে তেফড়্‌কের তলায় প্রভুকে বানাইয়া টুক্‌-টুক্‌ ভাসাইয়াছে। শুনিয়াছি শাক্তেরা এঁচড়কে গাছ-পাঁঠা বলে বলিয়া ঐ সামগ্রি অনেক বৈষ্ণবের সেবায় লাগে না।

আমেরিকার কোন-কোন জাতির মধ্যে, আফ্রিকার জুলুদের মধ্যে ও সাইবিরিয়ায় কোথাও-কোথাও নিয়ম আছে যে, মেয়ের বিবাহ দিয়া মেয়ের বাপ, জামাই ও বেয়াইএর বাড়ীতে মেয়ের ছেলে না-হওয়া পর্য্যন্ত কিছু খান না ; খাইলে মেয়ের সন্তান হওয়ায় বাধা হইবে, এইরূপ বিশ্বাস বাণ্টু্দের মধ্যে দেখা যায়।

এসকল কথা বিচার করিয়া মনে হয় যে যাহাদের সমাজের মৌলিক প্রথারূপে উক্ত বর্ণিত প্রথাগুলি বদ্ধমূল ছিল তাহারা বাহিরে আর্য্য-সভ্যতাটাকে যাচিয়া মাথায় পাতিয়া নিয়াছিল ; অথবা বলিতে পারি—আর্য্যের সভ্যতাটা পোষাক, কিন্তু সে পোষাক যে শরীরকে ঢাকিয়াছে সে শরীর যেন আর্য্যের নয়। নিদানপক্ষে একথা খুব বলা চলে যে, খুব বেশিপরিমাণে আর্য্য নামের দাবিদারদের সমাজ অনার্য্য-প্রভাবের অধীন। কোনওক্রমে বলা চলেনা যে, আর্য্যেরা দল বাঁধিয়া সারা ভারতবর্ষে আর্য্যের রীতি ও শিষ্টাচার ছাড়িয়া তাহাদের হাড়ে-মাসে অনার্য্যের শিষ্টাচার মিলাইয়া নিয়াছে। মানুষের সমাজ

বিকাশের ও উন্নতির ইতিহাসে যেসকল প্রথা কেবল বর্বর সমাজেই দেখিতে-পাওয়া যায়, তাহারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত ধরিয়া দেখা গেল—সে প্রথা বেদ-রচয়িতাদের সমাজে প্রচলিত ছিল না; আর অন্যদিকে দেখিতেছি যে আমাদের সমাজের মূল কাঠামখানায় বর্বর সমাজের অনেক উপকরণ আছে। যাহা কাঠামে পাই তাহা আকস্মিক বলিয়া বিচার করা শক্ত।

ধর্ম্মের লড়াই

এখন এদেশের নাম দাঁড়াইয়াছে ব্রিটিশ ভারত। ব্রিটিশ জাতীয়দের একচ্ছত্র রাজত্বে 'এ দেশের লোকেরা' কি উপায়ে আপনাদের অবাধ উন্নতির পথ মুক্ত রাখিতে পারে, তাহা নানা মতে নানা ভাবে বিচারিত হইতেছে। এ প্রবন্ধে 'এ দেশের লোক' অর্থে তাঁহাদিগকেই বুঝিতে হইবে, যাঁহাদের পক্ষে এদেশে বাস করা ছাড়া উপায় নাই,—যাঁহারা অন্যদেশে বাসা বাঁধিলে এদেশের গবর্ণমেণ্ট অবস্থাবিশেষে তাঁহাদিগকে টানিয়া আনিতে পারেন, আর ফিরিয়া আসিবার হুকুম অমান্য করিলে, যাঁহারা নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে ফিরিয়া আসিতে অধিকারী ন'ন্। এদেশে আমাদের যত স্বার্থ নিহিত থাকিলেও—প্রবাসী তাঁহারা, যাঁহারা যে-কোন সুবিধার দিনে চাকরি ছাড়িয়া, অথবা চাষবাস উঠাইয়া দিয়া, অথবা বাণিজ্য গুটাইয়া অন্য দেশে গিয়া, সেই দেশের লোকের অধিকার নিয়া থাকিতে পারেন। কি করিলে, এদেশবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, সে ভাবনাটা প্রথমোক্ত শ্রেণীর,—শেষোক্তদের নয়।

যাহা এদেশের লোকের উন্নতিকল্পে ও মুক্তিকল্পে হওয়া চাই ও পাওয়া চাই, তাহার সাধনার জন্য সকল শ্রেণীর লোককে যে একসঙ্গে জোটা চাই, ও পরস্পরের মনের মিল ঘটাইয়া কাজ করা চাই, তাহা বুঝাইতে হইবে না। আমাদের শত্রু-মিত্র সকলেই বলেন—এদেশে অনেক শ্রেণী, অনেক সম্প্রদায় ও অনেক রকমের ধর্ম্ম আছে বলিয়া সকলে একসঙ্গে জুটিয়া কাজ করা খুব কঠিন। কঠিনকে সোজা

করার অনেক চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু ঠিক যে উপায়টি ধরিলে স্থায়ী মিলের গোড়া পত্তন হয়, তাহা ধরা হইতেছে না বলিয়াই হয়ত অনেক আয়োজন নিষ্ফল হইতেছে। আমাদের অমিলের ও বিরোধের খাঁটি প্রকৃতি কি, ও উহার মূল কোথায়, আগে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা চাই।

একখানি নৌকায় যত বিভিন্ন ধর্মের লোকই থাক্ না কেন, ঝড়ে মাঝ-গঙ্গায় নৌকা-ডুবির আশঙ্কা হইলে, সকলেই একজোটে নৌকা বাঁচাইয়া কূলে যাইবার চেষ্টা করে; কেহ আল্লার নাম করিতে পারে, কেহ-বা মধুসূদনকে ডাকিতে পারে, কিন্তু কেহই পাকা লোকের হাতে মাঝিগিরি না দিয়া নিজের দলের বাহাদুরি দেখাইতে যায় না। কোন-কোন ক্ষণস্থায়ী ঝড়-ঝাপটের বেলায়, এদেশে এই ধরণের ক্ষণস্থায়ী মিল দেখা গিয়াছে, কিন্তু বিপত্তিটুকু পাড়ি দিবার পরেই অমিল ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রতি মুহূর্তেই একটা সত্যকার ঝড়-তুফানের নাম করিয়াও বেশিদিন মানুষকে উদ্বিগ্ন রাখা অসম্ভব; মাথার উপর সত্য-সত্য বিপত্তি থাকিলেও, যে বিপদ কেবল বুদ্ধিতে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা দশের বিপদ বলিয়া বুঝাইলে দশে তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝিয়া উদ্বিগ্ন হয় না।

বিপদ বুঝিয়া নেওয়া যে কঠিন, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। উচ্চ শিক্ষা না পাওয়া ও উহা পাইবার ভাল উদ্যোগ না হওয়া, দেশের একটা বিষম বিপদ বলিয়া মনে হইলে, লোকে কাজ চালাইবার উপযুক্ত ব্যক্তিকেই খুঁজিত, আর বিদ্যার বিভাগটাকে সম্প্রদায়বিশেষের বাহাদুরি ও জাঁক দেখাইবার অথবা পদ-গৌরব লাভের স্থান মনে করিত না; ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈষ্ণবদের মত কি, পদার্থতত্ত্বের বিষয়ে তান্ত্রিকদের মত কি, গণিত বিষয়ে বাউরি সম্প্রদায়ের মত কি, তাহা স্থির করিবার জন্য, অথবা পর-পার বিষয়ের বিশ্বাস অনুসারে বিদ্যা-পরিচালক নিযুক্ত

করিবার জন্য, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভায় সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি বসাইবার কথা উঠিত না। বিপত্তির ভাবনা নাই বলিয়াই অবসর সময়ে মনের খেয়ালে, নানা অলস-তার্কিক নানা কথা তুলিতে পারে।

ধর্ম প্রভৃতিতে অমিলের ফলে যদি এই ধরণের বিশ্বাস দৃঢ় হইতে পারে যে, পরস্পরের স্বার্থে গভীর বিরোধ আছে, তবে এক-একটা আকস্মিক বিপদের কাছাকাছি হইয়া যত কাজ করিলেও ভিন্ন-ভিন্ন দলে মিল হইতে পারে না। এটা সমাজ-তত্ত্বের ক-খ। ধর্ম কখনও মানুষের এক হইতে পারে না; তবে ধর্মের মধ্যে এমন কিছু আছে কি-না যাহা পরিহার করিলে কর্মে ব্যাঘাত ঘটে না, অথচ মিল হইতে পারে, তাহা খুঁজিয়া দেখা উচিত। বিচারের সুবিধার জন্য দু-একটা কাল্পনিক অবস্থা ধরিয়া ধর্মভেদের প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করি। নীচে যে কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিতেছি সেগুলি লোকের কাছে আদর্শ ধরিবার জন্য,—ধর্মভেদের মূলের বিবাদের কারণ ধরিবার জন্যই একটা কাল্পনিক অবস্থা নিয়া বিচার করিব।

ধর, চারিটি ভাই এক বাড়ীতে পৈত্রিক ভিটায় বাস করে। প্রথমটি তৃপ্তি পায় কালিদাসের কবিতা পড়িয়া, দ্বিতীয়টি ফার্দৌসি পড়িয়া, তৃতীয়টি সেক্‌স্‌পিয়র পড়িয়া, আর চতুর্থটির কাছে কবিতা পড়াটাই অপ্রিয়। উহারা মেসের ছাত্রদের মত তার্কিক হইলে, আপনাদের রুচি নিয়া সকলে নিঃশব্দে চলিতে পারে। উহাদের একজনের স্ত্রী যদি রবিবাবুর কবিতা ভালবাসে, আর স্বামীটি সে কবিতাকে উপহাস করে, তবে হয়ত কবিতার প্রসঙ্গে কথা কাটাকাটি হইতে পারে, কিন্তু পরস্পরে ভালবাসা থাকিলে, ঘর-সংসার চলায় বাধা হয় না। স্ত্রীর সাহিত্যে রুচি না থাকিলে যে, সাহিত্যিক স্বামীর ঘর-কন্নায় বিঘ্ন হয় না, সে জ্ঞান অনেকের প্রত্যক্ষ।

এখন যদি ধরা যায় যে, উপরের দৃষ্টান্তের ভাইদের মধ্যে প্রথমটি বিশ্বাস করেন—পরলোকের কর্তা বিষ্ণু, দ্বিতীয়টি ভাবেন—পরলোকের সদ্গতির উপায় মহম্মদের উপদেশ পালন, তৃতীয়টি মনে করেন—পারের কাণ্ডারী যিশু, আর চতুর্থটি ওপারের ভাবনাকে কুসংস্কারের দুঃস্বপ্ন মনে করেন, তবে যে-যাহার বিশ্বাস ও ভাবনা নিয়া একসঙ্গে সুখে থাকিতে পারিবে না কেন? আমরা অনেকেত প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, অনেকের সঙ্গে মনের মিলে পাকা বন্ধুত্ব হইয়াছে, আর বন্ধুদের ধর্মমত কি, তাহা খোঁচাইয়া বাহির না করিয়া বহুদিন একসঙ্গে বাস করিয়া সুখী হইতেছি। একজন ভগবানকে ডাকেনা, একজন পূর্বমুখে বসিয়া তাঁহাকে ডাকে, আর একজন ডাকে পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া; এসকল খুঁটিনাটি ধরিয়া বিবাদ ও দলাদলি বাধিবে কেন? কি করিলে ভাত-কাপড় জোটে, কিসে ঘর-সংসার ভাল চলে, কি উপায়ে রাষ্ট্র শাসন করা উচিত, এসকল কথাত সকল শ্রেণীর লোকের জন্য একই বিচারে স্থির হইতে পারে, আর সে বিচারের সঙ্গে ধর্ম-মতের ও পরলোকবাদের কোন সম্পর্ক নাই। পরলোকের হেঁয়ালির তর্কে প্রত্যক্ষ ইহলোকটাকে নাস্তানাবুদ করি কেন?

মেঘদূত-প্রিয়ের ঘরে যদি গীতাঞ্জলি-প্রিয় স্ত্রী সুখে ঘর করিতে পারে, তবে বিষ্ণু-ভক্তের ঘরে যিশু-ভক্ত স্ত্রীর স্থান হইতে পারে না কেন? একালের শিক্ষিত বাবুরা ধর্মের অনেক কথা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন, আর স্ত্রীদের কুসংস্কারজড়িত অনুষ্ঠানগুলিকে উপহাস করিয়া সহিয়া যান; দাম্পত্য-লীলায় বাধা হয় না। তবে বিষ্ণু বা মহম্মদ বা যিশুর নামে আঁৎকাইয়া যুদ্ধ বাধাইবার কি আছে? হয়ত এইটুকু পড়িতে-পড়িতেই অনেকের রক্ত গরম হইতে পারে। তাহার কারণ এই যে, ধর্মটা অত সহজভাবে বিশুদ্ধ মত-বাদের পার্থক্যের মধ্যে

পড়ে না ; উহার মধ্যে ভীষণ অমিলের মূল আছে,—উহার মধ্যে সমাজ-ক্ষয়কর অনেক বিষয় আছে,—পরকে সংহার করিবার অনেক স্থায়ী প্রবৃত্তি আছে। সেসকল মূল ধরিবার উদ্যোগে আরও দুচারিটি অবস্থার বিশ্লেষণ করা চাই। এই পদ্ধতিতে চলিলে উদ্দিষ্ট মূলগুলি প্রায় বিনা তর্কেই প্রত্যক্ষ হইবে।

আমার দৃষ্টান্তের ভাই কয়েকটির ভাষা ও সামাজিক দাঁড়া-দস্তর নিশ্চয়ই এক বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে। এখন যদি একজন ভাই বলেন যে তিনি তাঁহার 'করুণা প্রসাদ' নামটি অন্য ভাষায় তরজমা করিয়া নিজের নাম রাখিবেন 'করিমবক্স', আর বাঙ্গলা ছাড়িয়া উত্তর-পশ্চিমের হিন্দি ধরিবেন ও সেই হিন্দিতে অতি মাত্রায় ফারসি কথা জুড়িবেন, তাহা হইলে তাঁহার নাস্তিক-প্রায় চতুর্থ ভাইটি তাঁহাকে বলিতে পারেন যে, যে কাজে ধর্মলাভের সহায়তা নাই, তিনি সে কাজ করিবেন কেন? মহম্মদের জন্ম হইয়াছিল আরবে, তাহা না হইয়া এই ভারতের বাঙ্গলা বিভাগে হইতে পারিত; তাহাতে মহাপুরুষের প্রচারিত সত্য মলিন হইত না, কেন-না সত্যের পবিত্রতা কোন নির্দিষ্ট দেশের মাটির গুণে নয়। তাহা ছাড়া হিন্দি ভাষাটা আরবের ভাষা নয়,—আর সে ভাষায় ফারসি মিলাইলেও ভাষাটা মহম্মদের ভাষা হয় না। তবে সেই দেশের ভাষা ছাড়িয়া নিদান পক্ষে নামকরণের বেলায় বিদেশি ভাষার আশ্রয় নিয়া ফল কি? কথাটাত সহজ মনে হইতেছে; তবুও টানিয়া-বুনিয়া নামকরণে ও অন্য দশরকমে লোকে ধর্মের নামে দেশের ভাষাকে অগ্রাহ্য করে কেন? মানুষে স্বর্গে যায় নামের জোরে ও বাক্যের জোরে, না—ধর্মের মূল সত্যগুলির সাধনার জোরে? ইউরোপের লোকে পুরাকালের অখ্রিষ্টিয়ান্ যুগের নাম একেবারে বাদ দেয় নাই,—আর ইংরেজি চার্লস্, ভিক্‌টোরিয়া প্রভৃতিও যিশুর দেশের নাম নয়; তবে

যিশুর ভক্ত হইলে নামকরণের বেলায় চার্ল্‌স্‌ গড়্গড়ি ও ভিক্‌টোরিয়া চাকি, সৃষ্ট হইবে কেন? ধর্ম যদি নৈতিক বললাভের সম্বল হয়, ও মরণের পরে স্বর্গের শিঁড়ি ভাঙিবার সহায় হয়, তবে ধর্মের দীক্ষায় নিজের দেশ অপেক্ষা অন্য কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের সঙ্গে অধিক সম্পর্ক সূচনা করা হয় কেন? ভারতের স্বাধীনতা লাভের আয়োজনের সঙ্গে তুর্কির খালিফ বা ইতালির পোপের যদি সম্পর্ক না থাকে, তবে রাষ্ট্র-নীতির সমস্যায় প্রয়োজনের কথা ছাড়া অন্য কথা ওঠে কেন? ইংরেজি প্রবাদটি সকল সময় সত্য নয় যে. নামে কি যায় আসে; নামের প্রাণের ভিতর অনেকখানি অন্য জিনিস আছে; সেটা বুঝিয়া নিবার প্রয়োজন আছে।

ধর্মভেদের গোড়ার একটা কথা বলিব। মানুষের সমাজ বাঁধিয়া উঠিবার গোড়ার ইতিহাস এই—

প্রথমে মানুষেরা ছোট-ছোট দল বাঁধিয়া এমনভাবে এক-একটা যায়গায় থাকিত, যাহাতে অন্যদলের লোকেরা আক্রমণ করিতে না পারিত। এ অবস্থায় অসংখ্য অসম্পর্কিত দলের সৃষ্টি হইয়াছিল আর প্রত্যেক দলেরই ভাষা, আচার ও নিয়ম প্রভৃতি আলাদা হইয়াছিল। নিঃসম্পর্কিত দলের লোকদের দেবতাদের নাম, ভাষা-ভেদে ও মনের ভাবের ভেদে, স্বতন্ত্র হইয়াছিল। সকল দেশের লোকেই বিপদে-আপদে ও ভক্তিতে যে-দেবতাকে ডাকিত ও পূজা করিত, সে দেবতাও হইতেন প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র দেবতা। 'ক'-দলের সঙ্গে যখন 'খ'-দলের বিবাদ বাধিত, তখন যিনি যাহার দেবতা, তিনিই তাঁহার আপনার দলকে রক্ষা করিতেন অথবা শাস্তি দিতেন। দেশের প্রসার বাড়িলেই এক-একটা দলের প্রসার বাড়িত ও জাঁকজমকে দেবতার পূজার ঘটা চলিতে পারিত, আর দেবতারা তাহাতে খুসী হইতেন। এইজন্য স্বার্থের

তাড়নায় রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধির উদ্যোগের সময়ে লোকে মনে করিত ও বলিত, তাহারা দেবতার রাজ্য অথবা স্বর্গরাজ্য বাড়াইতেছে। ভূতলে Kingdom of God বাড়াইবার তলায় যে আসল প্ররোচনা হইল স্বার্থের প্ররোচনা, তাহা লোকে কালক্রমে ভুলিয়াছে। এখনও দেখিতে পাই যে, এক ধর্মে বিশ্বাসী ভিন্ন-ভিন্ন লোকে যুদ্ধ বাধাইয়া দেবতার কাছে জয় ভিক্ষা করিবার সময় ভাবে যে, দেবতা এক পক্ষের বন্ধু ও অপর পক্ষের শত্রু ; এরূপ স্থলে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হয় দেবতার বিধানের জয়-পরাজয় দিয়া। অর্থাৎ কিনা, দেবতার কৃপার কথা মুখে যত বলিলেও, মানুষের এই বিশ্বাসই ধরা পড়ে—বলং বলং বাহুবলং।

একদল মানুষ যখন স্বর্গরাজ্য বিস্তার করিতে বসে, তখন অপর দলের দেবতাকে জীবন্ত দেবতা বলিয়াই মানে ; তবে অপরের দেবতার নাম হয় অপদেবতা বা শয়তান। সকল যুদ্ধই বাধিত দেবতার নামে ; যুদ্ধে হারিলে শত্রুতে মারে আর হঠিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া ঘরে ফিরিলে, নিজের দেবতাই পরাজয়ের ক্রোধে মারিয়া ফেলেন ; কাজেই লোকে, মরিয়া স্বর্গে যাওয়াই প্রশস্ত মনে করিত ও যুদ্ধ করিত।

আসিরিয়ার লোকেরা বাবিলনের লোককে পরাজিত করিয়া বাবিলনের দেবতা লুটিয়া নিল; কারণ দেবতা দখলে না আসিলে দেবতার পূজকেরা আর কাহার সহায়তায় যুদ্ধ করিবে। এ রকমের যুদ্ধ অনেক দেশে অনেক হইয়া গিয়াছে। ধর্মের সঙ্গে দেশ, দেবতা, ভাষা, ও নানা আচার-ব্যবহার একসঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষের মনে জড়াইয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ বিচারে মানুষ তাহা ধরিতে পারে না, কারণ প্রাচীনকালের সংস্কার, অস্থি-মজ্জায় জড়াইয়া থাকিয়া ভাবের প্ররোচনা দেয়, কিন্তু বুদ্ধির সূতায় তাহা গাঁথা থাকে না। যদি এক জাতির লোক বিস্মৃত ধর্ম-বিশ্বাসের ফলে কোন খাদ্য না খায়, তবে

তাহারা সে খাদ্যের নাম শুনিলেই আঁৎকাইয়া উঠিবে,—স্বাস্থ্যের নামে কোন যুক্তি-তর্ক শুনিবে না। ধর্মের নামে যে অপরের আচার-ব্যবহারের প্রতি ঘৃণা আছে ও অপর জাতি ও অপর দেশের প্রতি গভীর বিদ্বেষ আছে, তাহার মূল অতি গভীর।

অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রাচীন সংস্কারে ধর্মত্যাগ অথবা নূতনধর্ম গ্রহণের অর্থই হইত,—নিজের দেশ, সমাজ, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্পূর্ণ পরিহার; কারণ নিজের দেবতা ছাড়িলেও পরের দেবতা ধরিলে এক দেবতার শাসিত রাজ্য ছাড়িয়া অন্য দেবতার শাসিত রাজ্যে পড়িতে হইত। একজন যদি দেবতা-ত্যাগের মহাপাতক করিত, তবে দেবতা এমন রুষ্ট হইতেন যে, দেশের মধ্যে সে আশ্রয় পাইলে সারা দেশের লোককে দেবতার কাছে দণ্ড পাইতে হইত; কাজেই দেবতা-ত্যাগীকে সবংশে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিতে হইত, আর সে দৈবাৎ নিজের দেশে মরিলে তাহার একটি কেশও দেশের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেওয়া হইত না। সে সংস্কার অতি অলক্ষ্যে রূপান্তরিতভাবে আছে বলিয়াই একালেও একরকমের আচার-ব্যবহার মানিয়া দুইটি ভাই ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম মানিয়া এক ঘরে থাকিতে পারে না। খাদ্য ও আচারের অতি খুঁটি-নাটি, ধর্মের সঙ্গে চিরকাল অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া আছে ও এক-এক ধর্মের নামের সঙ্গে এক-একটি দেশ যুক্ত আছে। বিলাতে একজন শিক্ষিত ইংরেজ এই সম্বন্ধে লেখকের সমক্ষে অন্য একজন ইংরেজকে তাঁহার হিন্দুধর্মের প্রতি টানের কথা সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি গায়ের রঙ্ না বদলাইয়া কি করিয়া হিন্দু-ধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম মানিতে পারেন।

এ সম্পর্কে ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার সকল কথা এখানে বলিব না; কেবল অল্প দু-একটি কথার আভাস দিব। প্রাচীনতম কাল

হইতে খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অনেক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যন্ত অসম্পর্কিতভাবে আপনাদের জাতি-ধর্ম নিয়া, সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভিন্ন দেশে থাকিবার মত বাস করিয়া আসিতেছিল। খাইয়া-পরিয়া থাকিবার ভূমির অভাব ছিল না,—কাজেই কেহ কাহারও দেশ দখল করিবার দিকে তেমন উদ্যোগ করে নাই। স্বার্থের গুরুতর বিবাদের কারণ ছিল না বলিয়া, কন্দ, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির লোকের স্থিতিতে বাধা হয় নাই। পূর্বকালের সংস্কারে সকলের সকল দেবতাই সত্য ছিল; তবে যে-যাহার আপনার দেবতাকেই মানিত ও আপনার আচার-ব্যবহার নিয়াই থাকিত। ভারতবর্ষে এই যে মনের ভাবের প্রাধান্য আছে যে, যাহার যে ধর্ম, তাহার কাছে সেই ধর্মই ভাল, উহা খাঁটি উদারতা বা পরবাদ-সহিষ্ণুতার ফলে জন্মে নাই। খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব পর্য্যন্ত যেসকল বিদেশের লোকেরা ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তাহারা নিজের দেশে আহার জোটে নাই বলিয়াই আসিয়াছিল, আর এদেশে আসিয়াও বসবাসের প্রচুর স্থান পাইয়াছিল। তাহারা নিজের দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া ভারতবর্ষ জয় করিতে আসে নাই, কাজেই তাহাদের ক্ষুদ্র দলগুলি, এদেশে স্থান পাইবার পর ধীরে-ধীরে এদেশের ক্ষমতাশালী জাতিদের ধর্মমতের অনুরূপ ভাব নিয়া বাড়িয়াছিল; ভাষা ও ভাব বদলাইয়া যাওয়ায় আপনাদের দেবতাগুলিকে এদেশের প্রধান জাতির লোকদের দেবতাদের সাদৃশ্যে নাম দিয়াছিল, আর পরে দেশ-বিদেশের দেবতা এক বর্গে স্থান পাইয়া পূজা পাইয়াছিল। কাজেই বহুকাল-স্থায়ী বিরোধ ঘটে নাই, বরং অতি শীঘ্রই সকল লোক একসঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল। বিদেশের সঙ্গে যোগ রাখিয়া বিদেশের দলের লোকেরা যখন দশম শতাব্দীর পরে ধর্মরাজ্য বিস্তার করিবার নামে দেশ জয় করিতে বসিয়াছিল, তখন আর

নবাগতদের পক্ষে এদেশের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া যাইবার কোন সুবিধা হইতে পারে নাই। কেবল আমার ধর্মই সত্য, আর সেই সত্য ধর্মই জয়ী হইবে—এই কথা বলিয়া এই ভারতবর্ষে ইহার পূর্বে কোন জাতি কোন জাতিকে কাবু করিতে চায় নাই। এসম্পর্কে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, খ্রিষ্টিয়ান্ ও মুসলমান ধর্ম জন্মিবার পূর্বে, এমন কোন ধর্ম দেখা যায় নাই, যে ধর্মের মতে অপরের সকল ধর্ম একেবারে মিথ্যা। প্রবন্ধটির এই শেষ অংশে যাহা লেখা গেল, তাহা অতি সংক্ষেপে একটু সঙ্কেত দেওয়ার মত করিয়া লেখা গেল। ধর্মের লড়াই যে বিষম লড়াই, আর ধর্মভেদের মূলে যে শ্রেণীর জাতীয় বিদ্বেষ, হিংসা, প্রভৃতি লুকাইয়া আছে, তাহা যে উপরে-উপরে প্রলেপ দিলে দূর হইবে না, তাহাই একটু বুঝাইবার চেষ্টা করা গেল।

ভারতবাসীরা কি এক 'নেশন্' নয়

নেশন্ হইল বিদেশী শব্দ ; সমাজতত্ত্ববিদেরা যে অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা বলিতেছি। তাঁহারা বলেন—একটা 'দেশের' মধ্যে অনেক 'প্রদেশ' থাকিতে পারে ও দেশের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন-ভিন্ন দলের লোক থাকিতে পারে, কিন্তু দেশটা যদি এমনভাবে অখণ্ড ও জমাট বাঁধা থাকে যে, সকল প্রদেশগুলি একসঙ্গে না জুটিলে কোন প্রকারে কোন একটা প্রদেশ তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলেই সেই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকে একই শাসনের মধ্যে পড়িলে একটি 'নেশন্' হইয়া দাঁড়ায়।

প্রথমে দেখিতে পাইতেছি যে, বিদেশের সকল পণ্ডিতেরাই স্বীকার করেন—ভারতবর্ষ দেশটি একটা geographical unit,—অর্থাৎ উহার কোন প্রদেশ অন্য প্রদেশকে ঠেলিয়া স্বাধীন হইতে পারে না। তাহার পরে দেখিতেছি যে আমরা এখন সকলেই এক রাজনৈতিক শাসনের অধীনে,—একই রাষ্ট্রীয় স্বার্থে বাড়িতেছি। পূর্বে কথনও পাকা রকমের একচ্ছত্র রাজত্ব না থাকিলেও প্রাচীন ভারতের অধিবাসীরা এই দেশটিকে একটি অখণ্ড দেশ বলিয়া ভাবিতেন। দেশের একত্বের এই অনুভূতি ইংরেজের আমলে নূতন করিয়া জন্মে নাই ; তবুও কি কারণে এদেশে পূর্বে একচ্ছত্র রাজত্ব হয় নাই, এখানে তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই। প্রাচীন একত্বের অনুভূতির দুইটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। কূর্মপুরাণে কূর্মকে এমন ভাবে রাখা হইয়াছে, যাহাতে ভারতের সকল অংশই উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঢাকা পড়ে; স্নানের মন্ত্রে সকলকেই

প্রতিদিন সিন্ধু হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত সকল দেশের নদীকে আপনার দেশের নদী বলিয়া স্মরণ করিতে হয়। তবে আমাদের প্রদেশে-প্রদেশে অনেক বিষয়ে মিল নাই আর জাতিতে-জাতিতে অনেক অমিল ও বিবাদ আছে; এইজন্য অনেকে ভারতবাসীদিগকে এক নেশন্ বা জাতিসঙ্ঘ বলিতে চা'ন্ না।

এক পরিবারের মধ্যে যদি প্রীতি ও সদ্ভাবের অভাব হয়, পুত্রেরা যদি পিতার অবাধ্য হয়, পুত্রদের মধ্যে যদি বিবাদ-বিসংবাদ চলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি কথায়-কথায় কলহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও কেহ বলিতে পারিবেন না যে ঐ পরিবারের লোকগুলি এক-পরিবারের লোক নয়। আমাদের কপালের দোষে, বুদ্ধির দোষে ও আরও দশরকমের দোষে যদি আমরা বুঝিতে না পারি যে আমরা এক-কে ঠেলিয়া অপরে বাড়িতে পারিব না, তাহা হইলে আমরা দোষ খণ্ডাইবার জন্য আয়োজন করিতে পারি; কিন্তু আমরা যে সকলে মিলিয়া এক জন-সঙ্ঘ নই, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের অভাব জন-সঙ্ঘের একতার, অর্থাৎ national unity নামক পদার্থের।

সকলের মধ্যে ধর্মে ও ভাষায় মিল না থাকিলে যাঁহারা একটি জন-সঙ্ঘকে 'নেশন্' বলিতে চা'ন্ না, তাঁহাদের কথা এখন উপেক্ষা করিতে পারি। যতই সভ্যতা বাড়িবে, ততই সামাজিক বিচিত্রতা বাড়িবে; প্রত্যেক লোকের ধর্মবিশ্বাস যদি স্বতন্ত্র হয়, তবে সেইরূপ চিন্তার স্বাধীনতায় সমাজ ভাঙ্গিবে না। যে বড় রকমের স্বার্থ আমাদের ইহলোক-সাধনের সহায়, সেটা হাড়ে-হাড়ে বুঝিলেই জাতীয় বাঁধন শক্ত হইবে,—পরলোকের তত্ত্ব নিয়া গোল বাধিবে না। তবে ধর্মের নামে পরস্পরের অমিলনের অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে; সে জঞ্জাল উচ্চতম স্বার্থের তাড়নাতেই পুড়িয়া যাইবে। শিক্ষায় সুবুদ্ধি ফুটিলে

কেহ আর উপযুক্ত লোকের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক পাতাইবার কালে খুঁজিবে না যে, সে ব্যক্তি কি খাদ্য খায় অথবা দৃশ্যাতীত বিষয়ে তাহার বিশ্বাস কিরূপ।

সুইট্সর্‌লণ্ডের মত ছোট দেশেও তিনটি ভাষা চলিতেছে, আর তাহাতে জন-সঙ্ঘ বাঁধিবার বাধা ঘটিতেছে না। রুসিয়া বাদ দিলে বাকি ইউরোপখণ্ড যতবড়, ভারতবর্ষ দেশটা তত বড়। এ হেন ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়াই বহু ভাষা চলিবে। এই ভাষার ভেদ থাকিলেও প্রাচীনকালে সারা ভারতবর্ষে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের পক্ষে কোন বাধা ছিল না। এক স্বার্থের টানে ও এক লক্ষ্যে ছুটিলে, এ ভাষাভেদ গোল ঘটাইবে না; মিলন ঘটিলে যে আবার কি পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে একটা সাধারণ ব্যবহারের ভাষা গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহাও কেহ জানে না। এখন আসা চাই—যথার্থ স্বার্থবোধ, বুঝিয়া ফেলা চাই যে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের লোক প্রাণের মিলে হাতে হাত ধরিয়া না চলিলে উদ্ধারের উপায় নাই। জাতি-সঙ্ঘ পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু মিলনের অভাবে সকলে বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে। নেশন্ শব্দটিকে একটা জুজুর মত খাড়া করিয়া যাঁহারা আমাদিগকে দেখাইতে চান্ তাঁহারা হয় ভ্রান্ত, না হয় আমাদের শত্রু।

ইংরেজের একচ্ছত্র রাজত্বে শাসনের সুবিধার জন্য প্রদেশ ভাগ হইয়াছে; এ বিভাগে অনেক স্থলে ভাষা-ভেদের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রদেশ যে একটি জাতিসঙ্ঘ বা race নিয়া নয়, তাহা আমরা অনেক সময় ইউরোপের ভিন্ন-ভিন্ন দেশের উপমা ধরিয়া ভুলিয়া যাই। এভুলে অনেক অনিষ্ট হইতেছে। এই ভুলের ফলেই বাঙ্গালীরা নানা প্রদেশে তাড়া খাইতেছে।

কংগ্রেসে যাঁহারা মিলনের কথা বলেন ও ভ্রাতৃভাব করেন,

তাঁহারাও এক-একটি প্রদেশের স্বার্থের কথা উঠিলে পরস্পরে রেসারেসি করেন ও তাড়াহুড়া জোড়েন। কাজেই কথাটির আশু বিচারের প্রয়োজন।

— সকল প্রদেশেই লোকের ধর্মের ভেদে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি আছে, অহিন্দু ও অমুসলমান 'আদিম অধিবাসী' আছে। ধর্মের স্বার্থে বা জাতির স্বার্থে আমাদের প্রদেশগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন নয়; রাষ্ট্রের বিচারে কে বাঙ্গালী, কে উড়িয়া, কে মরহট্টা, ইহার বিচার করা চলে কি-না, দেখিয়া নিতেছি। সুবিধার হিসাবে বাঙ্গালীকে ধরিয়া বিচার আরম্ভ করিয়া, প্রশ্ন করিতেছি—

আইনসঙ্গত বাঙ্গালী কে?—প্রশ্ন উত্থাপন করা গেল বাঙ্গালীত্বের বিচারে; কিন্তু উহাতেই কে উড়িয়া, কে মাদ্রাজী ইত্যাদি, তাহাও ধরা পড়িবে। ইউরোপের এক দেশের লোক যদি অন্য দেশের লোক হইয়া যাইতে চায়, তবে আইনের বিধান অনুসারে 'দেশীকরণ' পদ্ধতিতে গবর্ণমেন্টকে সে কাজ করিয়া নিতে হয়; আইনের এইরূপ বাঁধা বিধান অনুসারে একজন লে মেসরিয়ার—ইংরেজ হইতে পারে। ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোককে অপর প্রদেশের লোক করিবার জন্য এরূপ কোন domicile বিষয়ক আইন নাই আর যে-কোন প্রদেশের লোক অপর প্রদেশে স্থাবর সম্পত্তি কিনিয়া বাস করিতে পারে, ও তাহাকে কোন প্রকারের অধিকার লাভের জন্যই 'সিটিজেনের' সার্টিফিকেট্ নিতে হয় না। এদেশে এইরূপে সকলের পক্ষেই স্বাধীনভাবে যেখানে-সেখানে বাস করিবার অধিকার আবহমান-কাল চলিয়া আসিয়াছে; একালে ইউরোপীয় আইনের বিধান স্মরণ করিয়া এক প্রদেশের লোকের অপর প্রদেশে বাসের সময় domicile শব্দটি কেহ-কেহ উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু আইন অনুসারে সে শব্দটির

কোন মূল্য নাই। ইণ্ডিয়ান্ সক্‌সেশন্ আইনের ডমিসিলের বিধান ইউরোপীয়দের জন্য,—ভারতবাসীর জন্য নয়।

মুসলমান আমলের আগে মরহট্টা জাতির নামে নামাঙ্কিত অথবা ওড় জাতির নামে নামাঙ্কিত প্রদেশে যখন ব্রাহ্মণেরা বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন সে ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে মরহট্টা বা উড়িয়া বলিতেন না; বলিলে তাঁহাদের অপমান হইত। এখনও পুণা অঞ্চলে ব্রাহ্মণকে মরহট্টা বলিলে তিনি চটেন; তিনি আপনাকে মরহট্টা জাতি হইতে ভিন্ন বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু তাহাতে সেই ব্রাহ্মণ মরহট্টা প্রদেশের অধিবাসীর অধিকার হইতে বঞ্চিত হন্ না। ওড়িষার যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের নাম শাসনি ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ওড়িষায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ওড় জাতির লোকদিগকে বর্ব্বর ও ভেড়া বলিতেন; প্রদেশের নামে নামকরণ না হইলেও একটি প্রদেশবাসী যে সেই প্রদেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেন না, তাহাই বলা গেল।

আমাদের বাঙ্গলার আদিম অধিবাসী পুণ্ড্র জাতি, শুহ্ম জাতি, ও বঙ্গ জাতি, সমাজের কোন্ স্তরে কি ভাবে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের প্রদেশ রূপ সাগরের কোন তরঙ্গে ধরা পড়ে না। এখন ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই বঙ্গের বাসিন্দা বলিয়া বঙ্গজাতি বা বাঙ্গালী নামে পরিচিত।

এ বিচারে বুঝিতে পারি—আমাদের ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি ইউরোপের জর্ম্মাণি, ফ্রান্স প্রভৃতির মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র দেশ নয় ও কখনও ছিল না। ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে, সামাজিকতায় ও ধর্ম্মে পরস্পরে আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকিলেও যাঁহারা একটি প্রদেশের বাসিন্দা, তাঁহারাই সকলে মিলিয়া সেই প্রদেশের লোক। এই হিসাবে কাহাকে বা বলি বাঙ্গালী, কাহাকে বা বলি উড়িয়া আর

কাহাকে বা বলি অন্য কিছু। এই নামে, খাঁটি জাতি বা race বোঝায় না,—কেবল নিবাস বোঝায়। এই 'নিবাস' আবার ঠিক 'কত দিনের' না হইলে তবে একজন লোক বাঙ্গালী বা উড়িয়া হইতে পারে না, তাহা কেহই আমাদিগকে একটা রীতির নির্দিষ্ট নজির দিয়া বলিতে বা বোঝাইতে পারেন না।

একজন লোক বঙ্গের 'নিবাসী' কিন্তু সে বাঙ্গলায় কথা কয় না; সে বাঙ্গালী কি না? ধরুন, কোন দুর্বোধ্য রুচির ফলে আমাদের তেজচন্দ্র গড়গড়ি তাঁহার নামকরণ করিয়াছেন,—টেঁস্ গ্রেগরি, আর তিনি ও তাঁহার পরিবারের লোকেরা ইংরেজিতে কথা জুটাইয়া উঠিতে না পারিলেও বাঙ্গলায় কথা না কহিয়া ফিরিঙ্গি ধরণে অতি অশুদ্ধ হিন্দী বলেন। এই টেঁসের সংখ্যা অনেক আছে। কেহই বলে না ও বলিবেন না যে ইহারা বাঙ্গালী নয়। টেঁস্ গ্রেগরি ও বোনারজির দল ছাড়িয়া নিছক ফিরিঙ্গিদের কথা বিচার করিলেও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, চাটগাঁয়ের ও প্রাচীন চুণাগলির ফিরিঙ্গিরা আত্মবিস্মৃত হইতে চাহিলেও বাঙ্গালী। কাজেই নিক্তির ওজনে বিচার করিলে একজনকে বাঙ্গালী বা অবাঙ্গালী বলা চলে না। বংশ ধরিয়া, ধর্ম ধরিয়া, সামাজিক রীতি ধরিয়া ও ভাষা ধরিয়া বাঙ্গালীত্বের দাবি স্থির হয় না; 'নিবাস' ধরিলেও পূরামাত্রায় এই দাবি সাব্যস্ত হয় কি না, বিচার করিতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, কোন একটি বংশের লোক বঙ্গে কতদিন বাস করিলে বাঙ্গালী হইবেন তাহা কেহ আইনের ধারার মত একটা ধারা লিখিয়া বলিতে পারেন না; 'বহু' হয় যখন একের আধিক্যে, তখন 'বহুদিন' বলিলে কতগুলি এক জুড়িতে হইবে, তাহা ঠিক করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

সাহিত্যে বিখ্যাত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রভৃতির বংশের লোকেরা বঙ্গের বাহিরে বৈবাহিক সম্বন্ধ খুঁজিলে অবাঙ্গালী হইবেন না নিশ্চিত। যাহার রচিত যাত্রার পালার খাঁটি বাঙ্গলা গানে একদিন সারা দেশ মাতিয়াছিল, সে উৎপত্তিতে উড়িয়া হইলেও বাঙ্গলার নিবাসী ছিল। 'গোপাল উড়ে বাঙ্গালী কি না? দোবে, চোবে, পাঁড়ে নাম দেখিয়া অথবা বাসের সময় গণিয়া কিছু করা যায় না, দেখিতেছি। এ সম্পর্কে অন্য রকমের দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ধরুন, নারীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোথাও এক ছটাক ভূমি ছিল না; তিনি বহু কুলীন ঘরের মেয়েকে বিবাহের মন্ত্রে উদ্ধার করিয়া শ্বশুরবাড়ীগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন অর্থাৎ তাঁহার একটা নিবাস ছিল না; তাঁহার পুত্র ধনবল্লভ চাটুজ্যে কাশীতে লেখাপড়া শিখিয়া লাহোরে চাকুরি করিতেন, আর সে অঞ্চলে বাসের বাড়ী ও সম্পত্তি অর্জিয়াছিলেন। চাকুরির কর্মক্ষেত্রে ঘুরিবার সময় দিল্লীতে তাঁহার পুত্র বিশ্বমোহনের জন্ম হয়। এই বিশ্বমোহন মধ্যপ্রদেশের নাগপুরে ওকালতি করিতেন ও সেখানে বাড়ী-ঘর করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পরিবারে সকলেই সমান মাত্রায় হিন্দী ও বাঙ্গলা কথা কহিতেন ও মরহট্টারা বিশ্বমোহনকে বাঙ্গালী বাবু বলিত। বিশ্বমোহন জাতিভেদ মানিতেন না, আর পাল্টি ঘর খুঁজিয়া বঙ্গদেশে বিবাহ করিতে আসেন নাই। যদি বিশ্বমোহনকে জিজ্ঞাসা করা যাইত—'আজ্ঞা মহাশয়ের নিবাস?'—তবে জন্ম ও বাসের হিসাবে তাঁহাকে কোন্ স্থানের নাম করা উচিত ছিল, বলা কঠিন। সে যদি চট্টোপাধ্যায় বংশের নামে বাঙ্গালী হয়, তবে ত্রিবেদী ও পাঁড়েকে বাঙ্গালী করা যায় না; যদি পিতামহের বিচরণ ভূমি ধরিয়া 'নিবাস' স্থির করিতে হয়, তবে এরূপ গণনা কয়েক পুরুষ ধরিয়া চলিবে, তাহা বিচার্য্য।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা কেহই তাঁহাদের নিবাস মিথিলায় বা কনোজে বলেন না।

এই আলোচনায় দাঁড়াইতেছে এই,—যে ব্যক্তি যে প্রদেশের সঙ্গে তাহার ভাগ্য জুড়িয়াছে সে সেই প্রদেশের লোক,—অথচ সারা ভারতের অধিবাসী। শাসনের সুবিধার জন্য যেমন এক প্রদেশে জেলা ভাগ করিলে জেলার লোকে জেলার লোকে প্রভেদ ঘটে না, প্রদেশ বিভাগের বেলায়ও তাহাই হওয়া চাই। বিহারে যখন কতকগুলি বাঙ্গালীকে domiciled Bengalee বলা হয় তখন হাসি পায়; বাঙ্গলার উচ্চ জাতির সকলেই যে domiciled বিহারী। ডমিসিল কথাটা যে আইনের কথা নয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বিবাদ আছে; আর সে প্রেসিডেন্সিতে তেলেগু, তামিল, মলয়ালাম ও কানাড়ী ভাষা চলিত আছে। মাদ্রাজী বলিলে একটা race বোঝায় না; বাঙ্গালী বলিলেও একটা race বোঝায় না। এ বিষয়ের বুদ্ধিটুকু ঠিক না থাকিলে আমাদের কংগ্রেস হাওয়ায় উড়িয়া যাইবে, আর সকল নীতির বোঝা জলে ডুবিবে। শাসন-সংস্কারের ফলে এখন পাকা রকমে প্রদেশ বিভাগ হইতেছে; এই সময়ে এ বিষয়ের গভীর বিচারের প্রয়োজন। এখন প্রয়োজন হইলে এমন আইন করা উচিত, যাহাতে ভারতবাসীরা প্রদেশের প্রাচীরে আটকা না পড়ে।

বঁধু কোথায়

আনন্দে ও বিষাদে আমরা প্রাচীন ভারতের কথা বলি ; আনন্দ—প্রাচীনের গৌরব-স্মৃতিতে, আর বিষাদ—একালের দুর্দশায়। অমর কমলাকান্তের কাতরোক্তিতে আছে—আমাদের বঁধুও গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে। সে কি কেবল নিরাশার প্রলাপ ? বেদ আছে, বেদান্ত আছে, স্মৃতি আছে, পুরাণ আছে, জ্যোতিষ আছে, চিকিৎসা-শাস্ত্র আছে, কাব্য আছে ; আছে বটে, তবুও বলি—প্রাচীন বঁধুও নাই, বৃন্দাবনও নাই। আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই যে, বহু শতাব্দীর বিপ্লবে প্রাচীনের সহিত আমাদের তাজা বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে ; একটা আকস্মিক ঝড়ের তাড়নায় আমরা দূরে সরিয়া পড়িয়াছি, আর প্রাচীনের কীর্তি ভগ্ন-স্তূপের মত,—জড়ের পাহাড়ের মত পড়িয়া আছে। কমলাকান্তের কথার অনুরূপে, ঐ প্রাচীন—পর-পদ-লাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ না হোক, কিন্তু সে আমাদের পাল-ছাড়া রকমের বুদ্ধির তেজের প্রভাবে ভস্মীভূত না হইলেও দগ্ধপ্রায়। কথাটা বুঝিতে এখনও হয়ত বহুদিন লাগিবে যে, এযুগে যাঁহারা প্রাচীনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন ও যাঁহারা অন্যদিকে প্রাচীনকে পূজা করেন, উভয় শ্রেণীর লোকেই তুল্যভাবে প্রাচীনের সহিত জীবন্ত সম্বন্ধ হারাইয়াছেন। একদল প্রাণশূন্য জড়স্তূপের কাছে জড়ীভূত হইয়া হাত জোড় করিয়া আছেন, আর—আর-একদল উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আকাশে উড়িতেছেন।

প্রাচীন যায়,—কেহ তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারে না ; কিন্তু প্রাচীনের ভিত্তিতেই যে নূতন গড়িয়া ওঠে, প্রাচীন যে রূপান্তরিত হইয়া নূতনের অঙ্গে-অঙ্গে থাকে, প্রাচীনের সারভাগ যে নূতনের প্রাণকে উদ্‌বুদ্ধ ও বর্দ্ধিত করে, অর্থাৎ প্রাচীন-নবীনের অচ্ছেদ্য মিলনের নামই

যে বিকাশ ও উন্নতি, তাহাও অস্বীকৃত হইতে পারে না। প্রাচীন নিরন্তরই. সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে বলিয়া যাইতেছে—তাহাকেই একমাত্র অবলম্বন করিয়া জড়াইয়া ধরিলে, মৃত কঙ্কালরাশির স্তূপের নীচে চির-সমাধি হইবে। গাছের পুরাতন পাতা যখন পাকিয়া ঝরিয়া পড়ে, তখন কেহ তাহাকে বোঁটায় আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে না; সে পুরাতন পাতা ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে, যে অসীম প্রাণের নিঃশ্বাসে সে খসিয়া পড়িতেছে, সেই নিঃশ্বাসেই নূতন কচি সবুজ পাতা গজাইতেছে। আমরা প্রাচীন ভিত্তির অন্তর্নিহিত প্রাণের যোগে, নূতন হইয়া বিকশিত হইতেছি, না—বিচ্ছিন্ন হইয়া অতীতের মৃত কঙ্কালের মধ্যে বসিয়া আছি, তাহা অল্প পরীক্ষাতেই ধরা পড়িবে। যদি দেখিতে পাই, প্রাচীনের জ্ঞান, প্রাচীনের দর্শন প্রভৃতি আমাদের মধ্যে নূতন ও উন্নততর হইয়া বিকসিত হইতেছে না, কেবলই টীকা-টিপ্পনীর ও ব্যাখ্যার স্তূপ বাড়িতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে বাকি থাকিবে না যে, আমরা প্রাচীনের সহিত প্রাণের সম্পর্ক হারাইয়াছি, ও জড়স্তূপের পূজা করিতেছি। আমাদের প্রাণের মন্দিরে প্রাচীন বঁধুও আর নাই, আর আমাদের বিচরণক্ষেত্র প্রাচীনের স্বাধীন লীলাভূমি বা বৃন্দাবনও নয়।

বিপ্লবের কথা বলিয়াছি; ঋতুর পর্য্যায়ে যেমন কাল-বৈশাখী আসে, শ্রাবণের ধারা বয়, তেমনই সমাজের আবর্তনে ও বিকাশে বিপ্লব আসিবেই। অনেক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, আরও বিপ্লব ঘটিবে। তবে যদি ঝড়েই সব ভাঙ্গিয়া যায়, জলপ্লাবনেই সব ডুবিয়া যায়,—ঝড় ও জলপ্লাবনের পরে, সতেজ শ্যামলতায় শরতের নব সৌন্দর্য্য না ফুটিয়া ওঠে, যদি শস্য-পুষ্ট বিশ্বে নব বসন্ত না শিহরিয়া ওঠে, তাহা হইলে আর জীবনের নিদান বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

আমি জানি যে, এক শ্রেণীর লোক অতি দৃঢ়ভাবে আমাকে বলিবেন

—প্রাচীনের জ্ঞান এত ভাল ও এমন সতেজ জীবনপ্রদ বীজে অঙ্কুরিত হইয়াছিল যে, উহার পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশ অসম্ভব বলিয়াই এখন কেবল টীকা ও ব্যাখ্যাই চলিতেছে; তাঁহারা হয়ত আরও বলিবেন যে, যাঁহারা ঐ জ্ঞানকে সম্মান করেন না, তাঁহারাই উহার নূতন সংস্করণ ও নূতন বিকাশ চা'ন। প্রাচীনের প্রতি অসম্মানের অপরাধে কে যথার্থ অপরাধী, তাহার বিচার করা ভাল। যাহা সতেজ জীবন-প্রদ বীজ নিয়া উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা আর বাড়িতে পারিল না অথবা চিরদিনের মত বন্ধ্যা হইয়া রহিল বলিলে কি প্রাচীন পদার্থের মহিমার ব্যাখ্যা হয়? সতেজ গাছের যদি নূতন উন্নততর চারা জন্মিতে ও বাড়িতে পাইয়া না থাকে, তবে আমাদের মনের ভূমির উর্ব্বরতায় সন্দিহান হওয়া উচিত ছিল; আদিম জিনিসটাকে বিকাশের নিয়মের অতীত করিয়া দিলে, তাহাকে গুণহীন ও নির্বীর্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এ শ্রেণীর স্তুতিতে প্রাচীনকে সম্মান করা হয় না, বরং নিন্দা করা হয়।

প্রাচীনকে যাঁহারা অতি-মানুষের কীর্ত্তি মনে করেন, অথবা প্রাচীনতায় যাঁহারা দেবত্ব আরোপ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রাচীন হইতে বিচ্ছিন্ন; কারণ তাঁহারা নিজেরা অধম যুগের ক্ষুদ্র মানুষ মাত্র। তাঁহারা প্রাচীনের লীলাভূমিকে আপনাদের লীলাক্ষেত্র বা বৃন্দাবন করিতে পারেন না। যে সত্যের প্রতিভায় প্রাচীনের জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়াছিল, যাঁহারা আপনাদের জ্ঞানে সেই সত্যের বা সেই বঁধুর প্রতিষ্ঠা বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের কাছে প্রাচীন বঁধুও নাই—বৃন্দাবনও নাই। যাঁহারা প্রাচীনকে উপেক্ষা ও উপহাস করেন, তাঁহাদের কথা না বলিলেও চলে; যাঁহারা সত্য বুঝিবার শক্তিকে বিনয়ে হোক, অথবা মোহে হোক মলিন করিয়াছেন, ও হয় প্রাচীনের দোহাই দিয়া, আর না-হয়, বিদেশের গৌরবের দোহাই দিয়া চলেন, তাঁহারা সত্য-লাভে

বঞ্চিত,—বঁধু হইতে বহুদূরে। সত্য যেখানে নিজের জোরে প্রতিষ্ঠিত নয়,—হয় মনুর নামের জোরে, না-হয়, স্পেন্সরের নামের জোরে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে সত্য নাই, সত্যের ছায়াও নাই; কেননা—প্রতি মানুষের নিজের জ্ঞানের ও অনুভূতির আসনেই খাঁটি সত্য আসিয়া বসেন।

শোনা-কথা মুখস্থ করিতে-করিতে বহুদিন হইতেই এদেশের অনেক লোক প্রত্যক্ষ সত্যের সংশ্রব হারাইয়াছিল; তাই ধীরে-ধীরে এদেশের অধোগতি হইয়াছিল। একজন সত্য-সেবকের নিকটে যে-সত্য প্রকাশ পাইয়াছে, অন্য দশজনে তাহা ধরিতে পারেন নাই। এই জন্যই অনেক পূর্বকাল হইতেই একজনের উজ্জ্বল জ্ঞানের প্রদীপে অন্য দশটি জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিতে পারে নাই। এ বিষয়ের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিব।

আর্য্যভট্ট যখন বলিয়াছিলেন—পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তখন তাঁহার পরবর্তী বড়-বড় পণ্ডিতেরাও সে সত্য ধরিতে পারেন নাই। যখন ঐ তথ্যের সমালোচনার কথায় উঠিয়াছিল যে, পৃথিবী ঘুরিয়া-ঘুরিয়া অগ্রসর হইলে পাখীরা কেমন করিয়া বাসায় ফিরিতে পারে তখন আর্য্যভট্টের জ্ঞানের মূল ধরিয়া বিচার করিলে, খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতেই ভারতে নিউটন জন্মিত।

সারাসেনেরা 'অরিঅভট্'কে আলোচনা করিয়াছিল ও নূতন ইউরোপে যখন সারাসেনদের জ্ঞান সংক্রামিত হইয়াছিল, তখন অরিঅভটের জ্ঞানের বীজটুকুও ইতালিতে উপ্ত হইতে ছাড়ে নাই, ও তাহার ফলেই ইতালি নূতন আবিষ্কারের গৌরব পাইল, আর আমরা কোনপ্রকারে এই দেশের আদিম কথার বাসি সংস্করণটুকু একবার দ্বাদশ শতাব্দীতে সারাসেনদের নিকট হইতে, ও পরে ইউরোপিয়দের নিকট হইতে মান্‌চেষ্টর জাত কাপড়ের মত লাভ করিলাম।

আর্য্যভট্টকে এদেশের লোক অবতার করে নাই, তাহা জানি;

তবে বিশেষ কারণে খাঁটি অবতারের দৃষ্টান্ত না দিয়া, এই প্রসঙ্গেই একটু ইঙ্গিতে বোঝাইতে চাই যে, জ্ঞানীকে অবতার করিয়া তুলিলে মানুষে কেমন করিয়া অবতারকে জড়ে পরিণত করে আর নিজেরাও জড়বুদ্ধি হয়। ইউরোপে যদি গালিলিও, নিউটন, ডারউইন্ প্রভৃতিকে অবতার করা হইত, অর্থাৎ যদি উঁহাদের প্রাণশূন্য মাটির মূর্তির পূজা চলিত, তাহা হইলে স্তোত্র বাড়িত, টীকা বাড়িত, কিন্তু উঁহাদের প্রাণের যোগে নূতন প্রাণ জন্মিত না,—উঁহাদের তথ্যগুলি নিত্য নূতন হইয়া বাড়িয়া উঠিত না। মানুষ যেখানে নিজের আত্মার মাহাত্ম্য ভুলিয়া বিস্ময়ে একেবারে পরের পায়ের গোড়ায় মাথা লুটাইয়া পড়ে, সেখানে দাসবুদ্ধির জড়তায় একেবারে জড় হইয়া যায়,—কোন প্রাণের সাড়া পাইবার আর সম্ভাবনা থাকে না ; সে বঁধু হইতে বহুদূরে দ্বীপান্তরিত হয়। বঁধু খুঁজিতে হইলে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে—'মৃত অতীতের কঙ্কালে গড়া পাহাড়ে দেবতা নাই' ; বুঝিয়া নিতে হইবে—'মৃতের শ্মশানে প্রেতের নৃত্য—বদ্ধ জলায় কীটের তীর্থ।' মানুষে তাহাদের কোন কুলতিলককে যদি অতি-মানুষ করিয়া তোলে, যদি তাঁহাকে ভগবানের অবতার করিয়া গড়ে, তবে জড়বুদ্ধিতে তাঁহার হুকুম মানিয়া চলিতে পারে, কিন্তু অবতারের লীলাকে স্বয়ং ঈশ্বরের কল্পনা করিয়া নিজেদের আদর্শের অনুরূপ কাজ করা অসম্ভব মনে করিবেই করিবে। এ বুদ্ধিতে মানুষে শ্যামকে শ্যাম করিয়া না রাখিয়া শ্যামকে হারায়, আর অক্ষমতায় মজিয়া আপনাদের কুলকেও হারায়।

অন্যদিকে আবার যাঁহারা প্রাচীন ভুলিয়া, প্রাচীনকে উপেক্ষা করিয়া, আপনাদের বুদ্ধির সম্বন্ধে কল্পনায় ভাবিতেছেন যে—'দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা,' তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না—তাঁহাদের বুদ্ধির 'চান্দ্রমসী লেখা' কৃষ্ণপক্ষে। যাহা আমাদের মাটিতে উপ্ত হইয়া

আমাদের জল-বাতাসে বাড়িতেছে না, তাহা বিদেশী গাছের ডাল জড়াইয়া অতি অল্পকাল পর্য্যন্তই নিজের বায়বীয় মূলকে তাজা রাখিতে পারে। এদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যাঁহার জন্ম ও বর্দ্ধন, হাজার কৃত্রিম উপায়েও যিনি এদেশে মানুষের 'অনুন্নত' ভাবের চাপ এড়াইয়া 'আত্ম-রক্ষা' করিতে পারিবেন না, দেশের জল-বায়ু ভাল না হইলে যাঁহার সকল রকমের স্বাস্থ্যের উন্নতি অসম্ভব, তিনি যখন আপনার জ্ঞানের দর্পে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দাবি করেন, তখন মায়াবাদকেই সার মনে করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—'সংসারটা ফাঁকি রে, যেন ভোজের বাজি'। আমার কুঁড়ে ঘরে যেদিন অমাবস্যার রাত্রে প্রতিবেশী বড় মানুষের উৎসবের আলো পড়ে, সেদিন আমার তেলের খরচ কমে বটে ; বিদেশের বিদ্যুতের আলো নিবাইয়া দিলে,—বিদেশের শব্দ-কোষের গ্রন্থগুলি সরাইয়া ফেলিলে যে আমাদের রচিত অধিকাংশ সাহিত্য পড়া যায় না ও দুর্বোধ্য হয়, তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছি ?

বসুন্ধরা বিষ্ণু-ক্রান্তা, তাহা জানি ; বিশ্বব্যাপ্ত বিষ্ণু-মন্দিরে যে-কোন দেশের লোকেই জ্ঞানের পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালাইয়া আরতি করুক, যে-কেহই মানস-গৌরবের উপহার দিক্, তাহা-যে সকল দেশেরই প্রাপ্য ও উপভোগ্য হয়, তাহাও জানি ; কিন্তু সে উৎসবকে যাহারা আপনাদের উৎসব করিয়া তুলিতে পারে নাই, তাহারা আপনাদের প্রাণের মধ্যে উৎসবের প্রাণকে আনিতে পারিবে না। আপনার মাটিতে আপনি বাড়িয়া উঠিতে না পারিলে যে, বিশ্ব-প্রাণতা একটা হাওয়ার কল্পনায় দাঁড়ায়, সেকথা বিশেষ করিয়া অন্য প্রবন্ধে না লিখিলে চলে না। কি উপায়ে জাতীয় বিশেষত্বের ভূমিতে প্রাণ বাড়াইয়া বিশ্ব-প্রাণের স্পর্শ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা স্বতন্ত্রভাবে পরে বিচার্য্য। এখানে এইটুকুই ইঙ্গিতে বুঝিয়া নিতে চেষ্টা করিলাম যে, আমরা—দেশের সকল শ্রেণীর

লোকেই প্রাণহারা; প্রাচীনের উপেক্ষাতেও প্রাণ নাই, প্রাচীনের গৌরবগানেও প্রাণ নাই। আমাদের সকল প্রকারের দম্ভ ও দাপাদাপি যে একটা বিদেশী অনুকরণের ফলে, কৃত্রিম উত্তেজনায় ঘটিতেছে—জমাট বাঁধা সমাজশরীরের প্রাণের অভিব্যক্তিতে ঘটিতেছে না, এটুকু গোড়ায় বুঝিয়া নিতে না পারিলে, সকল কল বিকল হইয়া যাইবে।

উৎকট আয়োজনে ও বিকট চীৎকারে আমরা অনেকবার অনেক অনুষ্ঠান করিয়াছি,—সাধনার ফল আমাদের হাতে পড়-পড় হইয়াছে মনে করিয়াছি, কিন্তু শেষটা সকল উদ্যোগই ফক্কিকারে দাঁড়াইয়াছে। দুঃখে ও যাতনায় ছট্‌ফটানি জন্মিবেই; কিন্তু চঞ্চল বুদ্ধিতে যাহা-কিছু করিলেই দুঃখ যাতনা যায় না। ব্যগ্র ও উৎসাহী অবিবেচকেরা বুদ্ধির কথা শুনিলেই উহা অকর্মা অলসের উক্তি মনে করেন। পথভ্রান্তেরা, খাঁটি পথ না দেখাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত, ধীর উপদেষ্টার কথা উপেক্ষা করিবেনই-করিবেন; এই অবস্থাতেই বিশেষ প্রয়োজন যে, ধীরেরা আমাদের উত্তেজনার অস্বাভাবিকত্ব বোঝাইয়া দিবেন; কোলাহলে যে স্থায়ী জীবন বাড়ে না,—হারা-প্রাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেকথা কোলাহলপ্রিয়েরা না বুঝিলেও একাজ করিতে হইবে। কাহারও নিন্দায় বা স্তুতিতে—ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

যথার্থই আমাদের বঁধুও গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে বলিয়া, আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে উদ্‌ভ্রান্ত ও পথহারা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া, যাহা স্থিরপ্রাণতায়, নিঃস্বার্থত্যাগে ও গভীর অনুরাগে করিতেছি, তাহা পণ্ড হইয়া যাইতেছে; আর আমাদের ব্যগ্র উৎসাহের উত্তেজনায় কেবলই জ্বর-বিকারের তাপ লক্ষ্য করিতেছি। সকল অনুষ্ঠানের আগে সকলে খুঁজিয়া দেখ—তোমাদের সুস্থ প্রাকৃতিক প্রাণ কোথায়, তোমাদের বঁধু কোথায়।